সনৎ বসু ও জ্যোতি রায়-কে

লেখকের অন্যান্য উপন্যাস

গোপাল দেব ২য় সংস্করণ (যন্ত্রস্থ)

একদা ট্রেনে, দ্বিতীয় জন্ম, বক্তের হাওয়া,

দেশদ্রোহী, শব্দের খাঁচায়, অসংলগ্ন কাব্য

আবহমানকাল, নবাব বাঁদী।

গল্প সংগ্রহ : অসীম রায়ের গল্প।

কবিতা : ফুটপাথে ফুলের গল্প, আমি হাটছি

এক

বামপন্থী মহলের কাগজগুলোতে বলা হয়েছিল তিন লক্ষাধিক জনসমাবেশ, আর অন্যান্য যে সব কাগজ তারা বলেছিলেন তিরিশ হাজার লোক জমেছিল কলকাতায় মনুমেণ্টের নীচে। সংখ্যা নিয়ে বিবাদ না করে বলা যেতে পারে যথেষ্ট বড় জমায়েতই হয়েছিল সেদিন।

বাঁশের পোল থেকে খুলে তেরঙ্গা, চাঁদ-তারা আর লাল পতাকা দিয়ে মনুমেণ্টের পাদদেশ মোড়া হয়েছে। একটা প্রকাণ্ড লাল সালুর ওপর চকচকে রুপোলী রঙে লেখা অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। এ ছাড়া নানা রঙে আঁকা দেশ-বিদেশের নেতৃবৃন্দের ছবি। ভাত কাপড় রুজির জন্যে আলাদা আলাদা পোস্টার, বাঁশের চাঁচের ওপর খবরের কাগজে লাল কালিতে স্লোগান। একখানা ছবিতে একজন ঝাঁকড়া চুলওয়ালা লম্বা মানুষ কোমর বেঁকিয়ে শেকলে-বাঁধা তার পেছনের হাত দুখানি খুলবার চেষ্টা করছে, সেই চেষ্টার দরুন তার কাঁধের পেশী ফুলে উঠছে, মুখের চোয়াল ধারালো শক্ত হয়ে উঠছে। বর্ষার দিন হলেও আকাশ খুব পরিষ্কার। গ্র্যাণ্ড হোটেলের মাথার ওপর জাফরানি মেঘ আর গঙ্গা থেকে হাওয়া—দিনটা ছিল উনত্রিশে জুলাই, উনিশশো ছেচল্লিশ।

সেদিনের জমায়েত অন্যান্য মিটিং থেকে বেশ কিছু পরিমাণে আলাদা মনে হয়েছিল। যেন গ্রামে মেলা বসেছে, ঠিক সেই রকম একটা সহজ আনন্দের ভাব আর ফুর্তির মেজাজ ছিল সমাবেশটিতে। অনেক দূর দূর থেকে অনেক ধরনের লোক জমেছে। মেটেবুরুজ থেকে শোভাযাত্রা করে মুসলমান শ্রমিকেরা যখন বাজনা বাজাতে বাজাতে এসে পৌছল তখন ঠিক মনে হচ্ছিল পূজোর ঢাক বাজছে। তাছাড়া তিনরঙা, সবুজের ওপর চাঁদ-তারা আর লাল রঙের ওপর কাস্তে হাতুড়ির ফ্ল্যাগগুলো শ্রমিকরা যেখানে সেখানে পুঁতে এমন ভাবে তার নীচে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে নিজেদের ঘরোয়া গল্প করছিল যে রাজনীতির কঠিন মারপ্যাচ অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল। মনে হচ্ছিল, প্রত্যেক দল আর তার নির্দিষ্ট এত বিভিন্ন পতাকার চেয়েও একটা বড় জিনিস আছে। সেটা হল যারা পতাকা বয় তারা আর তাদের মন।

মিটিঙে যাঁরা বললেন তাঁদের কারো গলাই অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে বলবার জন্যে তৈরি হয় নি। অবশ্য ব্যতিক্রম ছিল দু-তিন জনের বক্তৃতায়। যেমন "জাতীয় জীবনের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামে আজ একটি স্মরণীয় দিন" কিংবা "মনে রাখবেন জালিয়ান-

"ওয়ালাবাগ, মনে রাখবেন..." ইত্যাদি কথাও হয়েছিল। এছাড়া একজন মুসলিম নেতা যিনি পরে পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার কেন্দ্রীয় দপ্তরের শ্রম-মন্ত্রী হয়েছিলেন তিনিও বলেছিলেন গম্ভীর গলায় "জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমি আপনাদের সেবা করব"। কিন্তু মোটামুটি প্রায় সকলেই সাদামাটা ভাষায় তাঁদের মনের কথা জানিয়েছিলেন।

এদিক থেকে কলকাতার পোর্টের যে শ্রমিকটি বললেন তাঁর কথা ছিল চমৎকার। ছ-ফুট লম্বা তামাটে চেহারা আর আড়াই মন শরীরের ওপরের অর্ধেকটা ঢাকা পড়েছে কালো দাড়িতে। ছাঁকা বাঙাল ভাষায় বললেন, "অঙ্ক কষে দেখাও আমি কী করে বাঁচব? ছেলেডা বরাবর প্রথম হইয়া উঠছিল ইস্কুলে, মাইনা দিতে পারি না ছাড়ায়ে আনছি।" তারপর গলা নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিকেলের আলো কাত হয়ে তাঁর চওড়া কপালে এসে পড়ল। তারপর তাঁর বিশাল হাত দুটো আহ্বানের সময় যেভাবে লোকে তোলে ঠিক সেইভাবে তুলে বললেন, "জানেন আমাদের মত লোক না হইলে কলকাতার পোর্ট চলবে না?" মাত্র এই কথাটা। কথাটা বলে যখন নেমে গেলেন তখন হাততালি দিতে পর্যন্ত লোকে ভুলে গেল।

খুব অস্পষ্ট আর আবছা হলেও ঐ শেষ কথাটাই ছিল জমায়েতের কথা। যেন একটা মিঠে গানের মত সেই কথাটাই লোকগুলো শুনছিল মন দিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে যে অবিশ্বাসটুকু মাথার কোণে জমতে পারত সেগুলো সমবেত স্লোগানে চাপা পড়ে যাচ্ছিল। সত্যিই কি তারা এতখানি দরকারি? ইচ্ছে করলেই কি তারা সব কিছু করতে পারে? খুব অস্পষ্টভাবে এই ধরনের ভাবনা নাড়াচাড়া করছিল তাদের মনে।

বছর পঁয়তাল্লিশেক বয়স কিন্তু চুলগুলো ধবধবে সাদা, মুখের গড়ন বেশ চোখা এবং চোয়ালের হাড়ের অস্বাভাবিক দৃঢ়তার নেহাত হৃদয়হীন বলে মনে হতে পারত মানুষটাকে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যেন বোসের মত এক মাথা সাদা রেশমের মত চুল থাকায় মানুষটার চেহারা বেশ স্নিগ্ধ। পরনে পাজামা আর গলাবন্ধ কোট। সভাপতি সে, কিন্তু মিটিঙের সভাপতিদের চেয়ে অনেক বেশি হাসিখুশি। লোকটা একটা কথার ওপর বার বার ঘা দিচ্ছিল যেন এতগুলো লোকের মধ্যে একটা কথা লুকিয়ে আছে আর সে কথাটা লোকটি বের করবার চেষ্টা করছে বারবার। গ্র্যাণ্ড হোটেলের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বেশ গর্বের সঙ্গে হেসে সে বললে, "আজ সাহাব লোগোঁকো লাঞ্চ নেহি হুয়া, কিৎনা তকলিফ!" চুকচুক করে মুখ দিয়ে আফসোসের শব্দ করে বললেন, "ম্যয় তো অভি ডালহৌসি স্কোয়ার সে আ রহা। বড়া রাস্তামে কেয়া ট্রাম ভি নেহি, বাস ভি নেহি, প্রাইভেট ভি নেহি। সড়ক কা উপরমে আজ গানা চল্

যাহা।" শেষে গলা নামিয়ে থুতনিটা আকাশের দিকে বাড়িয়ে মিটিঙের শেষ প্রান্তের লোকগুলোর মাথা ছাড়িয়ে এক বহু দূরের স্বপ্নের দিকে যেন তাকিয়ে বললেন, "ইয়াদ রাখিয়ে, হামলোগ যব সব এককাট্টা হো সাকেঙ্গে তব তামাম হিন্দুস্থানকো হিলা দেঙ্গে।" বলে তার হাতখানা কানের কাছে রেখে দরদ দিয়ে গাইবার সময় লোকে যে ভঙ্গি করে ঠিক সেই ভঙ্গিতে একটি গানের ধুয়োকেই পুনরাবৃত্তি করলেন, "ইয়াদ রাখিয়ে হামলোগ তামাম হিন্দুস্থানকো হিলা দেঙ্গে।"

লোকগুলো রোদ্দুরে ঘাসের ওপর বসে মাতালের মত পান করছিল এই মিঠে গানের সুর। যেন তারা স্বপ্ন দেখছিল তাকিয়ে তাকিয়ে। তারা নিজেরা, মানে যে-সব লোক ফর্সা কাপড় চোপড় পরতে পায় না, যাদের বাস করতে হয় সারি সারি আলোবাতাসহীন পায়খানার মত খোঁদলে, খোলা নর্দমার পচা গন্ধে আর সন্ধ্যে হতে না হতেই মাটির ওপরে জমা চাপ চাপ ধোঁয়ায় বুকে হাত দিয়ে বসে থাকতে হয়, বড় জোর তাদের কাছে ভোটের সময় মদ এসেছে এতদিন আর বস্তির সর্দার বলেছে, একে ভোট দাও নয় বেরিয়ে যাও। ঠিক তাদের মত লোকই কিভাবে তামাম হিন্দুস্থানকে হেলিয়ে দেবে, একথাটা ভাবতে ভীষণ অবাক লাগে তাদের।

তারপর গান হল। ঠিক সেই স্বপ্নের কথাটাই পর পর ছেলে মেয়েরা গাইল, নভমে পতাকা নাচছে, তার রঙ জ্বলছে, যারা ভুখ্‌সে মরনেওয়ালে, যারা দুখ্‌সে ডরনেওয়ালে তারা সবাই পিঠ্‌টান করে দাঁড়াও।

সেদিন জমায়েতে অনেক লোকের সঙ্গে যারা স্বপ্ন দেখেছিল তাদের মধ্যে ছিল দুটি তরুণ। নিত্যগোপাল আর তার বন্ধু হাশেম। তাদের নিয়েই গল্পের শুরু।

হাশেম আর নিত্য বসেছে পাশাপাশি, বয়স দুজনেরই একুশ-বাইশের কাছাকাছি। দুজনেই কেউ শ্রমিকের ছেলে নয়। বাঙাল মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। এক সাথে কলেজে পড়ত। তবে এম-এর প্রথম বছর থেকেই হাশেম খুব জোরে রাজনীতি আরম্ভ করলে। এম-এ ডিগ্রিটা তার ভাগ্যে আর হয় নি। গত মাস তিনেক হল সে কাজ করছে মেটেবুরুজের এক শ্রমিক অঞ্চলে। আর নিত্য এম-এ পাশ করেছে, তাও আবার বেশ ভালো ভাবেই। শ্রমিক দেখেছে সে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার্কিং ক্লাস'-এর পাতায়, ট্রাম কণ্ডাক্টরের মুখের আদলে আর কলকাতার বাইরে যাবার সময় ট্রেনের কামরা থেকে নগরীর উপকণ্ঠে মুখ বাড়িয়ে দেখা শ্রমিক বস্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে। অবশ্য হাশেমই তাকে অনেক কথা বলেছে এ প্রসঙ্গে। গান স্লোগান আবৃত্তি কথাবার্তা হৈ হৈ ফেস্টুন ফ্ল্যাগ—তারপর মনুমেন্টের মাথার ওপর এক এক করে তারা জেগে উঠল। মিটিং ভাঙতে হাশেম বললে, "চল,

গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি।"

আউটরাম ঘাট আর ফোর্ট ছাড়িয়ে অন্ধকারে আবছা আবছা তারার আলোর নীচে হাঁটতে হাঁটতে দুই বন্ধু নদীর একটা বাঁকের মুখে গিয়ে বসে।

দূরে খান তিনেক জাহাজ থেকে আলো এসে পড়েছে গঙ্গার ওপর। সাদা কেবিনগুলোর ওপরে হেলান দিয়ে কতগুলো মানুষ দাঁড়িয়ে, মাঝে মাঝে লঞ্চগুলো খুব গম্ভীর শব্দ করতে করতে সার্চলাইটের আলো ফেলে জল কেটে কেটে আসছে। আলো চলে গেলেই ফের কালো জল আর কান পেতে থাকলে শোনা যায় জলের মৃদু শব্দ।

হাশেম বললে, "কলকাতার গঙ্গা আমার ভালো লাগে না রে, কেমন যেন বুড়ী বুড়ী, বড় জোর একটা চওড়া খাল।"

নিত্য জবাব দেয়, "আমার কিন্তু এরকমই ভালো লাগে। নদী হলেই যে তোদের দ্যাশের মত সব সময় একটা উদ্দাম ভাব থাকবে এ আমার ভাই ভালো লাগে না। দ্যাখ না কত জল এখানে, বড় বড় ড্রেজার দিয়ে মাটি কাটা হচ্ছে। চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট তো হবেই। কিন্তু বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, এত জল আছে? কী গভীর, কী সংযত!"

তীরের কাছে বাঁধা গাধাবোটের নীচে যেসব নৌকাগুলো বাঁধা ছিল সেগুলোতে রান্নাবাড়ি চলছে। এতক্ষণ লণ্ঠনের আলোয় সরু সরু ধোঁয়ার রেখা মিলিয়ে যাচ্ছিল অন্ধকারে। ঠিক এ সময় মাঝিগুলো গাইতে আরম্ভ করলে। হাশেম বললে, "জানিস কি গাইছে?" তারপর গুন গুন করে গলা মেলাল সে গানের সঙ্গে। কে কোন দরদিয়া এসেছিল আর চলে গেছে, তার জন্যে যখন জল আসে চোখে তখন বলতে হয় চোখে ধোঁয়া লেগেছে।—চাটগাঁর মাল্লাদের গান। গান শেষ করে হাশেম বললে, "আমি আগেও তোকে বলেছি চাটগাঁয়ে কর্ণফুলী নদীটার কথা। পদ্মা মেঘনার কথা আলাদা, কিন্তু এমন সুন্দর নদী কর্ণফুলী, এমন ছোট, তর তর করে বয়ে গিয়েছে, আর দু-দিকে খাড়া পাহাড়, মাঝখানে ক্ষেত। পরীক্ষা দিয়ে যেবার তুই বলেছিলি আমার সঙ্গে বেরোবি বাংলা দেশ দেখতে আর কুঁড়েমির জন্যে এলি না…"

"এবারে ঠিক যাব হাশু, এবারে আর নড়চড় হবে না" হাশেমের হাতে চাপ দিয়ে নিত্য জবাব দেয়।

হাশেম বললে, "সে তুই বুঝবি। আগে কথাটা শোন। সেবার যখন ঢাকা থেকে চাটগাঁ গেলাম খুব আশ্চর্য লাগল, আগে সেখানে কতরকম গান হত, ক্ষেতে হাল

দিতে দিতে চাষীরা গাইত। সেবার গিয়ে কোন গান শুনলাম না। অনেক জায়গায় এয়ারফিল্ড। খাঁ খাঁ ক্ষেত পড়ে আছে। এক জায়গায় খালি গান শুনলাম। নৌকো ভিড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। তারপর শুনলাম সিনেমার গান। ঐ যে হিন্দি সিনেমাটা কলকাতায় দু-বছর চলছে মনে হল তারই একটা গান।"

"এবার ঠিক যাব হাশু, তুই বিশ্বাস কর। আমি অনেক দিন থেকে ভেবেছি।"

"তুই কলকাতা ছাডবি না, মিছিমিছি কেন বলছিস। বাংলা দেশ বাংলা দেশ করিস কিন্তু পদ্মার পার না হলে বাংলা দেশটা কি কিছুতেই ঠিক বোঝা যায় না।"

নিত্য তার পূর্বোক্ত গাফিলতি শুধরাবার জন্য অতিরিক্ত উৎসাহী হয়ে বললে, "আসছে মাসের মাঝামাঝি চল না।"

"ঠিক মাঝামাঝি না, অত তাড়াতাড়ি হবে না, এই বিশে একুশে নাগাদ চল বেরোই। জানিস নিত্য, হয়তো বলবি ছেলেমানুষি, কিন্তু—" হাশেম থেমে যায়।

"কিন্তু কি?"

"না এগুলো ঠিক বোঝান যায় না, শুনতে কিরকম হাসি লাগে নিজেরই, তবে কি জানিস, খুব একটা ভালো লাগার জিনিস থাকে না আমাদের মধ্যে? ছেলেবেলায় যখন আমাদের বাড়িতে খুব পালা করে কোরাণ শরীফ পড়া হত তখন মাঝ রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেলে, খুব হাসি পাবে তোর ভাবতে—খালি আরবের স্বপ্ন দেখতাম। আর আরব বলতে একটাই ছবি আসত মনে। একটা বিলিতি ছবি দেখেছিলাম অবিকল তার মত। মস্ত বড় উঁচু একটা মিনার আর তার পেছনে সূর্য ঢলে পড়েছে। যেখানে সূর্যটা ডুবছে ঠিক তার নীচেই সারি সারি উট চলেছে।"

নিত্য জলের দিকে তাকিয়ে বললে, "বাঃ চমৎকার।"

হাশেম বললে, "আর একটা স্বপ্নও দেখতাম, পদ্মা পাড়ি দিচ্ছি নৌকায়, খুব ফুট্ ফুট্ করছে চাঁদিনী, নৌকার পাটায় পা ছড়িয়ে মাঝিরা দাঁড় টানছে আর গাইছে। যতই চলেছি পাড় আর পাই না।"

নিত্য বলে ওঠে, "দাদা থাকলে দেখতিস খুব চটে যেত। ঠিক বলত বাঙালি জাতটাই মরল সেন্টিমেণ্টাল হয়ে।"

নিত্যর দাদা সত্যগোপালের কথায় হাশেম নড়ে চড়ে বসল। বললে, "তোর দাদা! সত্যি ভদ্রতায় তোর দাদার জুড়ি বোধহয় দুনিয়াতে নেই। সেদিন কালিঘাটে ট্রামের স্টপে দাঁড়িয়ে আছি। চৌধুরী সাহেব যাচ্ছিলেন আপিস। গাড়ি থেকে গলা বাড়িয়ে ডাকলেন, হ্যালো হাশেম। উঠলাম, ট্রাম নেই, বাসে ভীষণ ভিড়। বললেন, তোমরা তো লাগিয়ে দিয়েই খালাস, এখন এদের পরিবার চলবে কিসে

ভেবে দেখেছ? ছেলেপুলে নিয়ে ক-দিন স্ট্রাইক চালাবে? তোমরা যতই লম্বা লম্বা কথা বল না কেন হাঙ্গার ইজ এ গ্রেট থিং। আর দোষ কাকে দেব বল, কোম্পানি তো একটা দানছত্র খুলে বসে নি। সে অনেক কথা। তারপর কৌটো থেকে সিগারেট দিয়ে বললেন, তোমাদের মার্সিতেই আছি, আজকে তোমরা রাস্তায় রাস্তায় চেঁচাচ্ছ কাল তোমরাই আবার মিনিস্টার-ফিনিস্টার হয়ে যাবে। বাড়ির কথাও জিজ্ঞেস করলেন"।

নিত্য ঘাসের ওপর শুয়ে পড়েছিল। উঠে বসে বললে, "হ্যাঁ, দাদা আর বদলাল না। তবে কি জানিস, দাদার ইংরেজ প্রীতিটা বুঝতে পারি. বিশ বছরের ওপরে সাহেবদের কাগজে কাজ করছেন। আর তাছাড়া তাঁর ব্রিটিশ ক্যারেক্টর ভালো লাগে এটা তিনি কোথাও লুকোন না। মেজাজ খারাপ হয় যখন দেখি যে-সব দেশি সাহেবরা ছুরি কাঁটা ছাড়া খেতেন না, বিলেত ছাড়া কথা বলতেন না, সেই সব লোক আজ পণ্ডিচেরি ছুটছে, ইণ্ডিয়ান ওয়ে অফ্ লাইফের ওপর লাঞ্চের মিটিঙে বক্তৃতা দিচ্ছে। এমন বিচ্ছিরি লাগে এদের কথা ভাবলে।"

"আচ্ছা, হাসির খবর কিরে? ওকে যেদিনই যাই সেদিনই দেখি না যে।"

নিত্যকে গম্ভীর দেখায়, জবাব দেয়, "হাসি প্রেম করছে।"

"প্রেম করছে, তা বলিস নি কেন? বাঃ বেশ, কার সাথে?"

নিত্যকে আরো গম্ভীর দেখাল। বললে, "তুই বোধহয় দেখেছিস, সুবোধ, আমাদেরই এক বন্ধু। বার্মা শেলে কাজ করে, খুব ভালো ক্রিকেট খেলে।"

হাশেম খুশিতে মাথা নাচিয়ে বলে, "কী দারুণ বড় হয়ে গেল হাসি না? বাঃ।"

নিত্য বিচলিত স্বরে বলে, "কিন্তু কী জানিস হাশু, ভারী হালকা লাগে আমার ওদের ব্যবহারগুলো। ভালবাসা মানে যেন খালি হৈ হৈ করা। আজ সিনেমা, কাল পিকনিক—"

হাশেম চটে ওঠে; বাধা দিয়ে বলে, "বোকার মত কথা বলিস নে। তোর প্রেমে পড়তে হবে না। তুই যা তোদের রামকেষ্ট মিশনে গিয়ে ঢোক। তোর কী হয়েছে বল তো, আগেও যখন প্রেম নিয়ে কথা বলেছিস তখনও তুই তোর প্যাঁচ মেরে মেরে কথা বলা ছাড়া কথা বলিস নি। কী হয়েছে বল তো?"

"না, আমার বড্ড হালকা লাগে রে। আসল কথা হল—"

হাশেম আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসে। "রাত্তির দশটা হয়ে গেছে। এখন যদি তোর প্রেমের থিসিস আরম্ভ করিস তাহলে ভোর হয়ে যাবে। আসল কথা হল আর কিছু না, তোর মনের অসুখ। ওঠ।"

দুজন যখন উঠল তখন রাস্তা প্রায় নির্জন। গঙ্গা আরো মনোরম লাগছিল। নিস্তরঙ্গ নদীর ওপর জাহাজের কেবিনের আলো ছাড়া আর সব জায়গাই প্রায় অস্পষ্ট। চাঁদ উঠেছে, তবে তা কৃষ্ণপক্ষের, আলোর চেয়ে তাতে ছায়াই যেন বেশি।

মাঠ ভেঙে আসতে আসতে হাশেম বললে, "মনে থাকে যেন আসছে মাসের শেষে যাচ্ছিস।"

"না, এবার আর নড়চড় হবে না।" নিত্য জবাব দিল।

হাশেম তাকে সাবধান করে দেয়। "আগের থেকে বলে রাখছি আমরা হলাম পদ্মাপারের লোক। পেঁয়াজ রসুন ঝাল ছাড়া এক পা চলি না"।

নিত্য উৎসাহের সঙ্গে বলে, "সে আমার খুব চলে। আমাদের বাড়িটা আবার আবার একদম ঘটি। খেলুম গেলুম, ডালে মিষ্টি দাও, নেবু আর নুচি। অসহ্য!"

দুই

ছুটির দিন, সকাল বেলা। একটা পালাপার্বণ আছে কোথাও ভবে পূজোর কোন বালাই নেই, নেহাত আপিস ইস্কুল ছুটি।

খুব ভোরেই হাসির স্নান করার অভ্যেস। খুব সকালে স্নান করে হালকা কমলা রঙের একটা শাড়ি জড়িয়ে হাসি যখন তাদের তেতলার ব্যালকনিতে উঠে এল তখন তার মনটা সেদিনকার সকালের মতই ঝলমল করছিল। আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই রোদ তেতে উঠেছে, কিন্তু অল্প অল্প মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে তার সাথে। তেতলা থেকে চোখে পড়ে সি. আর. দাশের সমাধি স্তম্ভের ওপরে আকাশখানা যেন এখনই গাঢ় উজ্জ্বল নীলের ছোপে ধোয়া হয়েছে। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের সামনে শিখ ড্রাইভারগুলো চারপাইয়ে বসে বসে এমন আরামে চায়ের গেলাসে চুমুক দিতে ব্যস্ত আর রেশনের ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে এমন ধীরে সুস্থে সিগারেট খেতে খেতে আপিসের বাবুরা বাজার ফেরতা চলেছেন যে স্বপ্নেও ভাবা যায় না এ রাস্তার প্রশান্তি কোনকালে ক্ষুণ্ণ হবে। অনেক দূরে প্রায় সূর্যের নীচ দিয়ে একটা এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে। হাতের আঙুলগুলো ফাঁক করে রুপোলী ডানাওয়ালা পাখিটাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখল হাসি; তারপর ভাবলে, "সুবোধকে

বিয়ে করা কি ঠিক হবে ?

হাসির হালকা মনে মেঘ উঠল। সুবোধকে বিয়ে না করেই বা কি করবে ? বিশ্বাসদের বাড়ির উমার মত চাকরদের ওপর খবরদারি করবে দিনরাত, ডালে মেথির ফোড়ন না হিঙের ফোড়ন দেবে তাই ভাববে সারা সকাল ? বাগানওয়ালা বোস সাহেবের বাড়ির মেয়েদের মত রুটিন করে সপ্তাহে একবার মেট্রো, লাইট হাউসে যাবে অথবা খেলার কিছু না জেনেও শ্রীনিকেতনের ঝোলান ব্যাগে কমলালেবু ভর্তি করে সানগ্লাস চোখে দিয়ে দল বেঁধে ক্রিকেট খেলার গ্যালারিতে ভিড় করবে ? কিংবা তার কলেজের বন্ধু বেলার মত ঝগড়া করবে ফার্স্ট বেঞ্চে বসার জন্যে, হুমড়ি খেয়ে নোট টুকবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ?

হাসি ঘরে ঢুকল। চৌধুরী টাইপ করছিলেন, মুখ তুলে তাকালেন। দীর্ঘকায় পুরুষ, বড় বড় চোখ, এ বয়সেও সে চোখের উজ্জ্বলতা ঘোলা হয় নি। শক্ত লম্বা কাঠামোটা তুমড়ে যখন টাইপ করছিলেন তখন তাঁকে একটু বেমানান দেখাচ্ছিল।

দাদাকে দেখেই হাসির মনের মেঘ উড়ে গেল। সত্যগোপাল তার ছোট ভাই নিত্যর কাছে, স্ত্রী জ্যোৎস্নার কাছে গম্ভীর, সুদূর, বেশ একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলেন সব সময়। আপিসে তিনি বড় সাহেব, একদিনের জন্যেও তাঁর গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হয় নি। কিন্তু হাসির বেলায় একেবারে আলাদা। কোন দূরত্বই বজায় রাখার প্রশ্ন ওঠে না।

হাসি দাদাকে দেখে মুখ টিপে হেসে বললে, "কি যে সব যা তা লিখছো আজকাল। এই ছাই-ভস্ম লোকে আবার পয়সা দিয়ে কিনে পড়ে। বেশ তো ছিলে, গান্ধী জিন্না করতে, রেল উল্টালে দৌড়তে, এখন আবার কি সব মাথামুণ্ডু লিখছো— টেবিলে কিভাবে আম ছাড়াবে ? সুবোধ পড়ে তো খুব তারিফ করছে, কী যে তারিফ করার আছে ছাই ! যেন টেবিলে ছুরি দিয়ে আম ছাড়াতে না পারলে পৃথিবী উল্টিয়ে যাবে।

চৌধুরী বললেন, "আমাদের দেশে জানিস তো ইংরেজি দিয়ে জ্যান্ত মানুষকে মরা বানানো যায়, মরা মানুষকে জ্যান্ত বানানো যায় ?"

"ও, তোমার সেই লেখাটা দাদা, দাঁড়াও—" হাসি প্রায় এক ছুটে তার ঘর থেকে একটা রুলটানা কাগজ নিয়ে এসে বলে, "কাল তোমার লেখাটা পড়ে খালি হেসেছি। দুপুরে কোন কাজ ছিল না, তোমার লেখাটার বাংলা করেছি। দেখো তো ঠিক হয়েছে কিনা।"

সত্যগোপাল কৌতূহলী হয়ে তাকান।

হাসি পা ঝুলিয়ে বসে। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে দাদাকে সাবধান করে দেয়, "হেসো না" কিন্তু তারপর গলাটা একটু চড়িয়ে দিয়ে পড়তে শুরু করে :

'গাজরের স্বপক্ষে'

'সবে শীত পড়তে শুরু করেছে, রক্ত সঞ্চালনের জন্যে এটাই সবচেয়ে ভালো সময়। যাদের একফালি জমি আছে আর বাগান করবেন ভাবছেন তাদের প্রধান ভাবনা হওয়া উচিত কেন গাজর বুনবো না।' এতদূর পড়েই হাসি খিক খিক করে হাসতে আরম্ভ করল। বললে, "কেমন হয়েছে?"

সত্যগোপালও হেসে ফেললেন, উৎসাহের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললেন, "পড় তো আর একটু।"

হাসি শুরু করল, 'কারণ গাজর আলু নয়, টমেটো নয় কিংবা ফুলকপি নয়, গাজর গাজরই। গাজর সেবা চায় না, বিলাস চায় না। একশো রকম জলের উপহারের জন্যে উদগ্রীব নয় গাজর। সে এই দেশের মানুষের মতই কষ্টসহিষ্ণু ও হৃদয়বান। তাকে বসিয়ে দাও যেখানে সেখানেই সে আসন করে নেবে।—'

সত্যগোপাল হাসি চেপে বললেন, "আর শেষটা, শেষটা কী করলি?"

হাসি পড়ে গেল, 'তা ছাড়া গাজর জাতে কুলীন। চীনে রাঁধুনী তার নিপুণ পাকপ্রণালীতে ফুলকপিকে বানাতে পারে চিংড়ির কাটলেট। আলুতে অমলেটের স্বাদ আনতে ইটালিয়ানরা শোনা যায় বড্ড নিপুণ। কিন্তু—"

হাসি তার কথা না শেষ করেই হেসে উঠল। চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু কী?"

হাসি এবার ছোট ছেলেরা যে ভাবে সচেতন হয়ে ধীরে ধীরে বানান উচ্চারণ করে, তেমনি কথাগুলো ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল, 'কিন্তু এক দুর-লং-ঘ ইতিহাসের ধারায় গাজর অপরি-বর্ত-নীয় ও অদ্বি-তীয়। ঝোলে দাও গাজর, স্যুপে দাও গাজর। গাজরের চরিত্র আছে, সে ফ্লার্ট নয়।'

পড়া শেষ হতেই সত্যগোপাল ও হাসি দুজনেই হেসে ফেটে পড়লেন। হাসি তো গড়িয়েই পড়ল। তারপর আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে বললে, "ওঃ তোমরা দাদা ইংরেজি দিয়ে কী যাদুই না করেছ। নইলে বেচারা সুবোধও তোমাদের কাগজ থেকে ফ্রেজ মুখস্থ করে রোজ সকালে উঠে। উঃ বাবা!" হাসতে হাসতে তার পেটে খিক ধরে গিয়েছিল।

চৌধুরী আরো কিছুক্ষণ টাইপ করলেন। তারপর পাশে যে ম্যাগাজিনখানা বাতাসে ফরফর করছিল সেটা টেনে নিয়ে পাতা উল্টাতে লাগলেন। এক জায়গায় হঠাৎ থেমে যান। একটা ধাঁধার ওপর খানিকক্ষণ চোখ বুলিয়ে বলেন, "আচ্ছা হাসি,

কমবয়সী মেয়েরা প্রেম করতে গেলে কী চায় রে ছেলেদের কাছ থেকে—ক্যাশ না ড্যাস ?"

হাসি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে ভুরু কুঁচকিয়ে জবাব দিল, "ধাঁধায় শুধু একটাই জবাব হয় দাদা। কিন্তু আসলে দুটোই লাগে ক্যাশও চাই ড্যাশও চাই।"

সত্যগোপাল ঠাট্টা করে বললেন, "সুবোধের তাহলে ইনক্রিমেণ্ট হয়েছে ?"

হাসি লজ্জা পেল। সমস্ত কথাটাকে এমন ব্যক্তিগতভাবে দেখার দরুন রাগ হল দাদার ওপর। রাগ করে বললে, "হয়েছে, তাতে কি ?"

চৌধুরী হাসলেন।

ঠিক এমনি সময় দরজা ঠেলে, সুবোধই ঘরে ঢুকল। অন্যদিন নীচে কলিংবেল টিপতো। তারও আগে কড়া নাড়তো আস্তে আস্তে। আজকে গট্‌গট্‌ করে ঢুকে বেতের চেয়ারে বসে পড়ল।

চৌধুরী সুবোধের সম্ভাষণের জবাবে মাথাটা একটু হেলিয়ে উঠে পড়লেন। চারদিকে ছড়ানো কাগজপত্রগুলো গুটিয়ে রাখলেন। তারপর একটা তোয়ালে কাঁধে ফেলে ঢুকলেন বাথরুমে।

সুবোধের চেহারা সত্যিই তাকিয়ে দেখবার মত। শাল কাঠের মত শক্ত জোরালো গড়ন, অথচ চওড়া হাতের থাবায় আঙুলের নখগুলো পর্যন্ত কী মিহি, সুন্দর করে কাটা, লদ্‌লদে বাঙালিবাবু কিংবা নতুন প্যাণ্টপরা বোকা কাপ্তেন, কোনটাই সুবোধকে দেখলে মনে হবে না। মুখের ভেতর দৃঢ়তা আছে, অথচ চোখদুটো বেশ কোমল, ভাসা ভাসা। চুল ঘন, কিন্তু এলোমেলো নয়, পরিষ্কার টানটান করে আঁচড়ানো। আর সবথেকে বড় কথা, মাকাল ফল বলে মনে হয় না। বুদ্ধির ছাপ আছে মুখচোখে, ভাবভঙ্গিতে।

সুবোধ কিন্তু একলা হাসিকে দেখে ভাবিত হয়ে পড়ল। আজকে না বলতে পারলে কারো কাছে আর মুখ দেখাতে পারবে না সে। এভাবে টানা-হ্যাঁচড়া আর কতকাল চলবে। কতকাল শুধু আপিস থেকে সপ্তাহে দু-বার করে হাজিরা দেবে, ক-বার মান্ধাতা আমলের অ্যালব্যামে তাদের বাচ্চা বয়সের ফটোগুলো দেখবে, আর কতদিন রেকর্ড শুনবে চুপচাপ করে। অকস্মাৎ কেমন গুমোট লাগতে আরম্ভ করল তার।

হাসি বেরিয়েছিল, ঢুকল চায়ের পেয়ালা হাতে। প্রতীক্ষায় চকচক করছে তার চোখ।

"আমি ভাবছিলাম, তোমার দাদাকে বলব, আমাদের বিয়ের কথা।" গলা না কাঁপিয়ে কোনও রকমভাবে সুবোধ বলে ফেললে কথাটা।

হাসি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এমন সহজভাবে যে সুবোধ ব্যাপারটা সারতে পারবে ভেবে তার নিজেরই মনে মনে শ্রদ্ধা বেড়ে গেল সুবোধের ওপর। নীচু গলায় বললে, "আচ্ছা ডেকে দিচ্ছি।"

সে সপ্তাহে শনিবারটা আপিস কামাই করলে সুবোধ। আর ছুটির এই দুটো দিন হাসির মনে হল, সে যেন সকালবেলার দেখা এরোপ্লেনের মত আকাশের নীল বুকে রুপোলী ডানা মেলে উড়ছে। প্রথম দিন স্টীমারে করে গেল রাজগঞ্জ। ফেরবার পথে ডেকের ওপর থেকে দেখল, গঙ্গার বুকে চাঁদ উঠছে। দু-দিকে অস্পষ্ট তীর, আর তার মাঝে বিরাট বিস্তৃত গঙ্গার বুকে ঢেউ এর ফেনাগুলো জ্বলছে নিভছে। যে অনিশ্চয়তার ভয় কিছু দিন হল হাসির মনে চেপে বসেছিল বাইরের খোলামেলায় তাকে হঠাৎ বড্ড অবাস্তব বলে মনে হল হাসির। ডেকের ওপরে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে অসংখ্য ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি মাঝ-বয়সী লোকের ভিড়। হাওয়া খেলা করছে তাদের চুলে, জলের ছিটে লাগছে কারো মুখে চোখে। মুসলমানদের কোন পরবের দিন বোধ হয়। লাল নীল সবুজ হলদে সারা ডেকময় অজস্র বেমানান রঙের বাহার।

সুবোধের হাত ধরে টেনে হাসি বললে, "চল, ওপরে যাই।" তারপর সারেঙের ঘরখানায় দুজনে উঠে এল। হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। চাটগাঁর মাল্লা ফৈজুদ্দিন এক হাত চাকায় দিয়ে আর এক হাতে দাড়ি নাড়ছিল। একটা টুল এগিয়ে দেয় সে, ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল দুজনে।

হাসির উৎসাহই বেশি। সুবোধের ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মুঠো করে হাসি। আস্তে আস্তে বললে, "বড্ড ভালো লাগছে সুবোধ।" তারপর হেলান দিল সুবোধের গায়ে, তার ঘড়িটা খুলে পরল নিজের হাতে। খানিকক্ষণ চুপচাপ যাবার পর সুবোধের গলায় একখানা হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করল হাসি, "বিয়ের পরও আমাকে ভালবাসবে তো সুবোধ?"

বেশ ধরা গলা। সুবোধ অবাক হয়। ফৈজুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়, হাসি বাড়াবাড়ি করছে। বিয়ে করাটাকে এমন অদ্ভুতভাবে দেখছে কেন হাসি?

"বিয়ের পর? বিয়ের পরের কথা বিয়ের পর জিজ্ঞেস করো হাসি।"

কেমন একটু কাঠকাঠ ভাবে কথাটা বললে সুবোধ। হাসি আহত হল কিনা বোঝা গেল না, ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে গলার কাছ থেকে হাতটা সরিয়ে, কাপড় চোপড়

সামলে নিয়ে বেশ ভদ্রভাবে বসলে টুলের কোনায়। তারপর বললে, "চল, নামি।"

পরের দিন সকালেও বললে হাসি, "চল, সুবোধ, গঙ্গার ধারে যাই।"

সুবোধ মনে করে এসেছিল, আজ সকালেই তাদের পরিবারের ইতিবৃত্ত বলবে আর হাসির দাদার কাছ থেকেও তাদের ইতিহাস জেনে নেবে। সুবিধে বুঝলে কথায় কথায় বিয়ের খরচ সত্যগোপাল কি রকম করবেন (যৌতুক নেবে না সুবোধ কোনও দিন), তাও জেনে নেবে। তাহলে মানিকতলায় তাদের পুরনো ভারী ভারী আসবাবগুলো বিক্রি করে দিয়ে তাদের নতুন হিন্দুস্থান পার্কের ফ্ল্যাটে কিছু হালকা ভালো ফার্নিচার আনতে পারে।

হাসি কিন্তু সব প্ল্যান ভেস্তে দিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুবোধকে বলতে হল, "চল।"

সুবোধ আর হাসি আউটরাম ঘাটে ঠিক জলের ওপর দোতলা রেস্তোরাঁটাতে গিয়ে বসল।

হাসি ভাবছিল, এত কাছে এত জিনিস থাকা সত্ত্বেও কেন লোকে বিলেত যায়, কাশ্মীর বেড়াতে যায় এত পয়সা নষ্ট করে। রেলিং দেওয়া বারান্দায় চা খেতে খেতে বিস্ফারিত চোখে হাসি একটা চিলের ঝাঁক দেখতে থাকে। কয়েকটা বজরার মাথার ওপর চিলগুলো নীচু হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। সকাল বেলার চকচকে রোদে গঙ্গার হলদে ঘোলাটে জলে তক্তা ভাসিয়ে একটা মস্ত কাছি ফেলে, সেগুলো নৌকার গলুই-এর সাথে বাঁধবার চেষ্টা চলেছে। মস্ত বড় সমুদ্রগামী জাহাজে সাদা কেবিন-গুলো ঝকঝকে করছে রোদে। কোন্ ফ্ল্যাগ লাগিয়েছে, হাসি ভাবছিল। ইংলণ্ডের আমেরিকার, জার্মানীর? জার্মানীর কী করে হবে? জার্মানীর জাহাজগুলো তো নিয়ে নিয়েছে ইংরেজ। হাসি কেমন তন্ময় হয়ে যায় জাহাজগুলো দেখতে। চোখে একটা বিস্ময়ের ভাব আসে। বলে, "এখানে সাবমেরিন আসে সুবোধ?"

সুবোধ বিরক্ত হয়, বড্ড ছেলেমানুষ লাগে হাসিকে। প্রেম করতে গেলে যে এ রকম বোকামি হজম করতে হয় প্রতি পদে, সেটা যেন নতুন করে খোঁচা মারছিল সুবোধকে।

সন্ধ্যের শোতে সুবোধ গেল মেট্রোতে হাসিকে নিয়ে। হাসি তন্ময় হয়ে দেখে। আসলে ভালোই ছবিখানা, তবে অপূর্ব লাগে হাসির কাছে। ছবিখানা বিখ্যাত সুরশিল্পী জন স্ট্রাউসের জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত। স্ট্রাউস ব্যাঙ্কে কলম পিষতেন, আর কানে ঝমঝম করে দিনরাত বাজত অপূর্ব সুরের বর্ষা। বিয়ে করলেন চেনা, হাতের কাছে পাওয়া এক আটপৌরে মেয়েকে, কিন্তু হঠাৎ ভালোবেসে ফেললেন আর একজনকে যে ঠিক মেয়ে নয়,—নারী। তারপর দানিয়ুবের তীরে

মেয়েরা কাপড় কাচছে, আর হাওয়ায় ঢেউ ভাঙছে আছড়ে আছড়ে, তাই দেখে গুন গুন করে আপন মনে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সৃষ্টি করলেন, সেই অমর নীল দানিয়ুবের গান। বিপ্লবেও যোগ দিলেন। তালিমারা প্যান্টপরা জনসাধারণের সাথে ড্রাম বাজিয়ে চললেন রাস্তায়। সিংহাসন কেঁপে উঠল। তারপর এক শীত-কালের শেষে, যখন শহরের শুকনো খ্যাংরা গাছের ডালে ডালে বসন্ত আসছে, ঠিক সেই সময় বেরুলেন, ভিয়েনার বনে, তার মনের মানুষকে সাথে নিয়ে। সবচেয়ে শেষ দৃশ্যে এসে গলা কেঁপে উঠল হাসির। ডান হাত দিয়ে পাশের হাতলে-রাখা সুবোধের হাতটা চেপে ধরল সে। শেষ দৃশ্যে একটা স্টীমার এসে ঘাটে দাঁড়াল। অনেক যাত্রী ওঠানামা করছে, তাড়াহুড়ো লেগে গেছে চারদিকে, মাল্লারা নোঙর তুলছে। আর একটা গ্যাসপোস্টের নীচে ফেল্টের টুপি হাতে নিয়ে নায়ক দাঁড়িয়ে। নায়িকা কাছে এল, হাতে হাত রাখল। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর নায়ক চোখে এক অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা এনে জিজ্ঞেস করলে, "এখন খুব একটা শক্ত কথা বলা দরকার, না ?" হাসি ঠিক এই জায়গাটায় কেঁপে উঠেছিল। স্টীমার ছেড়ে যাবার পরও একটা গানের সুর বাজছিল যে সুরটা দুজনেই ভালবাসত সমস্ত অন্তর দিয়ে।

আলো জ্বলে ওঠার পর চোখে জল নিয়ে হাসি বেরিয়ে এল। দু-নম্বর বাসের ভিড়ে ঠেলাঠেলি করে বসেও সে তার তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া উঠতে পারল না। লেডিজ সিট থেকে দুজন ছেলে বাধ্য হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কটমট করে তাকিয়ে থাকে এই বিহ্বল মেয়েটির দিকে।

হাসি সেদিন সিঁড়ির তলায় অন্ধকারে বৃষ্টির ছাটে দাঁড়িয়ে সুবোধের আলিঙ্গনের মধ্যে কেঁপেছিল। এক বিরাট অস্পষ্ট সম্ভাবনার কোন সুদূর কুঠরির দরজা যেন ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে তার সামনে।

হাসির মনে হয় সে আবার নতুন করে জন্মেছে। ঠিক এই মুহূর্তে এই সন্ধ্যেবেলা। যে সন্দেহের ভয় তাকে অহরহ পোড়াচ্ছিল তা আজ এই মুহূর্তে আলো করে দিয়েছে তার মন। সে নিজে বেশ সুখী লোক। গোলাপ ভালবাসে, কিন্তু যদি কেউ কষ্ট করে এনে দেয় তবেই না ভালো লাগে। কোন আনন্দের জন্যে তো সে কোনদিন ঝুঁকি নেয় নি। মা মারা যাবার পর থেকেই তো আছে দাদার কোটের তলায়। হাসির মনে হল তার সুখী নিরুপদ্রব সংসার থেকে তাকে কেউ টান মেরে বার করে দিয়েছে খোলা আকাশের নীচে। সেই আচমকা হ্যাঁচকা টানে সে ভয় পেয়েছে, ব্যথা পেয়েছে এতদিন। কিন্তু আজ সে অধীর হয়ে পড়েছে এক বিরাট মুক্তির

আনন্দে। হাসি ভাবল, আর সকলের কী কষ্ট, যারা এই মুক্তি পায় নি, সেই সমস্ত হতভাগ্য অসংখ্য মানুষের ভেতর অকস্মাৎ দাদার কথাই তার মনে হল সবচেয়ে আগে। নিজের আনন্দের মধ্যে হাসি যেন আবিষ্কার করল কেন সত্যগোপাল বিমনা হয়ে থাকেন, কেন তিনি অস্বাভাবিক কর্কশ হয়ে যান মাঝে মাঝে, কেন মেয়ের সামান্য চুলের জল মোছান হয় নি বলে বৌদির সঙ্গে কুরুক্ষেত্র বাসিয়ে বসেন। আর দাদার সাথে সাথে তার দুঃখ হল, আরও অনেকের জন্যে যারা এত বড় আনন্দ থেকে বঞ্চিত।

অল্প রাত্তিরে নীচের তলায় মাদ্রাজী পরিবার শুয়ে পড়েছে, তাই এই তরুণ তরুণীকে কেউ বিরক্ত করল না সেদিন।

সুবোধ অবাক হল, হাসির চোখ দেখে। তার উজ্জ্বল চোখে এক গভীর বিষাদ নেমেছে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে। এ যেন আর এক হাসি।

সুবোধের কাঁধে হেলান দিয়ে হাসি যেন নিজেকেই বললে, "সুবোধ ভালবাসবে, বিয়ের পরও ভালবাসবে সুবোধ।"

হাসির হৃদয়ের এ বিরাট আচ্ছন্নতা সুবোধের মনেও সংক্রামিত হয়েছিল। কিন্তু সুবোধ উদ্বিগ্ন হল সঙ্গে সঙ্গে। প্রেম করাটাকে হাসি এমন একটা সাংঘাতিক বিরাট ব্যাপার ভাবছে কেন, বুঝে উঠতে পারল না। কাছে কার পায়ের শব্দ পেয়ে, ধীরে ধীরে বিহ্বল হাসির হাতখানা গলা থেকে নামিয়ে বললে, "আজ চলি হাসি।"

করিডোরের মাথায় নিত্যর সঙ্গে দেখা। নিত্য কোনও সভাসমিতি থেকে ফিরছে। সুবোধ হেসে বললে, "কি মাস্টার, কী খবর? কাল যাচ্ছো নাকি খেলায়?"

সুবোধ জানত, তার সঙ্গে আগেকার দিনের ইস্কুলে-পড়া বন্ধুত্বের আর সব বন্ধন কেটে গেলেও নিত্য এখনও খেলা দেখার অভ্যেসটা কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

নিত্য একটু অন্যমনস্ক ছিল। খেলার নাম শুনে তার চোখ নেচে উঠল। বললে, "হ্যাঁ যাব, চ্যারিটি ম্যাচ কালকে না?"

নিত্যকে উৎসাহিত করার জন্যে সুবোধ বললে, "অমিয় বলেছে আসবে। একসঙ্গে যাওয়া যাবে। খেলার পরেও প্রোগ্রাম আছে।"

নিত্য জিজ্ঞেস করলে, "প্রোগ্রাম, কোথায়?"

"এই বীয়ার-টিয়ার।"

"বেশ তো।"

"ও সব বেশ তো, টেশ তো নয়। ঠিক আসা চাই!" সুবোধ চলে গেল।

নিত্যর অন্যমনস্কভাব তখনো কাটে নি, চিলেকোঠার ঘরে উঠে আগে আলো নেভান।

কালকের চাঁদ আরও দেরি করে উঠবে আজ রাত্তিরে, কিন্তু তারায় ভেঙে পড়ছে আকাশ। সেই আলোয় দেখল, হাসি ছাদের কোনায়, আলসের ওপর মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

"কীরে হাসি!"

হাসি মাথা তে'লে না। নিত্য যখন কাছে এল তখন হঠাৎ মুখ তুলে বললে, "মনে পড়ে ছোড়দা, জলপাইগুড়িতে ইস্কুলে যাবার রাস্তায় কবরখানাটা?"

গলার স্বরে চমকে উঠল নিত্য। এ যেন আর এক হাসির গলা।

ছোটবেলা থেকেই ছাড়াছাড়া দুজন। তারা যে ভাইবোন, সেটা কেউ বলে না দিলে মনে হয় না। হাসি ছোটবেলা থেকে মা মারা যাবার আগে পর্যন্ত লক্ষ্ণৌ-এ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল দিদিমার কাছে মানুষ। কলকাতায় ফিরে গান বাজনায়, আলাপে, ঠাট্টায় দিন দিন সে যত মশগুল হয়ে উঠল ততই নিত্য সত্যগোপালের ভাষায় কুনো আর অসামাজিক হয়ে পড়ল। বাড়িতে হাসির একমাত্র সঙ্গী ছোড়দা নয়, বৌদি নয়, সত্যগোপাল।

হাসি আবার বললে, "মনে আছে ছোড়দা, একদিন ইস্কুল থেকে আসবার সময় ঐ কবরখানাটার কাছে ব্যাগ-ম্যাগ ফেলে একেবারে হাঁফাতে হাঁফাতে আছড়ে পড়েছিলাম বাড়িতে, তারপর তুমি গিয়ে ব্যাগটা কুড়িয়ে আনলে?"

গলার স্বরটা আন্তরিকতায় ভয়ানক ভারী মনে হল নিত্যর। কি মনে করে বললে, "আচ্ছা হাসি, তুই কি সত্যিই ভালবাসিস সুবোধকে।"

হাসি চমকে উঠল। যেন তার মনের কোন গোপন জায়গায় হাত পড়েছে। তীক্ষ্ণ গলায় বললে, "সত্যি ভালবাসি মানে?"

তারপর নিত্যর অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে নিজের মনেই বললে, "ভালবাসব না কেন?"

এবার অবাক হল নিত্য এই নতুন অচেনা আওয়াজ শুনে।

হাসি ছাদ থেকে নেমে গেলে নিত্য ভাবল, কী ছিল হাসির গলায় যে তার কাছে এমন নতুন লাগল, এমন অচেনা ঠেকল?

তিন

খেলার মাঠ থেকে যখন তারা ফিরল, তখন চৌরঙ্গীতে সন্ধ্যে নেমেছে।

নিত্য ফিরে যাচ্ছিল। যে দলটি তার সঙ্গী তাদের সবাইকে চিনলেও, কি ভেবে কেটে পড়বার চেষ্টা করছিল সে। অমিয় হাত ধরে টান দিয়ে বললে, "কোনও কাজ আছে?"

"কোনও কাজ নেই, তবে—" নিত্য কথা শেষ করে না। বিশেষ যে কোন কাজ নেই তা গলার আওয়াজে স্পষ্ট।

অমিয় বললে, "তা হলে ঘণ্টাখানেকের জন্যে না হয় আমাদের মত আনকালচার্ড লোকদের সঙ্গে থেকে যা না। তোর অবশ্য খুব আপত্তি থাকলে—"

"না, না, আপত্তি কি! তবে হাশেম বসে থাকবে কিনা।"

সুবোধ বললে, "থাকুক না, ও তো শুনি এখন রোজই আসে!"

নিত্য হয়তো একটু থেকে যেত কিন্তু সুবোধের কথায় মাথা নাড়াল, তাকে ফিরেই যেতে হবে। এভাবে নিত্যর কেটে পড়ায়, সকলেই একটু ক্ষুব্ধ হল মনে মনে। হাশেম অপেক্ষা করবে, তার জন্যে সামান্য তর সইছে না, এটা হাবভাবে ও নিত্যর কথায় এমন পরিষ্কার যে কারো কাছে এই অসামাজিকতা অন্য বন্ধুদের প্রতি অবজ্ঞা বলেই মনে হয়। নিত্য যেন দয়া করে এতক্ষণ তাদের সঙ্গে ছিল। একটা ছুতো করে বেরিয়ে গেল।

সুবোধ তার ছেলেবেলার ইস্কুলে-পড়া বন্ধু। তারই লাগল বেশি। বললে, "এ কি আমায় বিশ্বাস করতে হবে যে, নিত্য সিরিয়াসলি পলিটিক্স্ করছে?"

বুড়ো বললে, "বড়লোক দাদা-বাবা থাকলে, ও সব পলিটিক্স্ করার হবি টেক্ আপ করা যায়। আমরা হলুম গিয়ে লোয়ার ডেপথের মানুষ, একেবারে সাধারণ লোক। আমাদের তো আর ওসব বড় বড় কথায় পেট ভরবে না।"

অমিয় বললে, "না, আমি জিনিসটাকে ও ভাবে দেখি না। পলিটিক্স্ করার কথা উঠলেই আমার মনে হয় ঐ যে কি একটা কথা আছে না, সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়, সেই কথাটা। কবে ভবিষ্যতে যখন আমি মরে সাবাড় হয়ে যাব, তখন লোকে খেয়ে পরে মজা করে থাকবে, কিংবা সারারাত ধরে নাচবে এতে আমার কি এসে যায়? এর জন্যে আমার জীবনটা দিতে যাব কেন? কী রকম অ্যাবসার্ড লাগে ব্যাপারটা!"

সুবোধ আবার বললে, "তুই কি সত্যিই ভাবিস, নিত্য সিরিয়াসলি পলিটিক্‌স্ করবে। সব বাজে।"

মাঠ ছেড়ে যখন তারা রাস্তাটা পার হচ্ছিল, তখন প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে যায়। অমিয়ই কথাটা পাড়লে; ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, "মাত্র সওয়া ছটা। এত সকাল সকাল বাড়ি ফিরে কী লাভ! তার চেয়ে চল একটু বীয়ার খেয়ে আসা যাক।"

বাস্তবিক বেশ একটা বীয়ার-বীয়ার ভাব এসেছে, সকলের মনে। বাবুন মুখার্জী সোৎসাহে মাথা ঝাঁকিয়ে ওয়াটারপ্রুফটা হাত বদল করে জবাব দিল, "আজকে খেলাটা যা টেম হয়েছে, একটু চাঙ্গা হওয়া দরকার।"

সন্ধ্যের এসপ্ল্যানেড। এক পশলা বৃষ্টি হবার পর চকচকে কালো পিচের রাস্তায় লাল নীল আলোর মালা, ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে সারি সারি নতুন মডেলের ট্যাক্সি, ফেরিওয়ালার ক্যারিওনেটে বিং ক্রসবির গান, মেমসাহেব ও তার কুকুরের বাচ্চা, মেট্রো সিনেমার ওপরে মস্ত বড় পোর্ট্রেটে মদালসা হলিউডের নায়িকা এবং তাঁর পায়ের ফাঁকে লীলায়িত আলোছায়ার খেলা। সেদিকে তাকিয়ে অদূরেই চিত্রার্পিত নায়ক, নীচে সিনেমা শেষের ভিড়। ফারপোর নাচের টেবিলে অগণিত মারোয়াড়ী তরুণ, সঙ্গে এদেশী অনেক তরুণী, তাদের ব্লাউস আর শাড়ির মাঝখানে নতুন কায়দায় বোধহয় কিছুটা হাওয়া লাগাবার জন্যেই অনেকখানি ফাঁক। বেশ জমজমাট সন্ধ্যে।

কেমন একটা চাপা উত্তেজনা সকলের মুখে চোখে। ফুর্তি করতে হবে এখানে এসে, অনেকের মুখে এ ভাবখানা একেবারে ফেটে পড়ছে। ট্যাক্সিওয়ালা, ফিটন-কোচওয়ান, রিক্সাওয়ালা সকলেই যেন উৎকণ্ঠিত ফুর্তি বিতরণের জন্যে। বৃষ্টি থেমে গেলেও তার নিঃশ্বাস গায়ে এসে লাগছে।

চলেছে সাহেব-মেম প্রিন্সেসে নাচবার জন্যে হাত ধরাধরি করে। সাচু তার মনের কথাটা এতক্ষণে বলেই ফেলল, "সত্যি এরাই বাঁচতে জানে, যেমন দিনের বেলায় কাজ, তেমনি জানে রাত্তিরে প্লেজার কাকে বলে।"

সমস্ত দলটাকে কিছুটা ম্রিয়মাণ দেখাল সাচুর কথায়।

পাশেই বই-এর দোকান; ফুটপাতে বিলিতি ম্যাগাজিন, তার মধ্যে আমেরিকানই বেশি। কভারের পাতায় বেশির ভাগই কমবয়সী নানা ধরনের তরুণী, দয়া করে একটুকরো কাপড় রেখেছেন গায়ে। যে দুটি বই-এর বেশি কাটতি, অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক স্টলের সামনের দিকে সাজানো, ইংরেজিতে লেখা সেই বই-দুটির নাম

'বিছানায় আনন্দ' এবং 'একজন যৌনতাত্ত্বিকের ভ্রমণকাহিনী'।

সাচু বললে, "দেখেছিস, চারদিকে কেমন এয়ার-কণ্ডিশানের হিড়িক পড়েছে।"

তাদের পাশেই দু-তিনখানা রেস্তোরাঁয় এই ব্যবস্থা। তারা অবাক হয়ে একটি দোকানের সামনে বিজ্ঞাপন পড়ল, "জীবন দুঃখময়, কিন্তু এমন স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা ব্যবস্থা আমাদের দোকানে করেছি যে, চুলকাটার দুঃখ আপনি নিঃসন্দেহে ভুলে যাবেন।"

বীয়ারে ঠিক গায়ের ব্যথা সারল না, তাই ব্র্যাণ্ডি আনালে অমিয়। টাকার জন্যে একেবারে কারো পকেট ফাঁক করবার প্রয়োজন নেই, সবাই চাঁদা দিচ্ছিল।

বুড়ো বলে যে ছেলেটি সকলের চেয়ে লম্বা, বয়স বেশি এবং বন্ধুবান্ধবদের মহলে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভাজন, সে-ই কথা শুরু করলে সুবোধের দিকে তাকিয়ে, "আচ্ছা সুবোধ, কী তোর টেস্ট মাইরি, সেদিনকার মেয়ে হাসি, তাকে পটাচ্ছিস।"

সুবোধ অপ্রস্তুত বোধ করে বুড়োর আক্রমণে। তবু হেসে বেশ ইয়ারী কণ্ঠে জবাব দেয়, "না হাসি মাল ভালো।"

বাবুন এতক্ষণ নিমগ্নচিত্তে একটা টেক্কামার্কা দেশলাই-এর দিকে তাকিয়ে চোখ কুঁচকিয়ে ছিল। চেহারাটা বেশ সুন্দর তার। কিন্তু হাঁটা, চলা, কথাবার্তায় সব সময় মনে হয়, সে যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চলন ফেরন নিজেই তারিফ করছে। নেশা এসেছিল কিনা, বোঝা গেল না, বেশ জড়ান-জড়ান গলায় বললে, "মেয়েরা আমার কাছে একটা ইমেজ।"

"মেয়েরা আমার—" বুড়ো তার কথাটা শেষ করলে না, কিন্তু সকলেই হৈ হৈ করে হেসে উঠল।

সাচু এতক্ষণ ধরে সুযোগ খুঁজছিল কিছু বলবার জন্যে। আসলে সাচু এদের মধ্যে বুদ্ধিতে একটু মোটা। কিন্তু দাদা বড় ব্যারিস্টার, গোখেল রোডে বাড়ি এবং বিলেত থেকে তার ফেরার পর দাদার দৌলতে ব্রিফের অভাব হবে না—এসব ভেবে তাকে কেউ ঘাঁটাত না। সাচুর বিলেত যাওয়াও প্রায় পাকা হয়ে এসেছে। বেশ চমকপ্রদভাবে কথা বলার চেষ্টা করে সে। গেলাসে আস্তে আস্তে চুমুক দিতে দিতে বললে, "যাই-ই বল, কোনও মেয়েই আমাকে ইম্প্রেস করলে না। আমি এমন একটা মেয়ে চাই, যে হবে অনেকটা বার্নার্ড-শর ক্যানডিডার মত।"

"ও রকম গাঁজা অনেক শুনেছি। আসল কথা হল; পুরুষমানুষ মেয়েমানুষকে চায়, মেয়েমানুষ পুরুষমানুষকে চায়।" বুড়ো শান্ত গলায় সাফ জবাব দিলে।

বন্ধুদের মতে এ [illegible] বুড়ো একজন এক্সপার্ট। নেপালী ঘেঁটেছে, চীনে ঘেঁটেছে, ফিরিঙ্গি, পাঞ্জাবী কেউ বাদ যায় নি। তাই সে যখন কিছুক্ষণ ভেবে মেয়েদের
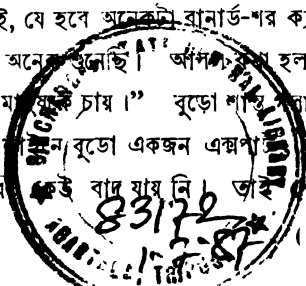
সম্বন্ধে তার রায় দিলে, "মেয়েরা হবে পাঁউরুটির মত, বেশ নরম আর গরম," তখন সুবোধের মত ধীর স্থির লোকের চোখও চকচক করে উঠল।

বাবুন আপত্তি জানায়। দু-বার পরীক্ষার হল থেকে উঠে এসে বি-এ পাশ করবার পর থেকে সে আজও উড়ছে। এখন একটু ক্লান্ত। এক মেসোমশাইকে ধরে বার্ড, না বার্ণ কোথায় সম্প্রতি বেশ মোটা চাকরিতে ঢুকেছে; আর লক্ষ্মী ছেলের মত বিয়েও করবে, এই মাসের মধ্যে। বিষণ্ণ গলায় বাবুন প্রতিবাদ জানায়, "দেখ বুড়ো, তুই যতই বল, ও ব্যাপারটা বেশি দিন চলে না। তুই হয়তো বিশ্বাস করবি না, বলবি লায়ার, কিন্তু লাস্টয়ার সেই সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর বাড়িটায় গিয়েছিলুম তোর সঙ্গে, একদম এনজয় করতে পারি নি। সেই আগেকার আনন্দ যেন মরে গেছে। কেমন যেন বিজনেস বিজনেস লাগে।"

বুড়ো বললে, "তার মানে তোর মন মরে গেছে। মেয়েদের সঙ্গ যখনই তোর কাছে ভালো লাগছে না, তার মানেই তুই বুড়ো হয়ে গেছিস। দেখিস না, এত গ্রেট মেন, এত রাইটার, অ্যাক্টর, মেয়েদের কম্পানী ছাড়া কেউ বড় হয়েছে?"

বাবুন কি বলতে চাইছিল, কিন্তু টেবিলের কোণটায় এতক্ষণ চুপচাপ করে সকলের কথা শুনছিল অমিয়, সেই এবার মুখ খুলল। বাবুনের দিকে তাকিয়ে একটা ইংরেজি কবিতার লাইন আওড়াল—

Her lips touch me,
Her hands touch me,
She cannot touch my loneliness!

তারপর জড়িয়ে জড়িয়ে বাংলায় বললে, "তার ঠোঁটের ছোঁয়া আমি পাই, তার হাতের ছোঁয়াও পাই, কিন্তু সে? সে আমায় ছুঁতে পায় না।"

বাবুন লাফ দিয়ে চিৎকার করে উঠল, "লাভলি, লাভলি!" উঠে গিয়ে আলিঙ্গন করলে অমিয়কে।

অমিয় তার হাত ছড়িয়ে দিয়ে বললে, "মদ খেয়েছিস, মনে থাকে যেন। ও রকম জড়াজড়ি করস না, লোকে গাল দেবে।"

বুড়ো গম্ভীরভাবে রায় দিলে, "আমি সবাইকে বলি, আজও খোলাখুলি ভাবে বলছি, আমাদের মধ্যে যদি কারো গ্রেট হবার পসিবিলিটি থাকে, তো আছে অমিয়র।"

সাচুর আত্মধিক্কার এসে যাচ্ছিল। প্রত্যেকবারই কোনও কথাবার্তা উঠলে, সবচেয়ে কম কথা বলে এরকম হিরো হয়ে যায় অমিয়। নিজেও তো সে এ ধরনের কয়েকটা লাইন বলতে পারত, এরকম ইংরেজি কবিতা না পড়েছে এমন নয়।

একটু সাবধানে অমিয়কে জিজ্ঞেস করলে, "ওটা লিখেছে কে ?"

অমিয় হাসল। সে যেন সাচুর মনের কথাটা বুঝতে পেরেছে। হাসবার সময় সামান্য বিদ্রূপে নাকের একপাশ কুঁচকে গেল, বললে, "শেলি লেখেন নি, ওটা লিখেছে, অমিয় দত্ত।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাচুকে হাসতে হল। গ্রেট হবার আর কোন চান্স পেল না সাচু, সেদিন সন্ধ্যে বেলায়।

চার

কোথায় হাশেম, হাশেমের কোনও পাত্তা নেই।

প্রায় সাড়ে ছটা অবধি অপেক্ষা করবার পর নিত্য মনে মনে হাশেমকে গাল দিলে, তারপর ভাবল, ওরকম তাড়াতাড়ি সুবোধদের সঙ্গটা ছেড়ে আসা তার ঠিক হয় নি। বিশেষ করে সুবোধ যখন তার নিকট আত্মীয় হতে চলেছে, তখন তাকে আরও কিছুটা সৌজন্য দেখান উচিত। তারপর নিজেকে সমর্থন করবার জন্যেই মনকে বোঝাল, বীয়ার তো আগেও সে খেয়েছে সেজন্যে তো আর ফিরে আসে নি, তবে হাশেম ফিরে যাবে, এইজন্যেই না এত সাত-তাড়াতাড়ি আসতে হল।

বেশ ক্ষুব্ধমনে সাড়ে সাতটা বাজবার কয়েক মিনিট আগেই নিত্য নামছিল। সিঁড়ির নীচেই এক ভদ্রমহিলা।

কালো চুলপেড়ে শান্তিপুরী শাড়িতে জলজ্বলে হীরের ব্রুচ। বছর পঞ্চান্ন বয়স, মৃন্ময়ী দেবী। নিত্যদের বাড়িতে অবশ্য হাসি থেকে গুজারাম পর্যন্ত সবাই ডাকে ভবি-দি বলে।

নিত্যকে দেখে একগাল হেসে ভবি-দি বললেন, "এই যে, নিত্য, তোমার যে আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না। হাসি কোথায় ?"

বাড়ির অনেক দিনের চাকর গুজারাম, পেছন থেকে বলে উঠল, "আপ বৈঠিয়ে উপরমে, হাসি দিদিমণি গিয়েছে পাশের বাড়ি, আভি আসবে।"

ভবি-দি বললেন, "হ্যাঁ, তাই ভালো, আমি একটু জিরিয়ে নি। নিত্য তুমিও এস ওপরে।"

নিত্য মুখটা যতদূর সম্ভব প্রফুল্ল করে বললে, "চলুন, মাসীমা।"

নিত্যদের বাড়িতে ভবতোষ মুখার্জীর স্ত্রীকে কেন ভবি-দি বলা হয়, তার একটু ইতিহাস আছে। সেটা কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও, বলা দরকার।

নিত্যর বাবা যখন বর্ধমানে ওকালতি করতেন, তখন ভবতোষ বাবু ছিলেন সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট। ভবতোষ বাবুর স্ত্রী খুব সোশ্যাল বলে শহরের ভদ্রজনদের ভেতরে খ্যাতি ছিল। তিনি একসাথে নারী সমিতির প্রেসিডেণ্ট, অনাথ আশ্রমের জয়েণ্ট সেক্রেটারী, ব্রতচারী সংঘের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট এবং আরও কি কি ছিলেন। সেই সূত্রে নিত্যর মার সাথে ভবতোষ বাবুর স্ত্রীর আলাপ। তারপর কোথাকার জল কোথায় গড়াল। নিত্যর বাবা মারা গেলেন। মাও মরলেন সাত-আট বছর পর। নিত্যর দাদা সত্যগোপাল যতদিন পর্যন্ত হাতড়ে হাতড়ে বড় না হলেন, ততদিন কালিঘাটে তাদের এক মামার বাড়িতে উঠতে হল। আর ওদিকে ভবতোষ বাবু রিটায়ার করবার মুখে সেক্রেটারিয়েটে কি একটা নামজাদা কিছু করলেন, তারপর অবসর নিয়ে গেলেন, উড়িষ্যার কোন স্টেটে দেওয়ানী করতে। দেওঘর না গিরিডিতে বাড়ি তুললেন হাওয়া খাওয়ার জন্যে। বালিগঞ্জে তেতলা তুললেন, গাড়ি কিনলেন, কোন রাজা সাহেবের ভাইকে বাগিয়ে রেফ্রিজারেটর আনলেন ভাঁড়ার ঘরে, বড় ছেলের বিয়েতে যৌতুক পাওয়া মরিস গাড়িতে চড়ে বেড়াতে গেলেন লেকে—অ্যালশেসিয়ান কুকুর নিয়ে, ফ্ল্যানেলের পা-জামা পরে আর মুখে পাইপ দিয়ে। তারপর পট করে একদিন মারা গেলেন। চৌষট্টি টাকা মার্কা ডাক্তারের অভাব হয় নি। মরবার কয়েকদিন আগে যেমন তাঁরা আসেন, ঠিক তেমন ভাবে নয়; মাস দুয়েক আগে থেকেই দেখছিলেন তাঁরা। তবে যেমন সাধারণত হয়, ঠিক ধরতে পারেন নি। ডায়্যাবিটিস ছিল না, ব্লাড-প্রেসারও প্রায় নর্ম্যাল ছিল। সুতরাং তাঁদের আসা-যাওয়ার জবাবদিহি হিসেবে হার্টের কি একটা দীর্ঘ ইংরেজি সমাসবদ্ধ নাম আবিষ্কার করে তাঁরা বিদায় হলেন।

ভবি-দিকে ওপরে নিয়ে যেতে যেতে নিত্যর মনে পড়ে গেল, মৃত্যুর দিনটার কথা। মৃত্যুটা আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে দুঃখের বিষয় বলেই সে জানত। কিন্তু মৃত্যু নিয়ে যে এরকম থিয়েটার করা যায়, তা সে ভাবতে পারে নি। হাসির সঙ্গে ভবতোষ বাবুর ঘরে ঢুকেই তার মনে হয়েছিল, তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। যেন বেশিক্ষণ এরকম চললে, তাকে চেঁচিয়ে উঠতে হবে। ভবতোষ বাবুর ছোট ছেলে নিত্যর সাথে কলেজে পড়ত, সেই বাবুন মৃত বাবার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে কি যেন একটা হাত-পা নেড়ে আবৃত্তি করছিল। খানিকক্ষণ যাবার পর নিত্য আবিষ্কার করে যে, ওটা বাবুনেরই লেখা।

বাবুন যে ভাল ফুটবল খেলত, তা নয়। তবে খেলার অজুহাতে মদ খেতে শিখল বাবুন মুখার্জী। তার বাবার টাকা আছে, সেটা বন্ধুবান্ধবদের প্রকারান্তরে জানিয়ে দিতেও ছাড়ল না। যুদ্ধের নেশার মত্ত কলকাতার চোখে ঠুলি-দেওয়া অন্ধকারে অনেক স্বচ্ছল অলিতে গলিতে বাবুন মুখার্জী তার অনেক বন্ধুবান্ধবদের আনন্দ ছড়িয়েছে। আব আজ যখন সে ধরো-ধরো গলায় তার পিতার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে থিয়েটার করছিল, আর সাপ্টেস্থপ্টে শাড়ি জড়ানো নতুন কায়দায় কাটা ব্লাউজ পরে খুব পাতলা করে, যাতে না বোঝা যায় এমনি ভাবে পাউডার আর ব্রাইডল মেখে কমবয়সী মেয়েরা ভবতোষ বাবুর মাথায় কাছটায় রজনীগন্ধার ঝাড়-গুলোর মাঝখান থেকে ছল ছল চোখে তাকিয়েছিল তার দিকে, এবং থেকে থেকে সশব্দ বাতাসের ঝাপটার মত এসে একটা মূর্তিমতী শোকের রূপ ধরে ভবি-দি স্বামীর পায়ের কাছে বেড-কভারটা নিপুণভাবে টেনে দিচ্ছিলেন, তখন নিত্য ভেবেছিল, বোধ হয় সে সশব্দে হেসে ফেলবে।

আরও নিত্যর নিজেকে সামলান মুশকিল হয়েছে যখন শান্তিনিকেতন থেকে (অন্তত সেরকমই শোনা গিয়েছিল), কে একজন এসে গম্ভীরভাবে উপনিষদ থেকে আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলেন। তারপর একজন কর্পোরেশন-কাউন্সিলার উঠে দাঁড়িয়ে ভবতোষ বাবুর দেশসেবার ইতিহাস বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন—কবে কোথায় বগুড়ায়, না, বাঁকুড়ায় থাকতে নিজের চাকরি বিপন্ন করে গান্ধীজির সাথে দেখা করেছিলেন তিনি। জাতীয়তাবাদী পত্রিকাদের তরফ থেকে দুজন রিপোর্টারও এসেছিলেন, তাঁরা চোখ-কান উন্মুখ করে সব কিছু শুনলেন। ক্রিসেনথিমাম ও রজনীগন্ধার ঝাড় ভবতোষ বাবুর মৃত মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে যাতে ভাল ভিউ পাওয়া যায় সেরকম পরপর দুখানা ছবি তুললেন। আর কর্পোরেশন-কাউন্সিলার যা বললেন, হুস-হুস করে লিখে গেলেন সারাক্ষণ বসে বসে।

ভবতোষ বাবুর স্ত্রী মৃন্ময়ী দেবী তখনও কিন্তু ভবি-দি হন নি। সে নামটা তিনি লাভ করেন স্বামীর মৃত্যুর পর। ব্যাপারটা সংক্ষেপে হল এই—স্বামী মারা যাবার পর তিনি স্বামীর চেয়েও নিজেকে বড় অফিসার ভাবতে আরম্ভ করলেন এবং তাঁদের পরিবারের কীর্তি শোনাবার জন্যে শ্রোতা খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। হাসি থেকে আরম্ভ করে গুজারাম পর্যন্ত ভবি-দিকে দেখলে সবাই সরে পড়বার অছিলা খোঁজে। আর আজ ভবি-দি যে এমনভাবে চড়াও হবেন আর সে নিজেই ফাঁদে পড়বে এ ব্যাপারটা ভেবে মনে মনে বিরক্ত বোধ করছিল নিত্য।

বসবার ঘরটায় ঢুকে, একবার সামনের গ্রুপ ফটোটার দিকে তাকিয়ে, চোখ নামিয়ে

যে দিকে কাল রাত্রে নিত্য আর তার বন্ধুরা ঘরের কোণে দেশলাই আর পোড়া সিগারেটের টুকরো ছড়িয়ে অপরিষ্কার করে রেখেছিল এবং সবার শেষে কৌচের যেখানটায় বেশ ছিঁড়ে গিয়েছে, আর তাকে ঢাকতে গিয়ে বিশ্রীভাবে একটা ভুল সুতো দিয়ে রিফু করা হয়েছিল—মানে সমস্ত ঘরখানা একটা একটানা সহানুভূতির চোখ দিয়ে দেখে ভবি-দি বললেন হাসির ভাব করে, "হার্টের অসুখ আছে কিনা, একটু জিরিয়ে নি।"

তারপর বসে পড়েই একটু বেশ স্পষ্ট করেই হাসতে লাগলেন, যেন কি একটা ভাবতে শুরু করেছেন, কি একটা ভেবে তাঁর খুব মজা লাগছে।

"রুবুর কাছে গেছলাম আবার," ভবি-দি বললেন।

নিত্য উত্তরে হাসবার চেষ্টা করলে।

ভবি-দি আবার বললেন, "রুবুকে কোয়ার্টারই দিয়েছে, বেশ গঙ্গার ধারে সাহেবী মডেলে। বসন্তর আবার সবটাতে খুঁতখুঁত।"

নিত্য একবার মনে মনে আঁচ করবার চেষ্টা করলে, ব্যাপারটা কি। বসন্ত মানে, ভবি-দির মেয়ে রুবির স্বামী বসন্ত। সেই যে ব্যারাকপুর না কোথাকার লেবার অফিসার।

"বসন্তকে চেনো নিশ্চয়ই।" ভবি-দির কথায় তার অন্যমনস্কতা সামলে নিল নিত্য। হ্যাঁ জানাবার জন্যে, ঘাড়টাকে একটু বেশি রকম দুলিয়ে দিল।

ভবি-দি আবার আরম্ভ করেন, "বসন্ত বললে, গঙ্গার ধার হলেই হল! স্যানিটারি প্রিভি না হলে—শেষ পর্যন্ত করিয়েই ছাড়ল।"

এবার ভূমিকা শেষ করে কথা কইবার সহজ ভাব এসে গেছে, মনে করে ভবি-দি বললেন, "খুব তপসে মাছ, ধরলেই হল। ওদের আবার লেবার লাগে না কিনা!"

নিত্য ঠিক ধরতে পারল না শেষ কথাটা। ভবি-দির ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে বলবার অভ্যাস আছে, জানা সত্ত্বেও বুঝল না। জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে বলল —"মানে?"

বলেই মনে হল ভুল করেছে। বাস্তবিক কী দরকার বসন্ত বেগার দিয়ে ঘরসংসার চালায় কিনা, কয়লা ভাঙায় কিনা, মাছ ধরায় কিনা, সে খবর রেখে?

"তোমরা তো লেখাপড়া যথেষ্ট শিখেছ," ভবি-দি বললেন।

নিত্য বুঝতে পারল, চটলে ভবি-দি এই বলে কথা আরম্ভ করেন।

ভবি-দি কিন্তু আজকে ঠিক চটলেন না। বললেন, "আমরা যখন বামরা স্টেটে ছিলাম, তিন মাইল থেকে জল বয়ে এনে দিয়েছে, এক পয়সা দিয়েছি কখনো?"

নিত্য ঘাড় নাড়িয়ে বললে 'ও'।

ভবি-দি তাঁর লম্বাটে মুখখানা নামিয়ে, ঘাড়ের পাশে বসানো জ্বলজ্বলে ব্রচটা ঠিক করে নেন, যেন আবার কোন নতুন দুর্গ আক্রমণ করবেন, এমন ভাব করেন।

নিত্য মনে মনে প্রমাদ গনল। এবার নিশ্চয় সে রাজাসাহেবের কোনও ভাই তাঁর রুবুকে জন্মদিনে কী দিয়েছিল, তার বর্ণনা করবেন, কিংবা বাবুনকে কী বলেছেন বার্ড কোম্পানীর বড় সাহেব গত তিন চার দিনের মধ্যে, সে সব বললেন হেসে হেসে। নিত্য ভাবল, এবার উঠে পড়বে। উঠে পড়ে না হয় বললেই চলবে—"হাসি বোধ হয় আসতে দেরী করবে, আমার মাসতুতো বোনের আশীর্বাদ কিনা আজ।"

কিন্তু ইতিমধ্যেই ভবি-দি চোখে একটা উৎসাহের ভাব এনে ফেলেছেন। বলে উঠলেন, "অবাক হবে শুনলে, টিকায়েৎ মণি (উড়িষ্যার রাজাদের ছোট ভাই) কিছুতেই ছাড়ছে না। এবারের গরমে তাঁদের পুরীর বাড়িটায় অন্তত দিন পনেরর জন্যে রুবুকে নিয়ে যেতে লিখেছেন।"

গলায় একটু মিহি খঁাকারি দিয়ে বললেন, "রুবুকে খুব ভালবাসতেন কিনা। লিখেছেন—কিছুতেই ভাবতে পারছেন না, ফ্রক পরে, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল দুলিয়ে যে মেয়েটি তাঁর বাগানে খেলা করত, আর পার্টিতে এসে চায়ের কাপ ভাঙত, সে এখন বড় হয়ে স্বামীর ঘর করছে!"

কোন পার্টিতে না কোথায় কোন পারমিট পাবার আশায় কে এক অযোধ্যা সিং রুবির জন্মদিনে একটা নেকলেশ দিয়েছিল, সে উপাখ্যান যে তাঁর বলা উচিত নয়, সে কথা ভবি-দি একবারও ভাবলেন না। বললেন, "রুবু বলছিল, আজও তাঁর অযোধ্যা-দাকে মনে পড়ে।"

নিত্য এ রকম একতরফা আলাপে ক্রমশই অস্বস্তি বোধ করছিল। একবার আড়চোখে দেখে নিল বড় ঘড়িটার কাঁটা নটা পার হয়েছে। মাথা ফেরাতে দেখল, ভবি-দিও যেন একটু হাঁপিয়ে গিয়েছেন। হাতের ব্যাগটা থেকে ভয়েলের ছোট্ট একটা রুমাল বের করে ঠোঁটের দু-দিকটা আলতোভাবে মুছলেন।

"হাসিকে কোনও দিনই এসে আর পাওয়া যায় না", এই বলে কৌচের যে দিকটা বিশ্রীভাবে রিফু-করা সেদিকে তাকালেন ভবি-দি। তারপর ব্যাগের একটা ফাঁক থেকে লাল রঙের একখানা খাম বের করে বললেন, "বাবুনের বিয়ে, বুঝলে—সামনের শনিবার।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নিত্য শুধু শুনে গেল, ভবি-দির কথা—"বাবুন নিজেই আসবে তোমাকে নেমন্তন্ন করতে, আর আমিও একবার আসব, সত্যকে বলতে।

তোমার দাদা হয়তো চিনবেন, তোমরা তো আর খবর রাখো না। সেই যে এ. কে. দত্ত, আই-সি-এস তাঁরই নাতনি। খুব চমৎকার মেয়ে।"

সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে একবার জিরিয়ে নেন ভবি-দি; তারপর গাড়ির দরজা যখন নিত্য খুলে ধরে থাকে তাঁর উঠবার জন্যে তখন তাঁর পূর্বেকার হাসি-হাসি ভাবখানা মুখে এনে মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন ভবি-দি, "লরেটোতে পড়ত কিনা।"

পাঁচ

পরদিন দুপুরে হাশেম এল।

নিত্য চেঁচামেচি লাগিয়ে দিলে, "তোর জন্যে কাল মিছিমিছি বাড়ি ফিরলাম তাড়াতাড়ি। ওঃ ফিরে এসে যা নাকানি চোবানি।"

দিগ্বিজয়ী ভবি-দির কথা, হাশেমও শুনেছিল। কাজেই তার অবর্তমানে নিত্যকে যে বেশ বেকায়দায় পড়তে হয়েছে তার জন্যে সে লজ্জা পেয়ে বলে, "বাড়িতে একটু কাজ ছিল রে, কিছুতেই শেষ করে আসতে পারি নি।"

তারপর নিত্যর হাতের বইখানার দিকে চোখ পড়ায় বলে উঠল, "কী পড়ছিস?"

একটি রাশিয়ান উপন্যাস, নিত্য দেখাল বইটা।

নিত্য বললে, "দারুণ বইটা। তবে টেলেগিনের চেয়ে রশচিনকে আমার আরও ভালো লাগে। রশচিনের চরিত্র আরও জটিল আরও রিয়্যাল।"

সাহিত্য নিয়ে তর্ক ফাঁদতে অনেকের জিভই সুড়সুড় করে। নিত্য আর হাশেমের মধ্যেও কিছুক্ষণের জন্যে তুমুল তর্ক বেধে যায়। হাশেম বলে, "তার মানে তুই বলতে চাস, টেলেগিন খুব হালকা মেজাজের লোক?"

"না, ঠিক হালকা না, তবে তার মেজাজটা যেন বেশ খেলোয়াড়ী ধরনের। কোনও সংঘর্ষই তার মনে নেই। দেশে বিপ্লব হচ্ছে, অতএব দেশের জন্যে সে বিপ্লবে যোগ দিচ্ছে। কিন্তু তার নিজের সমাজের যে টান, মানে সে যে ভাবে এতদিন তার জীবন কাটিয়েছে তা তার কাছে কোনও টানই বলে মনে হল না। সোজা চাকরি-বাকরি ছেড়ে রাস্তায় নেমে এল।"

হাশেম গম্ভীরভাবে জবাব দেয়, "এটা নেহাত তোর ব্যক্তিগত মতামত নিত্য।

* Road to Calvary.

কোনও দেশেই যখন বিপ্লব হয়, তখন সে দেশের যত ভালো লোক তাতে এসে যোগ দেয়।"

নিত্য প্রায় হাত-পা ছুঁড়ে বলতে শুরু করে, "তুই যা বলছিস, তা সবই ঠিক হাশু। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানিস, যদি খালি দুটো শ্রেণীই থাকত, একটা শোষণ করত, আর একটা তাকে খতম করত, তাহলে বোধহয় যাকে বলে শ্রেণীসংগ্রাম, তার অনেকটা সুবিধে হয়। কিন্তু মুশকিল বেধেছে যারা মাঝামাঝি, দেশের একটা মস্ত অংশ, তাদের নিয়ে।"

হাশেম বোধহয় রাগতভাবেই বললে, "তুই বলে যা, আমি পরে বলব।"

"আমরা একভাবে গড়ে উঠি, আমরা যারা চাষী-মজুর নই, মিল মালিক কিংবা জমিদার নই, আমাদের যে মূল্যবোধ, তার হয়তো কোনও ভিত নেই। তুই সেদিন ঠিকই বলছিলি, আমাদের জীবনের সবচেয়ে ট্রাজেডি, আমরা সব সময় ভাবি যে, ইচ্ছে করলেই আমরা লাখপতি হতে পারি, বড় চাকরি করতে পারি, সুন্দরী বৌ আনতে পারি। তুই এ চিন্তাকে ব্যঙ্গ করিস, আমিও করি। কিন্তু এগুলো এত পাকে পাকে আমাদের জড়িয়ে আছে যে, মজুরের পার্টিতে নাম লেখালেই তো তারা মরে যাবে না। আমি বোধহয় ঠিক বোঝাতে পারছি না তোকে…রণচিনের চরিত্র এত ভালো লাগে কেন জানিস, সে বিপ্লবের মুহূর্তেও ভাবছে যে, বড়লোকেরাই আসলে দেশে মঙ্গল আনবে ; আর যারা গরীবের জন্যে লড়ছে, তারা দেশকে ডোবাবে। তার মনের এই দ্বন্দ্বকে সে অস্বীকার করে নি, তাই তার আশাভঙ্গটা রিয়্যাল।"

হাশেম ধীরে ধীরে জবাব দেয়, "সাহিত্যের বিচার আমি করছি না ; কিন্তু নিত্য, তুই যে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের কথা বললি, সে সম্বন্ধে কিছু বলতে পারি। সে দ্বিধাটা সত্যি রিয়্যাল কিন্তু তুই যত বড় করে দেখছিস ততটা না। আজ ভালো চিন্তা মাথায় থাকলে, মানুষ ভালো কাজ না করে পারে না।"

"কাজ আর চিন্তা কি এক ?"

হাশেম উত্তেজিত হয়ে পড়ে। অধীর গলায় বলে, "কাজ না করে উপায় কি ? কী চান্স আছে মধ্যবিত্তের সামনে ? তুই যদি ভাবিস, সাহিত্যিক হবি তোকে শেষ পর্যন্ত সিনেমার গান লিখতে হবে। আর যদি কলমের জোর থাকে, তবে কোন ধড়িবাজ কাগজের মালিকের জন্যে দৈনিক কয়েকটা চোখা প্যারাগ্রাফ লিখতে পারিস বড় জোর। কী আছে তোর সামনে ?"

আলাপ আরও অনেক দূর চলত। কিন্তু এ সময় হরেন এসে ঢুকল।

নিত্যর সঙ্গে হরেনের আলাপ হাশেমের মারফত, খুব বেশি দিন না আর লোকটা আসেও খুব কম। লম্বা রোগাটে চেহারা, মুখে সব সময় হাসি লেগে আছে। তবে অতিরিক্ত কাজের চাপে হাসির রেখাগুলি ম্লান। বছর ছত্রিশ বয়স হবে, কিন্তু এরই মধ্যে মাথার সামনে মাত্র কয়েকগাছি চুল অবশিষ্ট।

ঘরে ঢুকেই সে হাশেমের পাশে ধপ করে বসে পড়ে শ্রান্তকণ্ঠে বললে, "একটা দাঙ্গা না বাধিয়ে ছাড়বে না দেখছি। যা থমথমে ভাব চারদিকে।"

"দাঙ্গা? দাঙ্গা মানে?" নিত্যর গলা দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ বেরুল। হঠাৎ এই বিরক্তিকর বিশ্রী প্রসঙ্গটা কোথা থেকে উড়ে আসায় সে অবাক হয়ে গেল, অত্যন্ত বিরূপভাবে তাকাল হরেনের দিকে।

"আমার মনে হয়, দাঙ্গা হলেও, খুব বড় ধরনের লাগবে না। সে দিন চলে গিয়েছে। সাধারণ লোক এখন বুঝতে শিখেছে"—হাশেম জোর দিয়ে একসাথে অনেকগুলো কথা বলে গেল।

হরেনের মুখ থেকে কিন্তু সন্দেহের ছায়া নড়ে না, বরঞ্চ শহরের যখন সবাই একটা কথাই বলছে, তখন এরা সেই কথাটা একেবারেই পাত্তা দিচ্ছে না কেন, ভেবে যেন সে অবাক হয় মনে মনে।

নিত্যর কিছু সন্দেহ থাকলেও হাশেম এ ব্যাপারে প্রায় নিঃসংশয়। বেশ জোর গলায় হরেনকে লক্ষ্য করে হাশেম বললে, "দাঙ্গা কি লাগতে পারে আজকাল? লাগলেও তা ছড়াতে পারবে না। সাধারণ মানুষ আজ জানে, কারা দাঙ্গা বাধায়। এই তো কয়েক দিন আগে কলকাতায় এত বড় ধর্মঘট হয়ে গেল, রশিদ আলি ফায়ারিং-এ হিন্দু-মুসলমান একসাথে রাস্তায় ব্যারিকেড করলে। কলকাতায় আর দাঙ্গা বাধতে পারে না। সে যুগ আর নেই।"

"কী জানি, আমি তো কিছু বুঝে উঠতে পারছি না"—হরেন শ্রান্তকণ্ঠে জবাব দেয়।

নিত্য ইতিমধ্যে চা আনতে বলেছিল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে হাশেম যখন উৎসাহের সঙ্গে বললে, "দাঙ্গা হবে, এটা মনে করাই ভয়ের লক্ষণ", তখন তার মুখ দেখে মনে হল সে বেশ কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে। হরেনের দিকে তাকিয়ে নিত্য বললে, "আচ্ছা দাঙ্গা থাক। অনেক দিন ভেবেছি, আপনাকে একটা প্রশ্ন করব।" বেশ কিছুটা উশখুশ করে ধাঁ করে বলে ফেলে নিত্য, "আচ্ছা, আপনি কী করে আপনাদের পার্টিতে এলেন?"

এ রকম বেয়াড়া প্রশ্নে হরেন প্রথমে হেসে উঠেছিল। তার সঙ্গে নিত্যর আলাপ বেশি দিনের নয়। প্রথমে একটা ছোট্ট উত্তর দিয়েছিল, "যেমন ভাবে সবাই আসে

তেমনি, কাজ করে।" তারপর কখন অবশ্য নিজের অজান্তেই তার কাহিনী বলতে শুরু করেছে হরেন।

ডায়মণ্ডহারবার থেকে কয়েক মাইল দূরে হরেনের বাবা এসে বাসা বেঁধেছিলেন ১৯০৪ সালে তাঁর দু-ছেলে মারা যাবার পর। হরেনের জন্মকালে পঞ্চাশ মন সন্দেশ বিলি হল দীন-দুঃখীদের মধ্যে। তারপর হরেনের বাবা গুড়ের ব্যবসা ফেঁদে তাদের সবশেষ আশা শ-তিনেক টাকা আর হরেনের মার কয়েকখানা গয়না ভাসালেন ঋণের সমুদ্রে। বাবা মারা যাবার পর পাড়ায় পাড়ায় ধান ভেনে আর মুড়ি চিড়ে বিক্রি করে মানুষ করলেন হরেনকে তার মা।

"ছোটবেলায় জ্ঞান হয়েই দেখতাম জোতদার-জমিদারদের বৌ-ঝিরা কী গাল পাড়ত মাকে। চাল ধার করতে গেলে, একজন আমাকে ডাকলে—খানকির পো। ভদ্র-লোকদের মধ্যে না হতে পারে, কিন্তু খানকি কথাটা দেশেগাঁয়ে তিন বছরের ছেলেও জানে। সেদিন ভাত আর মুখে দিতে পারি নি। ইস্কুলে প্রথম হয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। হেডমাস্টার খুব ভালবাসতেন। ক্লাস টেনে উঠলাম যখন, তখন দেশের চারদিকে আন্দোলন, ঝাঁপিয়ে পড়লাম। হেডমাস্টার জানলেন, পরীক্ষার প্রায় দিন-পনের আগে। তাই পরাণমাধব মণ্ডল যে হত আমার নীচে, সে এখন ডি-এস-সি এডিনবরা,—" আর কী ভেবে নিজের কথাটাকে হঠাৎ চট করে থামিয়ে দেয় হরেন। নিত্যকে জিজ্ঞেস করে, "কই আপনি তো কিছুই বলেন নি, আপনি নিজে তো ছাত্র ছিলেন। কিন্তু সেদিন যে বলছিলেন, ছাত্র আন্দোলন করেন নি কখনও!"

"তার কারণ,—" নিত্য একবার আড়চোখে হাশেমের দিকে তাকিয়ে বললে, "তার কারণ, আমার মাকে আপনার মায়ের মত ধান ভানতে হয় নি।"

"মানে?" হাশেম তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে।

"মানে বোধহয় ব্রিটিশ-শাসনটা আমাকে কোথায় বিঁধত, তা ঠিক বুঝতে পারতুম না। ব্রিটিশ শাসন থাকছে কি যাচ্ছে, এতে আমার এবং আমার আশেপাশের জগতে সত্যিই কি কিছু আসছে যাচ্ছে? আমার দাদা একজন মস্ত সাহেব-কোম্পানীর মাথা। আমার দুই জামাইবাবু বিলেতফেরত সরকারি ইঞ্জিনিয়ার। ব্রিটিশ শাসনটা আমাকে কোথায় বিঁধছে বলুন, যে রাস্তায় আপনার মত সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়ব?"

খুব চটে গেলে হাশেমের যা হয়, তেমনি শান্ত মিহি গলায় হাশেম বললে, "আসল কথা, তুই একটা কাওয়ার্ড। নেহাত তোর পুলিসের লাঠির ভয়ের জন্যে গুচ্ছের শক্ত শক্ত কথা বলছিস।"

আধখাওয়া চা-টা মুখের কাছ থেকে সরিয়ে দিল নিত্য। মোটা যে উপন্যাসখানা হাতে ছিল, সেটা হাঁটুর ওপরে রেখে টেবিলের ওপরে অনেকখানি ঝুঁকে পড়ে বললে, "আমাকে ভুল বুঝিস না। যাকে তুই বলিস, কফি-হাউসের বক্তা, আমি কি তাই? না, ঠিক তা নই। পুলিসের লাঠির কথা বলছিস? দুটো বড় বড় ফায়ারিং-এর মধ্যেও ছিলাম। এটুকু অন্তত বলতে পারি, অন্যায়ের সামনে ইণ্টেলেকচুয়্যাল হই নি। কিন্তু কী জানিস, ধর্মতলায় লাঠির চোট খেয়ে তিন দিন হাসপাতালে থেকে বাড়িতে যখন ফিরলাম, তার কয়েক দিন পরই সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন যেন আজগুবি ঠেকত। সেই আবার আপিস, সিনেমা আর ফুটবল! কলকাতার প্রত্যেক দিনকার জীবনের কোথাও তো পরিবর্তন কিছু নেই। একদিন রাস্তায় গিয়ে গুলি খেয়ে মরে যাওয়া এক কথা, আর তিল তিল করে জীবনকে পালটান যে আর এক ব্যাপার।"

নিত্য এতক্ষণ পর অন্ধকার ঘরখানার চারদিকে চেয়ে অস্পষ্ট আবছা আবছা বই-এর তাকগুলোর দিকে চোখ ফিরিয়ে অত্যন্ত ফিসফিস করে তার মনের কথা বললে, "আমি চাই আরো মানুষের কাছে যেতে, আরো ভালো করে বুঝতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ। তা না বুঝলে, না জানলে আমি তাকে ভালবাসতে পারি না।"

"সেটা তোকে বাধা দিয়েছে কে? এই যে তোদের পাড়া, এখানেই কাজ শুরু কর না। এখানে এত ছেলেমেয়ে, এত লোক—," হাশেম কথা শুরু করেছিল, কিন্তু নিত্য একটু অসহিষ্ণুভাবেই হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল, ম্লানভাবে হেসে বললে, "আমাদের পাড়া!"

নিত্যদের পাড়ায় অবিনাশ সেনের বাড়ি একেবারে সীমান্তে। তার আগের বাড়ি কখানা সবগুলোই প্রায় পণ্ডিতদের। ছাই-ছাই রঙের তিনতলা বাড়িটার নীচের দু-তলা এক মাদ্রাজী ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট্যাণ্টকে ভাড়া দিয়ে ওপরের তলায় থাকেন দর্শনশাস্ত্রের ডাক্তার পি. এম. বোস। খুব জ্ঞানী লোক, পাড়ার একটা মাথা বিশেষ। ভারতবর্ষের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষার খাতা দেখেন। প্রায় হাজার তিনেক পান, খাতা দেখেই সারা বছর। তার ওপর খুব রসিক লোক। লোকের সাথে আলাপ হলেই নিজের তিনতলা বিরাট বাড়িটাকে লক্ষ্য করে বলেন, "মাস্টারের বাড়ি যে এত বড় হয়, লোকে বিশ্বাসই করে না। সেজ

অফ পজেশান-টা কিছুতেই আসছে না মশাই। তবে বলে রাখি, নোট কিংবা বই না লিখেই বাড়ি তুলেছি।"

তাঁর সাথে যার খুব রেষারেষি, ঠিক উল্টো ফুটেই সেই অবিনাশবাবু। তিনিও প্রচণ্ড জ্ঞানীলোক। তাঁর অধুনা প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ওপরে লেখা বইকে তিনি নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করেছেন—

রবীন্দ্রনাথ ও নারী
রবীন্দ্রনাথ ও সমাজসংস্কার
রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সত্তা
রবীন্দ্রনাথ ও ভূমা
রবীন্দ্রনাথ ও কোলরিজ
রবীন্দ্রনাথ ও বার্ণাড-শ
রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন
রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস
রবীন্দ্রনাথ ও কমিউনিজম
শেষের কবিতা ও গীতা

বইখানা বের হবার পর পাড়ায়-বেপাড়ায় এমন কোনও পঁচিশে বৈশাখ অনুষ্ঠিত হয় নি যেখানে তিনি সভাপতিত্ব না করেছেন। গত বছর তো ঐ দিনে উনিশটা মিটিঙে সভাপতিত্ব করে পাড়ার ছেলেদের মতে একটা রেকর্ড করেছেন।

তারপরের বাড়িটা, যেটার সামনে এতদিন ফেলে রাখা সাত-আট হাত জায়গায় এই মাগগি মূল্যের বাজারে শ-খানেক টাকা ঘরে আসবে এই আশায় দুখানা খুপরির মত গ্যারেজ ঘর তোলা হচ্ছে, সে বাড়িটাই কিন্তু এ পাড়ায় সবচেয়ে আলোড়নের বস্তু। বিশেষ করে মেয়েদের মায়ের কাছে, এবাড়ির ছেলেরা এক একটি বিস্ময়।

ছেলে-ঠেঙানো ইস্কুল মাস্টারের তিনটি ছেলে একেবারে তিন-তিনটি জুয়েল। প্রথমটি সাত-আট বছর আগে সাধারণভাবেই বি-এস-সি পাশ করে কি ভাবে ফাঁকতালে একটা স্কলারশিপ নিয়ে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসার সাথে সাথে ছ-শ টাকার মাইনেতে ডালমিয় কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার। আর মেরিট থাকলে কী না হয়! এখন সমস্ত এদিক ওদিক আর মাইনে জুড়ে কেউ বলে, দেড়, কেউ বলে দু-হাজার। অথচ কী বিনয়ী ছেলেটি, কী রকম সোশ্যাল! সেবার ধাঙড়দের ধর্মঘটের সময় প্যান্ট গুটিয়ে, জালিকাটা গেঞ্জি গায়ে, নাকে রুমাল বেঁধে, বললে কেউ বিশ্বাস করবে না,

নিজেই হাতে-ঠেলা গাড়িতে করে আর সকলের সাথে জঞ্জাল ঠেলেলেন।
পরের ছেলেটি মণ্টু, যার জন্যে রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী তাঁর তৃতীয়া কন্যা সাতাশ বছরের অরুন্ধতীকে একুশ বলে চালাবার চেষ্টা করেন, আর তাঁর পাশের বাড়ির নীচের ফ্ল্যাটের মিনির মা সাবজজের বৌ, কী জানি কী মনে করে গল্প করতে করতে সেই গুপ্ত খবরটা বলে ফেলেই বলেন, "এই যে আমার মেয়ে মিনি কেউ বলুক দেখি, ওর বয়স সতেরোর চেয়ে বেশি।" এই মণ্টুও দু-বছর আগে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়েছে। পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছে, এখন মুর্শিদাবাদে পোস্টেড।
তবে সবচেয়ে বড় বিস্ময়, তৃতীয় ছেলে বিশু। আর সব ভাই যেমন গোলগাল ও স্বাস্থ্যবান, শেষের ছেলেটি সে রকম না। ঢেঙা, রোগাটে, আর মুখে চোখে কী রকম একটা অস্পষ্ট অসন্তোষ ছিল তার। লোকে কানাঘুষো করতো, সে এক লেবারলীডার হয়েছে। পাড়ার জগন্নাথ লাইব্রেরিতে সে তো একবার জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে ফেললে। সেই বিশুর পরিবর্তন নিয়ে সন্ধ্যেবেলা, কেউ না কেউ আলোচনা করবেনই। পাড়ার বুড়োরা পার্কে ফুটবল আক্রমণমুক্ত নিভৃত এলাকায় বসে নেতাজী আসবেন কি আসবেন না, এই নিয়ে আলোচনা করতে করতে হঠাৎ বলেন, "বিশু একটা জুয়েল, দেশসেবাও করছে, বড় চাকরিও করছে।" এদিক-ওদিক দেশসেবা করার পর এখন সে টাটাতে একজন জাঁদরেল গোছের লেবার অফিসার।
জ্ঞানী ও সংস্কৃতিসেবীদের বাড়ি ছেড়েই সরকারি চাকুরেদের আস্তানা। তিনখানা দোতলা একধরনের ছোট গেটওয়ালা, ফুলের টবওয়ালা পরিষ্কার ঝকঝকে বাড়ি। অন্যান্য বাড়ির মত সামনে ব্যালকনি থেকে ছেলেদের কাঁথা কিংবা কাপড় টাঙানো নেই। তিন বাড়ি মিলিয়ে অনেকগুলো কমবয়সী মেয়ে। যখন এরা ছোট থাকে, তখন নীচে থেকে তবলা ও ঘুঙুরের আওয়াজ আসে। আরও বড় হলে সেতারের পিং পিং শোনা যায়। প্রায় সকলেই ভোর না হতে স্নান করে বেশ ম্যাচ করে শাড়ি ব্লাউজ পরে কলেজ করতে যায়। কেউ আই-এ, কেউ বি-এ, কেউ এম-এ পাশ করে একে একে। এমনি ভাবে এরা রোজ সকালে আলতো ভাবে পাউডার মেখে ক্লাসে উদাসভাবে লেকচার শুনে অনেকগুলো বছর কাটিয়ে দেয় নিরুদ্বেগে। এদের মধ্যে রেডিওতেও কেউ প্লে অথবা রবীন্দ্রগীত করেন। কার্তিক কেবিনে অন্তত এরকম জনশ্রুতি। তারপর অবশ্য যথা সময়ে তিনটি বাড়ির প্রায় প্রত্যেক বছর একটি না একটিতে হোগলা ওঠে, ভিয়েন বসে, মাংস আর চিংড়ি মাছের মালাই-কারির গন্ধে ভুরভুর করে বাতাস। কার্তিক কেবিনের ছেলেরা গোনে "এবার ডলি গেল; এবার জলি, এবারে মাইরি সুদীপা।"

ছয়

অগস্ট মাসের চোদ্দ তারিখ, সন্ধ্যে নামছে কলেজ স্ট্রীটে। উস্কখুস্ক চুল আর সারা অঙ্গে তৃপ্তিমাখা অবসাদ নিয়ে ছেলেমেয়েরা সমস্ত দিন পড়ার পর থেকে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে আসছে, ট্রামে উঠছে, কেউ ভিড় জমাচ্ছে বইয়ের দোকানের সামনে।

গোলদীঘির ভেতরটা কিন্তু নিরালা। প্রায় খাঁ খাঁ করছে জলের বুক। একেবারে এককোণে সাঁতার কাটছিল তুটি ছেলে এত ধীর মন্থরগতিতে যে মনে হচ্ছিল, এক অনিশ্চয়তা তাদের হাতে পায়ে খিল লাগাতে শুরু করেছে। গোলদীঘির এক কোণে হাশেম আর নিত্য। হাশেম বললে, "দেখ নিত্য তোর বন্ধু অমিয় কাল সন্ধ্যেতে আমায় অনেক কথা বোঝাল, বললে ওয়ার্কিং ক্লাস নিয়ে আপনারা শুধু বড় বড় বাত বলতে পারেন। কিন্তু ওরা যে মাতাল হয়—বেশ্যাবাড়ি যায়—আমাদের চেয়ে অনেক বেশি, একথাটা চেপে যান কেন?"

"জানিস নিত্য", হাশেম জলের দিকে তাকিয়ে নিবিষ্টচিত্তে বলতে শুরু করলে, "অনেক সময় কথাটা ভেবেছি। বছর খানেক হল তো কাজ করছি মজুর এলাকায়। মেটেবুরুজে যখন প্রথম তিন মাস ছিলাম, প্রায় প্রত্যেক দিন রাতে কাঁদতাম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে চান করতে হত। বেশি রাত করে গ্রুপ মিটিং সেরে যখন নড়বড়ে কাঠের সিঁড়িটা দিয়ে আমার ঘরখানায় এসে উঠতাম, তখন রোজ দু-তিনটে লোক সিঁড়ির ঠিক পাশে তাড়ি খেয়ে গড়াগড়ি দিত। বড্ড খারাপ লাগত দেখে।"

"তা হলে?"

হাশেম চুপ করে থাকল নিত্যর প্রশ্নে। তারপর সহসা বললে, "তুই ভাবিস নে, আমি বানিয়ে বলছি, আর বানিয়ে বলবার কী আছে তোর কাছে? আমার সত্যিই বড্ড ভাল লাগে।"

নিত্য বেশ বিচলিতভাবে বললে, "এ ভাল লাগাটা আমার কাছে পরিষ্কার নয় রে। তুই অন্যভাবে নিস না কথাটা। কিন্তু যদি বলি এই ভাল লাগাটা তোর মনগড়া?"

"মনগড়া?" হাশেম যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করলে কথাটা, যেন সে নিজেকেই যাচাই করে নিচ্ছে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "মনগড়া কী করে বলি! কই,

চাচার বাড়িতে ভয়ানক খারাপ লাগে। জানিস তো, আমাদের মুসলিম সমাজে বি-এ, এম-এ পাশের কী কদর! সেখানে আমার বন্ধু ফিরোজ আসে। চাচার অনেক বিজনেস সার্কেলের ফ্রেণ্ড থাকে। চাচার ছেলে মিঞা আসে, মিঞা আবার ভীষণ রাজনীতি করে। গাঁ থেকে যে সব মুসলমান এম-এল-এ আসে কলকাতায়, তাদের সে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখায়, আর তার বদলে পারমিট যোগাড় করে। ঘোড়ার টিপ নিয়ে যখন সেখানে আলোচনা চলে তখন আমারই বা খারাপ লাগে কেন? সেটাও কি তা হলে মনগড়া?"

"তোর নিজের সমাজ সম্বন্ধে তোর বিতৃষ্ণা থাকলেই তো প্রমাণ হয় না, তুই মজুরদের ভালবাসিস!"

হাশেম বলে, "ভালবাসা! ওভাবে বললে বোধহয় বেশি বলা হবে। তবে একটা জোর পাই, দারুণ জোর পাই।" গলাটাকে নামিয়ে নিত্যর দিকে একবার তাকিয়ে হাশেম বলে চলে, "ধর, যে লোকটা আমার সঙ্গে একঘরে এখন থাকে। লোকটার নাম ইয়াসিন। বছর চল্লিশেক বয়স। ভাঙা নড়বড়ে চেহারা। কি গরম, কি ঠাণ্ডা সমস্ত বছর একটা চিমড়ে কালো গলাবন্ধ কোট পরে থাকে। দু-বার টি-বি হয়েছিল। কী ভাবে সারিয়েছে, ভাবতে অবাক লাগে। বারো বছর বয়স থেকে লোকটা ফিটার, তারপর তিরিশ সালে যখন সব কারখানায় ছাঁটাই শুরু হল, তখন সেও পড়ল তার মধ্যে। তিন বছর বেকার। বৌ মারা গেল, দুটো ছেলে কলেরায় মরল। রোজ রাত্তিরে তাড়ি খেয়ে ইয়াসিন গিয়ে রেললাইনে মাথা রাখত, আর ইঞ্জিনের ঝাঁঝালো আলো মুখে পড়তেই উঠে পড়ত। সেই লোকটাই কী করে বদলে গেল! সন্ন্যাসী হল না, হল মজুরদের একটা নেতা। এখন হৈ হৈ করে মিটিং করে, তাদের এলাকায়। প্রত্যেকটা লোককে চেনে, প্রত্যেকটা লোকের খবর নেয়।"

হাশেম খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। "তবে কী জানিস নিত্য, লোকটা অমিয়র কথামত অনেক কিছু জানে না। শেক্‌সপীয়র জানে না, বার্ণাড শ কী বলেছে, তা তার স্বপ্নেরও বাইরে। তবে মানুষ হিসেবে তার একটা ভীষণ জোর আছে, ভয়ানক গুমর আছে, বেশির ভাগ মানুষের মধ্যেই যেটা নেই। একটা সারেঙ্গি আছে তার, ভীষণ ঝরঝরে। সন্ধ্যের পর এমন মজা হয়! আমাদের ঘরের ঠিক নীচেই গোবরের গাদা। বৃষ্টির পর থেকে থেকে এমন বিশ্রী পচা গন্ধ আসে। যত রাজ্যের ধোঁয়া আর মশা জমা হয় সন্ধ্যের পর থেকে। ইয়াসিন তার মধ্যেই কোলের ওপর সারেঙ্গিটা তুলে নিয়ে ভীষণ ডাঁটের মাথায় বাজাতে বাজাতে অর্ধেক

রাত কাবার করে দেয়। আমায় আবার ধরেছে আংরেজিটা শিখিয়ে দেবার জন্যে। তার অনেক কালের ইচ্ছে আংরেজি শেখা।" হাশেম থেমে যায়। দুজনেই ভাবতে থাকে ইয়াসিনের কথা, একটা শক্ত মানুষের কথা।

গোলদীঘির বাতাস সেদিন চুপ করেছিল এক অনিশ্চিত দুর্যোগের অপেক্ষায়। জ্যোৎস্নার জল আলো হয়ে আছে, কিন্তু বাতাস নড়ে না। থমথম করছে চারদিক কলেজ স্ট্রীটে মাঝে মাঝে চকিত চটির শব্দ। একটু বেশি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাড়ি ফিরতে কেউ পা হড়কে পড়ছে। দু-একদিন পরই যে কালরাত্রি নামবে শহরের ওপর তার ছায়া কারো কারো মুখে।

হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে নিত্য বললে, "আচ্ছা, এত লোক বলাবলি করছে, দাঙ্গা লাগবে নাকি রে?"

"দূর পাগল," হাশেম উত্তর দিল।

সেদিন দুপুর বেলা, বাবুলের মার কাছে হাসি গিয়েছে বিয়ের সাজসরঞ্জাম দেখতে। গত সপ্তাহে তার সঙ্গে সুবোধের ঘনঘন মেশা, আর অহেতুক ভাবে সব সময় উজ্জ্বল তার চোখ দেখে সত্যগোপাল দু-তিনবার কথাটা তুলেছিলেন। কিন্তু হাসি প্রত্যেকবার কথাটা চেপে গিয়েছে।

বেলা তিনটে-চারটে নাগাদ ফিরে এসে সত্যগোপালকে খাটের ওপরে মাথায় হাত রেখে শুয়ে থাকতে দেখে, হাসি চমকে উঠল। "কী হয়েছে দাদা, এসময় তুমি? কোনও অসুখ-বিসুখ করে নি তো?" একসাথে অনেকগুলো কথা বলে প্রায় হুলস্থুল বাধিয়ে দিল হাসি।

চৌধুরী বললেন, "না রে মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল, চলে এলাম। সেই ইনফ্লুয়েঞ্জার পর থেকেই অসুস্থ ভাবটা এখনও কাটে নি।"

"দাদা জান নাকি, আজ কোথায় মারামারি হয়েছে?"—ভয়ানক বিচলিত লাগল হাসির গলা।

চৌধুরী চুপ করে থাকলেন। হাসির দিকে একবার তাকালেন। এক অনিশ্চিত ভয়ে তাকে একটু অপ্রকৃতিস্থ দেখাচ্ছিল। বললেন, "না মারামারি খুব একটা বড় কিছু এখনও হয় নি। তবে হতে পারে। গাড়িতে আসতে আসতে চারদিকে কেমন যেন থমথমে দেখলুম।"

হাসি বিচলিতস্বরে বললে, "কী একটা বিচ্ছিরী ব্যাপার বলতো দাদা! সেই ছোট

বেলায় শুনতাম কলকাতায় হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা হয়েছিল কবে। আর শুনতাম ঢাকায় দাঙ্গার কথা। আমার তো এখন থেকেই ভয় লাগছে দাদা।"

"ও সব কথা ছেড়ে দে হাসি, দাঙ্গা হলে হবে। ভেবে কী লাভ?" নিস্পৃহভাবে বললেন চৌধুরী; তার পর বিছানা থেকে উঠে পড়ে বললেন, "যাক অ্যাসপিরিনটা খেয়ে কাজ দিয়েছে।"

হাসি বললে, 'বৌদিকে বলছি দাদা, আদা দিয়ে তোমায় চা করে দিক।"

উঠে গিয়ে সত্যগোপাল টেবিলের এক কোনায় অনেকগুলো বিলিতি ম্যাগাজিনের থাক থেকে একখানা তুলে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে পাতা উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ বলে ফেলেন, "আমায় লুকোস নে হাসি। সুবোধ কি কিছু বলেছে তোকে?"

হাসি ঢাকল না। লজ্জায় লাল হয়ে যাওয়া যাকে বলে, তাও হল না। বেশ চোখ বড় বড় করে দাদার চোখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, "হ্যাঁ বলেছে, তোমার কাছে আসবে কথা পাড়তে।"

চৌধুরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। আনন্দ হলে তাঁর উজ্জ্বল চোখ দুটোর ধারাল ভাব নষ্ট হয়ে যায়। কেমন ঘোলাটে দৃষ্টি মনে হয়। সেই ভাবে হাসির দিকে তাকিয়ে চৌধুরী বললেন, "ও আই অ্যাম হ্যাপি।"

এমন সময় ঝড়ের মত ঢুকল নিত্য। ভবানীপুরে ছেলে পড়িয়ে ফেরবার পথে শুনে এসেছে, শিখদের সঙ্গে মুসলমানদের মারামারি হয়েছে। কেমন উদভ্রান্ত দেখাচ্ছিল তাকে। হাসিকে সামনে দেখে, দরজার বাইরে থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "দাদাকে একটা ফোন করে দে আপিসে। কী যে হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না। যা-তা কী সব শুনছি!" সত্যগোপাল পেছন থেকে ধীরভাবে বললেন, "যা শুনেছিস, সবই ঠিক। তবে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই।"

নিত্য প্রায় চমকিয়ে উঠল। দাদার কাছে এগিয়ে গিয়ে ছেলেমানুষের মত আবেগ-কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলে, "তার মানে, দাদা, একটা দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে?"

"না ঠিক দাঙ্গা কিনা জানি না, তবে মারামারি কিছু হয়েছে, বেশ ভালো রকম।" তারপর নিজের মনেই সত্যগোপাল নিজেকে ধিক্কার দিলেন, "হোয়াট এ ডিসগাস্টিং কানট্রি!"

নিত্য এবার বেরিয়ে যাচ্ছিল। চৌধুরী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ভাইকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমাকে একটা ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছি নিত্য, আজকে কোন মিটিং-ফিটিঙে যেও না।" তারপর নীচু গলায় বললেন, "জনগণটা কী, সেটা বুঝতে বুঝতে চুলে প্রায় পাক ধরেছে। তোমাদের সব ইতিহাসবোধ, সামাজিকবোধ, সত্তা, আরও

সব কী কী বাংলা কথা বেরিয়েছে না, তার একবর্ণও জনগণ বোঝে না!" পাশের টেবিল থেকে হাতির দাঁতের কাগজ-কাটারখানা নিত্যর দিকে তুলে ধরে নাচিয়ে বললেন, "ওরা জানে খালি এই!"

হাসি নিত্যর হাত চেপে ধরে বললে, "ছোড়দা আজকের দিনটা অন্তত হাশেমের কাছে যাস নি।"

"না না পাড়ায় আছি।"

নিত্য কার্তিক কেবিনে গিয়ে নানা ধরনের রিপোর্ট পেল। দীপেন বলে যে ছেলেটা পাড়ার সব ব্যাপারে উৎসাহী সে অনেকগুলো সাকরেদকে নিয়ে চা খাচ্ছিল। নিত্যকে দেখে বলে উঠল, "কী জবর দাঙ্গা দেখলাম নিত্যদা।"

"কোনটা?"

"ঐ যে শিখ আর মুসলমানে খুনোখুনি, জানেন না আপনি?"

কিন্তু নিত্য যতটা ভেবেছিল নতুন কোনও খবর শুনবে, সে রকম কোনও কিছু শুনতে পেল না।

গাঙ্গুলী ডাক্তারের অলকা ফার্মেসীতে গেল সে। গাঙ্গুলী পাড়ার মধ্যে সব ব্যাপারেই একটু বেশি ওয়াকিবহাল। কিন্তু সেদিন পাড়ার চ্যাংড়া থেকে আরম্ভ করে সকলেই এমন সব আজগুবী উড়ো খবর ছড়াতে শুরু করেছিল যে, গাঙ্গুলী আর দাঙ্গার ব্যাপারটা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামান নি। নিত্য জিজ্ঞেস করাতে বলেন, "ও সব বোগাস। কোথায় একটু মারামারি হয়েছে, তাই নিয়ে তিলকে তাল করা হচ্ছে। এই তো আমার শালা এল, এখনি পার্ক সার্কাস থেকে। একেবারে অল কোয়ায়েট।"

নিত্য সেখান থেকে বেরিয়ে আরও কয়েক জায়গায় গেল। এদিক ওদিক উদভ্রান্তের মত ঘোরাফেরা করল। নানা ধরনের কথাবার্তায় কোনটাকে বিশ্বাস করবে, ঠিক করতে না পেরে শেষকালে সটান বাড়ি চলে এল। হাশেমের সঙ্গে যে বইটা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, তার শেষ অংশটা পড়তে পড়তে ঘুমে চোখ ঢুলে আসে তার। কোনও রকমে নাকে মুখে দিয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়ে নিত্য।

সত্যগোপাল কিন্তু বাড়িতে থাকতে পারলেন না। ফোন করে আপিস থেকে গাড়ি নিয়ে এলেন। তারপর তাঁর পাঞ্জাবী হারিয়েছে কেন, এই নিয়ে গুজারামের সঙ্গে খুব খানিকটা ঝগড়া করে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বললেন, "জ্যোৎস্না, হাসি তোমরা সব খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ো। আমার আসতে রাত্তির হবে।"

খবরের কাগজের কাজ, কাজেই রাত্তিরে ফেরা না ফেরার অনিশ্চয়তা নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না। সত্যগোপাল সেদিন রাত্তিরে বাড়ি ফিরতে পারেন নি।

গুজারামের সঙ্গে চৌধুরীর সেদিনকার ঝগড়াটার উপলক্ষ্য ছিল সামান্য। আসলে হাসি আর সুবোধের এতদিনকার ব্যাপারের একটা হিল্লে হয়ে যাওয়ায় বেশ ফুর্তি লাগছিল তাঁর। তার সঙ্গে এই নতুন দাঙ্গাহাঙ্গামাটাকে তিনি মোটেই এক করতে পারছিলেন না। অন্যমনস্কভাবে টাইপ করতে করতে হঠাৎ চিৎকার করে ডাকলেন, "গুজারাম! গুজারাম!"

গুজারাম বেরিয়ে এল। চিমড়ে শুকনো চেহারা, কালো রং, শরীরের তুলনায় মুখখানা ছোট, আর তাতে অসংখ্য ভাঁজ, ঝড়ো কাকের মত উস্কখুস্ক কাঁচা-পাকা চুল—গুজারামের বয়স পঞ্চান্ন হতে পারে, পঁয়ষট্টি হতে পারে। এতক্ষণ সে ঝিমচ্ছিল ঘরের পাশেই খালি বারান্দাটাতে বসে। কুড়ি টাকা মাইনের অর্ধেকই তার আফিমে টেনে নিচ্ছে, জীবনের শেষ পনের বছর। দ্বিতীয় ডাকটা শুনেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। তারপর কাছেই সাজানো জুতোর র‍্যাক থেকে একপাটি ব্রাউন রঙের জুতো টেনে নিয়ে ঘরে ঢোকে, আর এক হাতে একটা বুরুশ।

সত্যগোপাল দেখেও দেখেন না। ওসব চালাকি যে তাঁর অজানা তা নয়। বরং ফাঁকিগুলো এখন আর চোখে লাগে না। বলেন, "ধোপা এসেছিল?"

গুজারাম আড়চোখে সত্যগোপালের চোখের নিস্পৃহ ভাব একবার মেপে নেয়। আসলে গতবার বাড়ির সাবান-কাচায় যে পাঞ্জাবীটা হারিয়েছে, সেই কথা টেনে আনবার জন্যেই যে ধোপার ভূমিকা, গুজারাম আন্দাজ করতে পারে। মাথা নামিয়ে বলে, "আলমারিমে সব তুলে রেখেছি।"

"পাঞ্জাবীটা দিয়ে গেছে?"

গুজারাম অস্বস্তি বোধ করলে। এরকম জেনেও না-জানা ভাবটা এত অদ্ভুত আয়ত্ত করেছেন চৌধুরী, এত সহজভাবে, সেদিন সকালে পাঞ্জাবী নিয়ে হুলস্থূল কাণ্ডটা বেমালুম ভুলে যাবার ভান করবেন, একথা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। একটু সাহস করে বললে, "ছাদমে হাওয়া দিচ্ছিল বহুত। পাঞ্জাবী মেলিয়ে দিলাম, মালুম হোতা, রাস্তামে গির পড়া।"

"রাস্তায় পড়ে গেছে? কলকাতায় এতগুলো বাড়ির ছাদ থেকে হাওয়ায় পড়ে যাচ্ছে পাঞ্জাবী? পাশের বাড়ির লোকেরা কি পাঞ্জাবী গায়ে দেয় না? বাড়িতে কাচা

তুলে দাও তাহলে! কী হবে ইলেকট্রিক ইস্ত্রিটা রেখে, বিক্রি করে দি ওটা!" —একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে বাড়ি মাথায় করলেন সত্যগোপাল।

গুজ্জারাম ঘাড় কাত করে তাকায় সত্যগোপালের দিকে। এত বেশি বলছে কেন আজ? কী ব্যাপার? চোখ মিটমিট করে ভাবতে চেষ্টা করলে গুজ্জারাম। মনে মনে ভাবে এবারে বাংলা-মুল্লুকের নুন ছাড়বে। অনেক হয়েছে। সারা জীবন কাটান গেছে। এবার বাড়ি যাবে। কুয়োর ধারে যে বিঘে দুয়েক জমি আছে, তাতে অড়হর বুনবে, একলা লোকের খুব চলে যাবে। এই শালা পাঞ্জাবী, সার্টের কলার, জুতোর পালিশ আছে কিনা, গরম পেণ্টুলুনে পোকা লাগল কি না, রোজ সাবানে গেঞ্জি কাচো আর ইস্ত্রি করো, সকালবেলা ট্যুর থাকলে, ভোর পাঁচটায় উঠে স্টোভ জ্বালাও—ঘেতরামি ধরে গেছে একদম। সত্যি মনটা ভারি দমে যায় গুজ্জারামের। বাড়ি গেলে কখনও মন বসে না, তবু এখন যেন নিজের মুলুক, বেনারস যাবার রাস্তায় স্টেশন থেকে গাড়ি বদলে ছোট লাইনে নিজেদের গাঁয়ে পৌছান, সমস্তটা জড়িয়ে মিশিয়ে ভয়ানক আকর্ষণীয় মনে হয় গুজ্জারামের।

সত্যগোপাল লক্ষ্য করেছিলেন, তার মুখের ভাবটা। অপ্রিয় কথা পালটিয়ে নেবার যে আর্ট, সওদাগরী আপিসের বড় সাহেব থেকে কেরানী পর্যন্ত বিস্তৃত, সেই কায়দায় কথাটা পালটিয়ে নেন চৌধুরী। মুখের কোনও ভাব পরিবর্তন না করে বলেন, "নিমাইবাবুর বাড়ি থেকে কাল সকালে ফাইলটা নিয়ে আসিস।" তারপর গুজ্জারাম যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, "কাঁকিনাড়া নৈহাটির আগে না পরের স্টপে রে?"

গুজ্জারাম বুঝতে পারে এটা একটা টোপ। বারো বছর সত্যগোপালের সঙ্গে বাংলা দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত, কোথাও চার দিন, কোন স্টেশনে বা তিন ঘণ্টা, এমনি ভাবে কাটিয়ে গুজ্জারামের ভূগোলজ্ঞান যে অনেক লেখাপড়া-জানাওলা লোকের চেয়ে তীক্ষ্ণতা অর্জন করেছিল, এটা সত্যগোপালও জানতেন। তাই তাকে খুশি করার জন্যে যে এ প্রশ্ন গুজ্জারামের তা বুঝতে বাকি থাকে না। তবু উৎসাহের সঙ্গে বলে, "আগাড়ি স্টপমে তো কাঁকনাড়া। সেবার রানাঘাটমে ছিলাম যব, তব তো কাঁকনাড়া ভি গেলাম।"

কথাটা শেষ করে গুজ্জারাম বেরিয়ে এল দরজা ছেড়ে। চৌধুরী আপিসে গেলে তার নিজের আস্তানা রান্নাঘর ও সংলগ্ন বারান্দায় একটা আম কাঠের বেঞ্চির ওপর ঝুপ করে বসে পড়ে।

বসে পড়েই অন্ধকারে অনুভব করে গুজ্জারাম রাস্তার ধারে জানালা দিয়ে একটা গোল-

মালের আওয়াজ ভেসে আসছে, আর তার আফিমের নেশার জোরটা আরও তীব্র ও গাঢ় হয়ে ওঠে। একটা গভীর ঝিমুনির বর্ষা ঝিরঝির করতে থাকে তার মাথার ভেতর।

অনেকদিন আগেকার একটা কোলাহল ভেসে আসে গুজারামের কানে। গুজারামের বয়স তখন এগারো কি বারো। বাড়ি থেকে মাইল-সাতেক দূরে একটা পাহাড় ছিল। স্থানীয় লোকেরা বলত টুংরী। খুব ভোর থাকতেই গ্রামের ছেলেমেয়েরা টুংরীতে উঠত দল বেঁধে, লকড়ি কুড়োতে। তারপর লকড়ি কুড়িয়ে ওরা সবাই দল বেঁধে রেস দিচ্ছে। রেস দিতে দিতে পাথরের কুচিতে পা হড়কে গিয়ে গড়িয়ে পড়েছে, বারো বছরের ছেলে গুজারাম। আর কেউ থামে নি। আর সবাই লকড়ি মাথায় নিয়ে হরিণের মত তরতর সরসর শব্দ করতে করতে, যাদের বোঝা কম তারা মুখে আনন্দের এক রকম দীর্ঘ আওয়াজ বের করে লাফাতে লাফাতে নেমে যাচ্ছে। খালি শ্যামসুন্দর ফিরেছিল। চমৎকার কোঁকড়ান চুল, তেলের অভাবে মাথার পাশে জটা বেঁধে আছে। শ্যামসুন্দর নিজের খড়িগুলো নামিয়ে গুজারামের মাথার কাছে এসে আস্তে আস্তে ডাকছে, "রামা, রামা।" শ্যামসুন্দরের অবস্থা গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ। শ্যাম চলে যায়, কুলি হয়ে ছোট লাইন বানাতে। মাঝে মাঝে ফিরে আসত, চওড়া কাঁধে, সাহেবের হান্টারের দাগ দেখিয়ে বাহবা নিত। তারপর কোথায় হারিয়ে গেল, গুজারাম আর তার পাত্তা রাখে নি। শুধু সেই টুংরী ভেঙে, লকড়ি মাথায় নিয়ে হুড়মুড করে জলস্রোতের মত নামবার আওয়াজ তার কানে এসে লাগল এত বছর পরে।

আরও একটা আওয়াজ কানে এল। সেটা সত্যি জলের আওয়াজ। ক্ষেতের ভেতর দিয়ে যে নালাগুলো গিয়েছে, বর্ষার তোড়ে চওড়া হয়ে সেগুলো খালের মত হয়ে যায় তাদের অঞ্চলে। রাঙা জলের ঘূর্ণি শব্দ করতে করতে ছুটতে থাকে খালের ভেতর দিয়ে। এমন এক খালের সামনে দাঁড়িয়ে গুজারাম তার পাশের সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে পার হবার কথা ভাবছিল। সঙ্গিনীর নাম—কুর্মী, ভালো নাম সুমিত্রা। বুনোদের মধ্যে এরকম ভদ্র নাম কী করে হয়, ভেবে অবাক হয়েছিল গুজারাম। তাদের বাড়ির মাইল ছয়েক দক্ষিণে একটা সাঁওতালদের গ্রাম, ছোট লাইনটা করবার সময় তারা সেখানে হাজির হয়। কিন্তু তারপর ফিরে যায় নি। সেখানকার মেয়ে কুর্মী। ছোট স্টেশনের গায়ে গায়ে মারোয়াড়ীদের সাদা চুনকাম-করা একতলা নীচু নীচু গুদামঘরওয়ালা একটা বিস্তীর্ণ পট্টি মাথা তুলতে আরম্ভ করেছিল। তাদেরই একটা ময়দার গুদামে রেজার কাজ করত কুর্মী। দিনে ছ-পয়সা রেট, আরও দু-

ঘণ্টা বেশি খাটলে দু-আনা। দুটো আনি কাপড়ে গুঁজে, মুখে চুলে, উন্মুক্ত গলার দু-পাশে, চোখের পাতায় ময়দার গুঁড়ো মেখে কুর্মী যখন ছোট স্টেশনের পাকা সড়ক ছেড়ে তাদের গ্রামের কাঁচা রাস্তা ধরল, তখনই যত বিপদ। গুজারামের বাবা রাজারামের বাড়ির ঠিক সামনে এলে, বৃষ্টি একেবারে ভেঙে পড়ল। রাজারামের স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করতে করতে বৃষ্টি যখন থামল, তখন ঘুটঘুটে রাত। রাজারাম তার জোয়ান ছেলেকে ডেকে বলল, কুর্মীকে বাড়ি নিয়ে যেতে। তাদের গাঁয়ে লণ্ঠনের চল তখনও হয় নি। একটা মশাল ধরিয়ে ঝিপঝিপে বৃষ্টির ভেতর দিয়ে গুজারাম কুর্মীকে নিয়ে চলল। মাঝপথে এই বিপর্যয়। আল ভেঙে তারা আসছিল। সামনের নালাটা এই দু-ঘণ্টা একনাগাড় বৃষ্টির ধারায় একটা পনের-ষোল হাত চওড়া অতিকায় সাপের মত ফুঁসছিল। আর জলের ঘূর্ণি মশালের লালচে আলোয় আরও ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। গুজারাম প্রথমে লাঠি ডুবিয়ে এগোয়, তার পাঁচ হাতের ওপর লম্বা লাঠি খানিকদূর গিয়ে মনে হয়, তল পাবে না। এক বুক জলে দাঁড়িয়ে পেছনের দিকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটার দিকে হাত বাড়ায় গুজারাম। মেয়েটা ফোঁস করে ওঠে—"নেই যায়েগা!" দু-মিনিট বোকার মত বুকজলে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে গুজারাম। তারপর পেছন ফিরে এক ঝটকা মেরে কাঁধে তুলে নেয় বুনোদের মেয়েটাকে। সে চিৎকার করবার আগেই, গুজারাম সাঁতার দিতে আরম্ভ করেছে, আর ওপারে উঠেই কুর্মীকে নামিয়ে এক মিনিটও জিরিয়ে নেয় নি গুজারাম। খাল পার হয়েই কুর্মীদের গ্রাম। একটা শুকনো ফরসা কাপড় দেয় গুজারামকে কুর্মীদের বাড়ির লোকেরা। তারপর পাশের বাগান থেকে আম পেড়ে আনে কুর্মীর ভায়েরা—বেনারসকা ল্যাংড়া আম।

গুজারাম রান্নাঘরের পাশে দেওয়ালে ঠেস-দেওয়া বেঞ্চিটায় ঢুলতে ঢুলতে, সেই তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেকার বর্ষার এক রাতের খালের জলের গোঙানি শুনতে পায়। তারপর জলের শব্দটা যেন কেমন মানুষের কোলাহলের মত ঠেকে। ক্রমশ মানুষের গলার আওয়াজগুলো তীক্ষ্ণ ফলার মত গুজারামের ঘুমের দেওয়ালে আঘাত করতে থাকে।—"বন্দেমাতরম", "বন্দেমাতরম", "জয়হিন্দ", "আপনারা সব তৈরি হন", "জয়হিন্দ"।

কিন্তু কোনও আওয়াজই জাগাতে পারে না গুজারামকে। দেওয়ালের গায়ে শরীরটাকে এলিয়ে দিতে দিতে কখন বেঞ্চিটার ওপরই গড়িয়ে পড়েছে গুজারাম। তেতলার খোলা জানালাটা দিয়ে কালিঘাটের খালের হাওয়া আসছে। আরও ঘন হয়ে পাশ ফিরে শোয় গুজারাম।

সাত

ষোলই অগস্ট, উনিশশো ছেচল্লিশের রাতটা সহজেই ভুলবে না কলকাতাবাসী। সমস্ত শহর জুড়ে এক ক্ষেপামির ঘূর্ণি তোলপাড় করেছিল শহরবাসীর মন, উলটে পালটে উপড়ে ফেলে দিয়েছিল মানুষের স্বাভাবিক মনের বিকাশকে, আশা-আকাঙ্ক্ষার, ভালবাসার ইচ্ছেকে। থেঁতলে পিষে একাকার হয়ে গিয়েছিল সমস্ত চেতনা। মানুষকে সেদিন দেখা হয়েছিল, মানুষ হিসেবে নয়, গায়ে ধুতি ঝুলছে না পা-জামা রয়েছে, দাড়ি আছে কি নেই, এই সব বাইরের মাপকাঠিতে। কলকাতাবাসীর অন্তত মনে থাকবে, সেই বিভীষিকার লগ্ন। সেই একান্ত মরণলগ্নে দেশের লোক খুঁজেছিল দেশের নেতাদের। নেতারা সাড়া দিয়েছিলেন, হিন্দু নেতা মুসলমানের বিরুদ্ধে, মুসলমান নেতা হিন্দুর বিরুদ্ধে অগ্নিময়ী বক্তৃতা দিয়ে সাড়া দিয়েছিলেন। তাই মরা স্বামীর মাথা কোলে রেখে বৌ ভেবেছিল, এ কোন দেশে এলাম? আর মরা ছেলেকে বুকে আঁকড়ে, মা ভাবলে, এ কাদের দেশ?

এই বিভীষিকার ঢেউ কলকাতার অলিতে গলিতে আছড়ে পড়েছিল। বড়লোকেরা দরজা বন্ধ করে দারোয়ানদের বন্দুক দিয়ে, বাড়ির ছাদে রিভলবার নিয়ে বসেছিলেন। মধ্যবিত্ত ছেলেরা পাড়ায় পাড়ায় সারা রাত্তির থান ইট হাতে করে বসে কাটিয়েছে, আর হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এক বিশেষ জীব রাস্তায় অলিতে গলিতে বেরিয়েছে, মানুষ মারবার অভিসারে—কেউ গিলে করা পাঞ্জাবীর তলায়, কেউ লুঙ্গির কোঁচড়ে ধারাল ছুরি লুকিয়ে।

নিত্যদের বাড়িতে প্রথমে জেগে ওঠে হাসি। ঘুমের মধ্যে বিকট 'হরিবোল' শব্দে যেমন আচমকা ঘুম ভেঙে যায়, তেমনি হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল, এক বেয়াড়া গলায় 'বন্দেমাতরম' আওয়াজে। প্রথমে সে ভাবলে বৌদিকে ডাকবে কিনা, তারপর খাট থেকে উঠে, আস্তে আস্তে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়।

অনেক লোক—হৈ-চৈ হচ্ছে। ঘুমের জড়তায় প্রথমে ভয়ানক ভয় লেগেছিল হাসির। বুকটা ধ্বক করে উঠেছিল, তারপর চোখ রগড়ে, ধীরে ধীরে সে চিনতে পারে পাড়ার ছেলেদের। দু-তিনখানা বাড়ির পরই উলটো ফুটে বিশ্বাসদের ব্যালকনিতে বৌরা ঝুঁকে পড়ে নীচের দিকে দেখছে। হাসিও সেদিকে তাকিয়েছিল, এমন সময় তার ঘাড়ে নিশ্বাস পড়ায় চমকে উঠল হাসি।

"কী হবে হাসি, কী হবে?"—আতঙ্কে বৌদির গলায় মনে হল স্বরভঙ্গ হয়েছে।

হাসিকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন বৌদি।

"কী হয়েছে, বৌদি, অমন করছ কেন?"—হাসি তার সাধ্যমত সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। বৌদি যেন দু-চোখে অন্ধকার দেখছেন। বিছানার ওপর শুয়ে পড়ে বলে ওঠেন, "আমার বুকটা কেমন করছে হাসি। মুসলমানরা যদি আসে? চল কালই আমরা দেওঘর চলে যাই।"

হাসি অসহিষ্ণুভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "সকলের যা হবে, আমাদেরও তাই হবে।" তারপর হঠাৎ সশব্দে হেসে ফেলল হাসি।

বৌদি খাট থেকে জিজ্ঞেস করেন, "কী হয়েছে, কী হয়েছে?"

"একবার দেখে যাও বৌদি, সুবোধ কেমন সাজ করেছে! মাথায় কেমন গুর্খা টুপি পরেছে দেখ।"

হাসি আঙুল দিয়ে ভিড়ের এক দিকটা দেখায়। সুবোধ, অমিয়, নিত্যর অন্যান্য বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু নিত্য নেই। "নিশ্চয়ই ওপরে আছে ছোড়দাটা। ঘুমোচ্ছে নিশ্চয়ই," বলে হাসি সিঁড়ি দিয়ে চারতলায় যাবার জন্যে পা বাড়াতে বৌদি বলেন, "আমিও যাব তোর সঙ্গে।"

হাসি ও জ্যোৎস্না ওপরে গিয়ে দেখল, একটা খোলা বই মুখের ওপর ফেলে নিত্য অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

"ইস কী ঘুমোচ্ছে ছোড়দাটা, ওঠ!" হাসি খুব জোরে ঝাঁকুনি দিল নিত্যকে। আচমকা এরকম ধাক্কায় হকচকিয়ে উঠে পড়ে নিত্য। কিন্তু হাসি কিছু বলবার আগেই রাস্তা থেকে তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠ বেজে উঠল, "আপনারা সব রেডি হন, এসে গেছে! রেডি হন" তারপর কিছুক্ষণ থেমে আবার পরিষ্কার গলা বেজে উঠল, "ওয়ান, টু,...থ্রি ..."

নিত্য লাফিয়ে উঠল, মনে হল ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। পাশের তাকটা থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে ঢকঢক করে খেয়ে ফেলল। ঘরের ভেতর প্রচণ্ড গোলমাল আসছে, অনেক লোকের অনেক রকম চেঁচামেচি। গেঞ্জি গায়ে দিয়ে নিত্য রাস্তায় নেমে আসে।

রাস্তার এককোণে মস্ত ভিড়, খুব উত্তেজিত ভাবে কে একজন কথা বলছে। নিত্য সেদিকে এগিয়ে যাবার আগেই তার ঘাড়ের পেছনে কার হাত পড়ল। পেছনে তাকিয়ে দেখে অলকা ফার্মেসীর রিটায়ার্ড সিভিল সার্জন ডাক্তার মেজর গাঙ্গুলী। গাঙ্গুলী বললেন, "তুমি ইউ-টি-সিতে ছিলে না?"

নিত্য এরকম প্রশ্নের জন্যে তৈরী ছিল না। গাঙ্গুলী আর কোনও কথা না বলে

তাকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চললেন।

নিত্যর মনে হল, সমস্ত পাড়াটা যেন রাতারাতি বদলে গেছে। প্রত্যেক জায়গায় এই মাঝ রাত্তিরেও লোকেরা জটলা করছে। পাতলা বগলকাটা গেঞ্জি গায়ে চোখে চশমা-দেওয়া রোগা রোগা স্কুল-কলেজের ছেলেদের হাতে ভারী ভারী লাঠি ভয়ানক বিসদৃশ লাগছিল। তাদের মধ্যেই একটা ছেলে নিত্য আর ডাক্তার গাঙ্গুলীকে দেখে ধাঁ করে বেরিয়ে আসে। কাছে এলে নিত্য অবাক হয়ে যায়। সুবোধ— অদ্ভুত ড্রেস করেছে। এত তাড়াতাড়িতেও কোথা থেকে একটা গোল ছাতার মতো নেপালীদের সাময়িক একটা টুপি যোগাড় করেছে। ল্যাম্পপোস্টের আলোর কাছে আরও এগিয়ে এলে, নিত্য দেখল, সুবোধের দিদির বিয়েতে যে ছুরিটা প্রেজেণ্ট পেয়েছিল, সেইটা একটা খবরের কাগজের খাপে মুড়ে বেল্টের ভেতর ভরে নিয়েছে সুবোধ। সুবোধ একটু খুশি-খুশি গলায় বলে, "কী নিত্য, বলেছিলাম না, তোমাদের ও-সব সাম্যবাদ টাম্যবাদ আমাদের দেশে চলবে না।" তারপর মেজর গাঙ্গুলীর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে বলল, "আমি বাবা একটা পার্টিতেই বিশ্বাস করি, লেড়েমারা পার্টি।"

নিত্য দেখল, এই এঁদো গলিটাও আজ এত রাতে কোলাহলমুখর হয়ে উঠেছে। কার্তিক কেবিনের সামনে এক বিরাট ভিড় জমেছে। সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে কাজ করে অনাদি। সে-ই চিৎকার করে বলছে, "টেক ইট ফ্রম মি, তিন হাজার মুসলমান আসছিল হাওড়া ব্রিজ দিয়ে, সমস্ত নর্থ ক্যালকাটা ক্যাপচার করবে; আর ব্রিজের এদিকে মাত্র তেইশটা শিখ। একেবারে ম্যাসাকার করে দিয়েছে কৃপাণ দিয়ে।"

ঠিক এমন সময় একজন সাইকেলে চড়ে চেঁচিয়ে বলে গেল, "আপনারা সকলে ইট ভাঙতে শুরু করুন। বগেল ছাড়িয়ে গেছে ওরা।" বলেই বোঁ করে বেরিয়ে যায় বড রাস্তার দিকে।

নিত্য দেখল, ভয় কাকে বলে। উল্টো ফুটে ময়রার দোকানটার পাশে একটা একতলা বাড়ি উঠছে। তার একপাশে খোলা জায়গায় সুরকীর ত্রিকোণ স্তূপ, আড়ালে থাক থাক করে সাজান ইটের পাঁজা। সমস্ত ভিড়টা এবার যেন ইটের পাঁজার ওপর আছড়ে পড়ে। ধমাস, ধমাস, ধমাস ফুটপাথের ওপর ইট পড়তে থাকে। যারা প্রথমে এগিয়ে গিয়েছিল, তারা পেছনের দিকের লোকদের থান থান ইট পাস করতে থাকে। মেডিক্যাল কলেজে পড়ে একটি ছেলে, দুটো ইট বাড়িয়ে দিল নিত্যর হাতে। নিত্য বিমূঢ়ভাবে আর সকলের সঙ্গে ইট ভাঙতে শুরু করে।

সবাই দারুণ উৎসাহে ইট ভাঙছে। সামনের লাইনে ইস্কুলের দুজন ছেলে অতি উৎসাহে ইট ভেঙে একেবারে টুকরো টুকরো করে ফেলছিল। নিত্যর পাশ থেকে গাঙ্গুলী চিৎকার করে ওঠেন, "একেবারে যে মার্বেল বানিয়ে দিলে হে!" ছেলে দুটি লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। ঠিক এমনি সময় আবার সাইকেলে চড়ে যে ছেলেটি এসেছিল, তার আবির্ভাব হয়। "বিশ্বাসরা কিছুতেই দরজা খুলছে না স্যার।" ছেলেটি অনুযোগ করে।

"কিছুতেই দরজা খুলছে না, ইয়ারকি পেয়েছে না কি?" গাঙ্গুলীর গলার স্বর চড়ে গেল। ভিড় ঠেলে সামনে এসে যখন তিনি ঝুঁকে দাঁড়ালেন, তখন তাঁকে বেশ মেজর মেজর দেখাচ্ছিল। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোতে আরম্ভ করেন গাঙ্গুলী। আর তার পেছনে নিত্যকে ঠেলতে ঠেলতে চলে পঞ্চাশ-ষাট জন ছেলে।

দীপেন একটা ধূমকেতুর মত ভিড় থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে বিশ্বাসদের বন্ধ দরজায় দুম দুম করে লাথি মারতে থাকে। তার দেখাদেখি পাশ থেকে আরও দুজন ছেলে থান ইট দিয়ে দরজা পিটতে আরম্ভ করে। এতক্ষণে একটা কাজ পাওয়া গেছে, এই ভেবে সমস্ত ভিড়টা যেন একটা প্রচণ্ড চিৎকার করে ওঠে—"ভাঙ, ভাঙ।" কিন্তু এত চিৎকার আর শব্দেও বাড়িটার মৌন তিলমাত্র বিচলিত হয় না। কোথায় জল গড়িয়ে পড়ছে, তার একটা ছলছল শব্দ নীচের তলা থেকে আসে। আর এত রাত্রে এত লোকের ভিড় দেখে দুটো মোটা ধেড়ে ইঁদুর জলের পাইপের ভেতর থেকে নেমে ধীরে ধীরে নীচের শান-বাঁধানো জায়গাটা পার হয়ে ঘাসের মধ্যে মিশে যায়। দীপেন বারুদের মত ফেটে পড়ে, "দরজা খুলবেন কি?" এবারে ঠিক মাথার ওপর খুট করে একটা আওয়াজ আসে। ওপরের ব্যালকনিতে অস্পষ্ট নারীমূর্তি দেখা যায়। তারপর মূর্তিটা রেলিঙের গায়ে ঝুঁকে পড়তেই, চেনা চেনা ঠেকে সকলের। বিশ্বাসদের ছোট ছেলের বৌ উমা। উমা বেশ দৃঢ়ভাবেই বলে, "আপনারা নীচে ওরকম হল্লা করছেন কেন?"

প্রথমে সবাই ভড়কে যায়, তারপরে গাঙ্গুলী বলেন, "চারিদিকে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা লেগেছে মা, দরজাটা একটু খুলে দাও।"

ওপরে মেয়েলী গলা থেকে একটি অস্ফুট আওয়াজ বেরোয়—"দাঙ্গা?" অন্ধকারে নারী-মূর্তিটি সরে গেল।

সংঘর্ষের প্রথম ধাক্কায় মানুষ একটু বেশি হকচকিয়ে গিয়েছিল। এই ভাবটা কমে যাবার পরে চেঁচান, ইতস্তত ছোটাছুটি; অকারণে লাঠি দিয়ে ল্যাম্পপোস্ট পেটান, আধখোলা জানালার দিকে চেয়ে দাঁত খেঁচান, "বন্ধ করে দিতে পারেন না

জানালাটা ?" মুসলমানরা এলে তখন—" এ সমস্ত থেমে গিয়ে একটা সংহতির ভাব দেখা যায়, যুদ্ধক্ষেত্রের শৃঙ্খলা ও সংকল্প তিন-চার ঘণ্টা চেষ্টার পরই আয়ত্তে আসে। বিশ্বাসদের বাড়ি থেকে চারটে বন্দুক না পাওয়া গেলেও একটা একনলা আর একটা দোনলা সটগান পাওয়া যায়। নিত্যর হাতে দোনলাটা দিয়ে সান্ত্বনার স্বরে গাঙ্গুলী বলেন, "আমাদের পাড়ায় গানের অভাব? বারো-বারোটা গান আছে, একখানা বাড়ির মধ্যে। এখন আজকের রাতের মত ডাক্তার পি. এম. বোসের বাড়ি সকলে চলেছে, তোমরাও এস। আক্রমণ যদি হয়, তাহলে ওখানেই প্রথম হবে।"

অত্যন্ত বিমূঢ়ভাবে নিত্য ছাদে উঠে এল। ছাদে যেন মেলা বসেছে। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয়, বিস্তৃত ছাদের চারদিকে অসংখ্য মানুষের মূর্তি, যেন গোটা পাড়াটাই উঠে এসেছে। এখান থেকেই বেশ নজরে পড়ে, বাড়ির ডানদিকে একটা উন্মুক্ত বস্তি। ইঁট আর চট দিয়ে ভাঙা ছাদগুলো জোড়া দেবার চেষ্টা হয়েছে। নেহাত একটা আলগা করোগেটের টিন দরজার মত ব্যবহার করা হয়েছে। এ রকম বিপজ্জনক খোলা জায়গা থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে প্রায় তিন-চারটে পরিবার ছাদের একপ্রান্তে পুঁটুলির মত পড়েছিল। সিঁড়ি থেকে উঠেই নিত্যর চোখে প্রথমে পড়ল একটা পিতলের ঘড়া, পাতলা মেঘের আস্তরণে ঢাকা বর্ষার মোলায়েম চাঁদনীর চিকণ আভায় ঠিক সোনার মত জ্বলছে। নিত্য পাশ কাটিয়ে এগোবার চেষ্টা করতে একটা চেনা পরিহাসমুখর মেয়েলী কণ্ঠের আওয়াজ পায়। ঘাড় ফেরাতেই দেখে, হরেনের বোন সুধা। সুধা নিত্যকে দেখিয়ে দেখিয়ে বলছে, "নিত্যদাও পল্টন বনে গেছে, দেখেছ মা!" আলসের গায়ে বন্দুকটা শুইয়ে রেখে তালগোল-পাকানো নারী-পুরুষ কাচ্চাবাচ্চা দলটার কাছে গিয়ে নিত্য ডাক দেয় "মাসীমা"। হরেনের মা রাত্তিরে কম দেখেন। গত দু-বছর থেকে চোখের ছানি কাটাবেন কাটাবেন করে আসছেন, কিন্তু সামর্থ্যের অভাবে তা হয়ে ওঠে নি। নিত্যর গলা পেয়ে ব্যাকুলভাবে বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন, "কী হবে বলতো বাবা, হরেন তো ফেরে নি। সে-তো পার্ক সার্কেস না কোথায় আটকে পড়ে আছে।" নিত্য মাদুরের সামান্য খালি অংশটায় বসে পড়ে। হরেন বাইরে আছে,—পার্ক সার্কাসে? কথাটা মনে হতেই যেন একটা ঠাণ্ডা জলস্রোত গায়ে লাগে। কীরকম শির শির করে শরীরটা। সেই অস্পষ্ট আলোতেও নিত্য আন্দাজ করতে পারে উৎকণ্ঠায় ও ঔৎসুক্যে হরেনের মা একটা তোরঙ্গের ওপরে উঠে বসেছেন, আর তাঁর চোখদুটো তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে। নিত্য একটু সময় নিল। তারপর বললে, "রসুলের

সাথে গিয়েছে ?" বৃদ্ধা মাথাটা একটু বাঁ দিকে হেলালেন। "কখন বেরিয়েছে ?" বলেই নিত্য বুঝল, ভুল হয়ে গিয়েছে। হরেনের মার চোখ দুটো আতঙ্কে আরও বড় হয়ে উঠল। বললেন, "সেই তো খুব সকালে। মেরে টেরে ফেলে নি তো নিত্য ?" আবার আর একটা গোলমালের শব্দ ভেসে এল। একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন জমতে জমতে অকস্মাৎ ভেঙে পড়ল মাথার ওপরে। আলসের ধারে, ইঁটের সারি সাজিয়ে যে সব ছেলে বসেছিল ঘাপটি মেরে, তারা টান টান হয়ে উঠে দাঁড়ায়। ল্যাম্পপোস্ট-গুলো টং টং করে বাজতে থাকে, আর পাড়া কাঁপিয়ে একসঙ্গে প্রায় চার পাঁচটা শাঁখ স্টিমারের জোরালো আওয়াজের মত ভোঁ ভোঁ করে বাজতে আরম্ভ করে। ঠিক মিনিট তিনেক চলল এরকম। তারপর সব চুপ। সমস্ত ছাদটা এমন নিথর মনে হল যে, কথা বলতে গিয়ে সবাই কথা থামিয়ে দেয়। খালি আলসের গা ঘেঁষে ময়রাদের যে বৌটা তিনমাসের ছেলেটাকে কোলে রেখে গুটিসুটি মেরে শুয়েছিল, সে হঠাৎ ছিঁক ছিঁক করে হেঁচে উঠল মাঝরাতের ঠাণ্ডায়। "মাসিমা, পার্ক সার্কাসে থাকলেও, হরেনের কিছু হবে না, রসুল তো আছে, আর…" নিত্য অনেক কিছু বলতে চেয়েছিল। রসুলের জান থাকতে, ইত্যাদি। তারপর সামলে নিল নিজেকে। ভেবে দেখল, এরকম অসহ্য ক্ষেপামির আবহাওয়ায় এই অশ্রুমুখী জননীকে ওভাবে সান্ত্বনা দেওয়ায় কী লাভ !

রাত কটা ? দুটো, তিনটে ? এখনও ঠাণ্ডার ভাবটা বেশি নামে নি, তবে ঝির ঝির করে শেষ রাতের হাওয়াটা সবে দিতে শুরু করেছে।

নিত্যর চোখ পড়ল সুধার দিকে। নিশ্চয়ই এতক্ষণ জেগে তড়পড় করছিল, এখন একেবারে এলিয়ে ঘুমোচ্ছে। মাদুর থেকে মাথাটা গড়িয়ে নেমে গেছে, আর ডান হাতটা পড়ে আছে একটা ছোট টিন স্যুটকেশের ওপরে। মেয়েটার কী অদম্য পড়বার শখ ছিল। সেবার যখন থার্ডক্লাস থেকে হরেন নাম কাটিয়ে আনল সুধাকে, সেদিন বোধহয় রাত্তিরে সে খায় নি, সারারাত কেঁদে কেঁদে বিশ্রীভাবে চোখমুখ ফুলিয়ে ফেলেছিল। তারপর বোধহয় কোনও রকমে মানিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। সারা দিন হাঁড়ি ঠেলে আর বাসনের পাঁজা পার করে মায়ের হাড়গিলে চেহারা, আর হরেনের শুকনো মুখচোখ দেখে ব্যাপারটা নিশ্চয় আঁচ করতে পেরেছিল সুধা। আঁচ করতে পেরেছিল, কেন হরেনের এত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তাকে আর পড়ান গেল না, কেন হরেনের বোন বলে ইস্কুলের হেডমিস্ট্রেস অমিয়াদি একটা ফ্রি-স্টুডেন্টশিপ দেব দেব করেও দিলেন না শেষ পর্যন্ত।

নিত্য উঠে দাঁড়ায়। রাত তিনটে হবে। ছাদটার বিশাল আয়তন ভালো করে

চোখে পড়ে। বিরাট লম্বা বাড়িটা, নীচ থেকে ঠিক বোঝা যায় না। এত লম্বা ছাদ যে নিঃসন্দেহে ছোটরা ফুটবল খেলতে পারে। আর নিস্তরঙ্গ চাঁদনীতে এই শেষরাত্রের ঝিরঝিরে হাওয়ায় কুঁকড়ে এলোমেলোভাবে শুয়ে থাকা এত লোক, সবটা মিলিয়ে অদ্ভুত লাগে নিত্যর। একটা ভারী অনাবশ্যক বোঝার মত বন্দুকটা হাতে নিয়ে ঘুমন্ত লোকদের পাশ কাটিয়ে নিত্য ছাদের প্রায় মাঝখানটায় চলে এল। এই মাঝখানের দলগুলোর চেহারা—শোয়া, আধ বসে ঘুমোনো। ইতস্তত ছড়ানো জিনিসপত্র একটু নতুন নতুন ঠেকে নিত্যর কাছে। আগেকার দলগুলোর মত শুধু টিনের তোরঙ্গ, দু-চারটে পুঁটলি, মাদুর, খুব দামী হলে একটা-দুটো পিতল কাঁসার বাসন ইত্যাদির বদলে এখানে মানুষগুলো ভালো পুরু হোল্ড-অলের ওপরে বেশ গুছানো-গাছানো বিছানা করে শুয়ে আছে এরকম একটা মহিলাদের দলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নিত্য চমকে উঠল। ভবি-দি না? নিত্য খানিকটা সাহস করেই তাকাল সে দিকে। না, ভবি-দি নয়। তবে তাঁরই পদের কোনও বর্ষীয়সী মহিলা, বোধহয় নীচের তলার অধিবাসী। পাশে দুটি কমবয়সী মেয়ে, আপাদমস্তক বড় বড় ওয়াটারপ্রুফ দিয়ে গা ঢেকে শুয়ে আছে।

নিত্য এবারে ছাদের যেদিকটা ঠিক বড় রাস্তার ওপরে, সেই ফ্রন্ট লাইনে এসে পড়ল। এক কোনায় বিরাট ইঁটের স্তূপ প্রথমে সাজানো ছিল, এখন এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সাত-আটটা ছেলে সিগারেট ফুঁকছে। সাদা শার্ট শুক্লপক্ষ চাঁদনী রাতে সহজেই দেখে ফেলবে, এ জন্যে, এই শেষ রাত্তিরের ঠাণ্ডায় অনেকেই বিছানার ডোরাকাটা চাদর দিয়ে গা মুড়ি দিয়ে বসেছে। কিছু দূরে ঘোড়ার মত মুখ করে বোধহয় গাঙ্গুলী বসেছিলেন। নিত্যকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠেন, "তোমার একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই, কখন থেকে বসে আছি, তোমার জন্যে। এর মধ্যে যে কিছু একটা হয়ে যায় নি!" তারপর নিত্যকে গানপোস্টের দিকে নিয়ে আসেন। ছাদের ঠিক দু-দিকে বড় রাস্তার দিকে মুখ করে দুটো বন্দুক রাখবার জায়গা করা হয়েছে। তিন-চারটে বালিশ দিয়ে আলসের গায়ে একটা বড় ফোকরের সামনে বন্দুক তাক করবার ব্যবস্থা—একটা মাদুরও পাতা আছে। নিত্য বন্দুকের নলটা ফোকরের মধ্যে ঢুকিয়ে একটা বালিশের ওপর উপুড় হয়ে শোয়। শাস্ত্রীকে শেষ নির্দেশ দেওয়ার মত গাঙ্গুলী নিত্যকে বলেন, "দরকার হলে, দু-দুটো একসাথে ছুঁড়ো।" কথাটা বলে বেরিয়ে যেতে না যেতেই আবার একটা গোলমালের আওয়াজ এল।

এবার গোলমালটা মনে হল, খুব কাছে, ভয়ানক কাছে। আবার শাঁখ বাজতে শুরু

করল। টং টং করে ইলেকট্রিকের পোস্ট বাজতে লাগল, যারা শুয়েছিল, তারা ধড়মড় করে উঠে বসল। প্রত্যেকবারের মত এবারও কয়েকটা ভয়ার্ত ছেলেমেয়ে তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দিল। ছেলেরা ঠোঁটে হাত দিয়ে বললে—"রেডি"। তারপরও কিন্তু গোলমালটা থামল না, মনে হল ধাপে ধাপে আরও এগিয়ে আসছে, এবারে যেন সামনের রাস্তাটার মোড পার হয়ে ঠিক এদিকেই আসছে। "আসছে, আসছে," চারদিকে কলরব উঠল। নিত্য উপুড় হয়ে ফোকরের ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণ সন্ধানী চোখে তাকিয়ে রইল। হ্যাঁ আসছে, তবে একটাই লোক। ছুটতে ছুটতে, হাঁফাতে হাঁফাতে তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মত ঠিক তাদের বাড়ির নীচে এসেই থমকে দাঁড়াল লোকটা। পাশের একতলা বাডির ছাদ থেকে হুকুম এল, "নড়ো না শালা একদম," তারপর টর্চের দীর্ঘ নীলাভ ফলা লোকটার মুখে এসে পড়ল। না, ভুল হবার কোনও উপায় নেই। পরনের লুঙ্গিটাকে মালকোঁচা মেরে ধুতির মত করে পরা হয়েছে। গায়ে একটা খাকি গেঞ্জি। ছুঁচলো দাড়ি আর খোঁচা খোঁচা চুলের ভেতর থেকে আতঙ্কে চোখ বেরিয়ে আসছে। লোকটা ওপরের দিকে হাত জোড করে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত, তারপর চারদিক থেকে একটা হিংস্র কোলাহল উঠল। মনে হল চারদিকের প্যাণ্টপরা, শার্টপরা, ধুতিপরা মানুষগুলোর মুখ থেকে কতগুলো দাঁত-বেরকরা ক্ষ্যাপা কুকুরের আওয়াজ বেরুল। আর নিত্যর কানের পাশ দিয়ে ঝড়ের গতিতে পড়তে লাগল থান থান ইঁট। কতক্ষণ, নিত্যর মনে নেই। হঠাৎ মোচড দিয়ে গলার কাছটায় একটা বমির দমক উঠে আসে, তার সমস্ত শরীরটা ঝিমঝিম করতে থাকে। নিজেকে সজাগ রাখবার জন্যে ঘামে ভেজা তেলতেলে হাত দিয়ে বন্দুকটার নলটাকে আঁকড়ে ধরল নিত্য। কিছুক্ষণ পরে, নিত্য চেষ্টা করে নিজেকে ঝাঁকানি দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। ছেলেরা তখনো দুই দলে ভাগ হয়ে, একদল ইঁট চালাচ্ছে আর একদল ইঁট ভাঙছে। গাঙ্গুলীর পাশ থেকে একটা ঢেঙা-পানা ছেলে একটা গোটা থান ইঁটই ছুঁড়ে মারল নীচের দিকে। নিত্য এবার এগিয়ে এসে দু-হাত দিয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দেয় গাঙ্গুলীকে—"আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন, কাকাবাবু?" নিত্য চিৎকার করে বলে, নিত্যর কথায় থতমত খেয়ে যান গাঙ্গুলী; তাঁরই নেতৃত্বে একটা নিরীহ লোককে ঢিলিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে; এই বর্বরতা বোধহয় প্রথম উপলব্ধি করেন। ছেলেগুলো আচমকা থেমে যায়। পাশ থেকে আবার তীক্ষ্ণ টর্চের আলো নেমে আসে নীচের দিকে। দৃশ্যই বটে; লোকটা মাথা আটকাবার জন্যে শুয়ে পড়ে হাত দিয়ে চেপে রয়েছে মাথাটা, তবে কিছুই অবশিষ্ট নেই। মাথা থেকে গুটানো পা পর্যন্ত একটা রক্তমাংসের পিণ্ড।

পাশ থেকে আতঙ্কগ্রস্ত একটা মেয়ের গলা এল, "আঃ মাগো !" নিত্য চেয়ে দেখে ছাদের সমস্ত বাসিন্দারা ছাদের গায়ে হুমড়ি খেয়ে দেখছে।
কি ভাবে লোকটাকে সরানো হল, নিত্যর খেয়াল নেই। ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে যে আরও কিছুক্ষণ হৈ-চৈ ও চিৎকার চলেছিল, শুধু এইটুকু অত্যন্ত আবছা আবছা অনুভব করে। সে শুধু স্থাণুর মত বসেছিল ছাদের এককোণে। একবার মনে হয়েছিল, হাতের গুলিভর্তি বন্দুকটাকে ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিছুক্ষণ পর গাঙ্গুলী তাঁর দলবল নিয়ে ফিরে আসেন। কিন্তু আগেকার মত নিজেদের ভেতর কথা জমে ওঠে না।
নিত্য শুয়ে পড়ে। খালপার থেকে সত্যি সত্যি এবার ভোরের হাওয়া দিতে শুরু করেছে। তার সাথে এখন হঠাৎ ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হল। সমস্ত ছাদ জুড়ে লোকে মাথা ঢেকে আবার ঘুমোতে শুরু করেছে। নিত্যরও দু-চোখ বেয়ে ঘুম নামল। একবার ঘাড় ফিরিয়ে চারদিক দেখে নেয় সে। চাঁদ নেমে গেছে। গভীর ঘুমের নিশ্বাস পড়ছে চারদিকে। একটা বাচ্চা মার কোল থেকে খুঁক খুঁক করে নড়ে উঠল। তারপর সব চুপ। ছাদসুদ্ধ লোক ঘুমোচ্ছে, ভোরের হাওয়ায়।

আট

লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড়টায় এসে কর্পোরেশনের ময়লাফেলা লরি হঠাৎ থেমে যায়। ড্রাইভার বিহারী মুসলমান। চওড়া কাঁধের দুটো কোনায় হাড়ের গম্বুজ ফতুয়া ঠেলে মাথা তুলে আছে। নাক ও মুখের নীচের অংশ রঙ-ওঠা উলের কম্ফর্টার মোড়া থাকায়, দু-তিন দিনের আগে সুর্মা-রঞ্জিত ও ঘুমে ভারী চোখজোড়াই দেখা যাচ্ছিল সব চেয়ে আগে আর অনেক দূর থেকেই তার গালপাড়া শব্দ ভেসে আসে।
সিটে বসে বসে ইঞ্জিন স্টার্ট দেবার বৃথা চেষ্টা করে হ্যাণ্ডেল হাতে নিয়ে নেমে এল ড্রাইভার। কাল আর পরশু এ অঞ্চল চিৎকারে আর দৌড়াদৌড়িতে মনে হতে পারত, এক আজব দেশ। আজ বেলা সাড়ে নটাতেই খাঁ খাঁ করছে রাস্তা। ইঞ্জিনটা চিৎকার দেবার সাথে সাথেই, তার বিকট আওয়াজের বার বার আকর্ষণে তাই কোনও ভিড় জমে না। শুধু একটা পচা গন্ধের ধারাল অভ্যর্থনা বাতাসে

বাতাসে ঘুরে বেড়াতে থাকে। ড্রাইভার মনে মনে গাল পাড়ে— "শালা, হাম কেয়া ডোম হ্যায়!"

যুদ্ধের বাজারে কেনা কর্পোরেশনের ভারী ট্রাক, এখনও সাদা রঙের ভেতর দিয়ে আবছা সবজে রঙের আঁচটা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। খোলের উপর উঁচু হয়ে জমে আছে মানুষ। একটা হাফপ্যান্ট-পরা ছেলের মাথা গড়িয়ে পড়েছে লোহার বন্ধনীর ওপর দিয়ে। তার পাশেই একটা মেয়েমানুষ উপুড় হয়ে আছে। ঠিক এক রকম রঙ হয়ে গেছে সবগুলো মড়ার। কোথাও রক্তের কোনও বালাই নেই, কারো সাথে কারো পার্থক্য নেই, সকলের চেহারা ফুলে ঢোল হয়েছে।

ড্রাইভারকে বেশ অসহায় দেখায়। মিনিট কুড়ি-পচিশ পার হবার পরও কোন জনমানবের পাত্তা পাওয়া গেল না। শকুন ঘোরে আকাশে। হু হু করে ছুটো মিলিটারি ট্রাক লুইস গান হাতে একদল গোরা সৈন্যকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। মনে হল এক প্রাণহীন আজব দেশে সমস্তক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুধু মড়ার স্তূপই আগলাবে ড্রাইভার, আর মাঝে মাঝে হ্যাণ্ডেল মারবে।

অদূরে কে. পি. টমাস লেখা একটা হলুদ রঙের ফটকের ওপর হঠাৎ একটা কাক উড়ে এল। তারপর জনবিরল রাস্তাটা পার হয়ে ও ফুটে মেট্রো সিনেমার যে পোস্টারে সাহেব-মেমসাহেব ঘন আলিঙ্গনে আবদ্ধ, তার গায়ে লাগা কার্নিসে বসে লরিটার দিকে তাকিয়ে ড্রাইভারের অসহায় অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। তারপর কোনও শব্দ না করেই যেমন এসেছিল তেমনি উড়তে উড়তে চলে যায়। এবার সমস্ত শক্তি দিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যাণ্ডেল মারে ড্রাইভার। কোঁ কোঁ কোঁ কর —র—র—র—। নিথর বড় রাস্তাটা শব্দের ঝংকারে কাঁপতে থাকে। ড্রাইভার লাফ দিয়ে সিটে এসে বসে। গাড়িটার সামনের দিকটা একবার তুলে ওঠে, আর তার ধাক্কায় যে ছেলেটা রাস্তার দিকে মুখ করে ঝুলছিল, তার মাথাটা ঢক ঢক করে দু-বার নড়ে ওঠে। তারপর এক তীব্র বেগের গমকে সমস্ত পাড়া সচকিত করে কর্পোরেশনের ময়লাফেলা গাড়িটা চোখের সামনে থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায়।

কে. পি. টমাস লেখা বাড়িটার ঠিক গায়েই স্বল্পপরিসর জমির ওপর যে তিনতলা বাড়িখানা দাঁড়িয়ে আছে তার দোতলায় উঠেই হাশেম থেমে গিয়েছিল। এক উগ্র উৎকট গন্ধে সচকিত হয়ে সিঁড়ির ধারেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল ফাটা কাঁচটার সামনে। রাস্তার ধারে বড় জানালার কাঁচের ওপর মিনা-করা তাজমহলের ওপরের অংশ এখনও বজায় আছে। কিন্তু নীচের ফোয়ারা আর ঝাউ-এর সারি রাস্তা থেকে নিক্ষিপ্ত কোন্ থান ইটের কৃপায় এখন অনুপস্থিত। হাশেম সেই ফোকরের ভেতর দিয়ে দেখছিল।

গাড়িটা স্টার্ট নেবার আগেই, কোঁ কোঁ করে আওয়াজ নেবার সময় তার সম্বিৎ ফিরে আসে। নাকের রুমালটা প্যাণ্টের পকেটে ফেলে দু-তিন পায়ে সিঁড়ি পায়। সে তেতলার দরজায় এসে ধাক্কা মারল।

রোকেয়া দরজা খুলে দিল। কালো রঙের লম্বা-চওড়া চেহারা, শালোয়ার মানায় না, তবু শালোয়ার পরতে ভালোবাসে তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়া রোকেয়া। হাশেমকে এ সময় দেখে খানিকটা অপ্রস্তুত বোধ করে রোকেয়া। জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বলে, "আসুন, আসুন।"

"একটা টেলিফোন করতে এলুম। চারদিকে সব দোকানপাট বন্ধ।"

"ও তাহলে আপনি একটু বসুন, আমি দেখে আসছি।"

হাশেম বসে। বসবার ঘরখানা না মোগল কায়দায়, না সাহেবী ঢঙে সাজান। আগাগোড়া জ্যাবড়া জ্যাবড়া ভারী কার্পেট দিয়ে মেঝে মুড়ে, দেওয়ালে দেওয়ালে আরবী-উর্দু বয়েত লেখা, লাল নীল হলদে মসজিদ ও মক্কা প্রভৃতি পবিত্র স্থানের ছবি টাঙিয়ে, তারই মাঝে বিলিতি ঢঙের হালকা সোফা চেয়ার পেতে বসবার ঘরের যে ফ্যাশান এ সমাজে প্রচলিত, এ ঘরখানা সে দোষমুক্ত। ছবি থাকলেও খুব কম, মুসলিম নেতাদের কয়েকখানা ফটো, চেয়ারগুলোর মাঝে একটা ছোট পা-রাখা কার্পেট। দেওয়ালের আয়নার পাশে খালি জায়গাটায় একটা নতুন ধরনের ক্যালেণ্ডার। এ খানা বর্তমানে মুসলিম সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ভারতবর্ষের দু-রঙা মানচিত্র, আর তার মাথার ওপর একজন মুসলিম নেতার ছবি; তিনি দর্শকদের দিকে একখানা খাপ খোলা তলোয়ার নির্দেশ করছেন।

"সকাল থেকে নানা ফোন নিয়ে পড়েছেন। আপনাকে কিছুক্ষণ বসতে হবে।" রোকেয়া ঢুকতে ঢুকতে বলে। ইতিমধ্যে সে যে একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে, সেটা তার চুলের কায়দা দেখে বোঝা যায়।

"বন্ধুকে ফোন করবেন?" চেয়ার টেনে বসে রোকেয়া। হাশেম মাথা নাড়াতে আবার জিজ্ঞেস করে, "কোথায়, শ্যামবাজারে থাকেন?"

হাশেম উত্তর দিল, "না সাউথে।"

"ওখানে অনেক মারা পড়েছে শুনলাম," একটু ইতস্তত করে বলে রোকেয়া।

"এই এখানকারই মত," হাশেম উদাসীনভাবে জবাব দেয়।

"ফিরোজ বলছিল—ফিরোজকে তো চেনেন আপনি? ও বলছিল খালি ভবানীপুরেই নাকি হাজার পাঁচেক মুসলমান মরেছে।"

"পাঁচ হাজার মুসলমান কোনও দিনই ছিল না ও জায়গায়।"

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ—কথা আর এগোয় না। রোকেয়া আড়ষ্ট ভাবটা কাটাবার জন্যে সামনের জানালাটা খুলে দেয়। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, "আজকের কাগজ পড়েছেন ?"

হাশেম একটু চিন্তিত গলায় বলে, "কাগজে যা লেখে, তা তো কিছুই বুঝি না।"

রোকেয়া সহানুভূতির স্বরে বলে, "হ্যাঁ হিন্দু কাগজগুলোতে যা লিখছে আজকাল !"

"আমাদের কাগজও তো পড়ছি। হিন্দুদের সাথে নাকি আমাদের কোনও কালে মিল ছিল না, মিল হবেও না। নিশ্চয় দু-চার দিন পরে আমাদের কাগজের থিয়োরিটিশিয়ান লিখবেন, আমরা কাছা দিই না, ওরা কাছা দেয়। আমাদের দাড়ি আছে, ওদের দাড়ি নেই।" কথাটা শেষ না করেই হেসে উঠল হাশেম।

"না হাসির কথা নয়, সত্যি সিরিয়াসলি বলছি আমি।"

"কী বলছেন ?"

"ওদের সঙ্গে কি সত্যি সত্যি বাস করা যায় ?"

হাশেম চুপ করে একটু ভাবে। তারপর বলে, "দেখুন তো আপনার নানার ফোন করা হল কিনা।"

হাশেম ফাঁদে পড়ে নি, আগে হলে নিশ্চয় রোকেয়ার মূর্খতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্যে উঠে পড়ে লাগত। বছর দুয়েক আগেও সে রোকেয়াকে নতুন সমাজবিজ্ঞানের কথা বোঝানোর জন্যে কী আপ্রাণ চেষ্টাই না করেছে ! রোকেয়া যখন ফিরোজের কথা তুলে বলত, "কমিউনিজম কিছু নতুন চিজ নয়, ইসলামের ভেতরেও তো আছে," তখন তাকে বোঝাবার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে অপব্যবহার করেছে। আরবের পুরনো ইতিহাস ঘেঁটে বোঝাবার চেষ্টা করেছে, প্রত্যেক দেশেরই ইতিহাসের মত সে দেশের ইতিহাস। সেই একই যাযাবর-বৃত্তি, ভূমির ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য করবার জন্যে দলপতির চেষ্টা ইত্যাদি। উৎসাহের চোটে হাত-পা নেড়ে বর্ণনা করেছে খলিফাদের অত্যাচার। সবচেয়ে বেশি করে বলেছে, গলার স্বর চড়িয়ে পর্দা-প্রথার ওপর। তারপর হঠাৎ একদিন ফিরোজের সঙ্গে দেখা হলে ফিরোজ তার নবলব্ধ অফিসারের মিহি হাসি হেসে বলেছে, "হাশেম ইউ আর ফানি !"

"কী রকম ?"

হাশেমকে বিস্মিত করে ফিরোজ ইংরেজিতে বলেছিল, "যখন তুই একজন তরুণীর সঙ্গে কথা বলবি, তখন তোর সিরিয়াস কথা পকেটে তোলা থাকবে। রোকেয়া বলছিল, তুই কথা বলার সময় বড্ড হাত-পা ছুঁড়িস।"

ঘরে ঢুকে রোকেয়া বলল, "আপনি নিশ্চয়ই বিরক্ত হচ্ছেন ? কিন্তু কী করব, এখনও উনি শেষ করেন নি। সেই সকাল থেকে লোক আসছে যাচ্ছে। উনি আবার এ পাড়ার ডিফেন্স পার্টির সেক্রেটারি কিনা!"

"আচ্ছা, আমি আর খানিকক্ষণ বসছি।"

প্রায় মিনিট তিনেক চুপচাপ কেটে যায়। রোকেয়া পাশের টিপয় থেকে একটা পিতলের হরিণ তুলে লোফালুফি করে, তারপর রেখে দেয়। বাইরে রোদটা আরও চড়া হয়েছে, দেওয়াল ঘড়িটা হঠাৎ কথা বলে ওঠে, টং টং করে দশটা বাজে। দুজনেই কী যে বলবে, বুঝে উঠতে পারে না।

এমন সময় বজো এল—খুব বেশি হলেও এগারো-বারো বছর হবে বয়স। চকচকে সবুজ ডোরাকাটা লুঙ্গি আর ময়লা জামা পরনে বজো এ বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তার বাপের মোষের গাড়িতে চড়েছে হাশেম, দেশে থাকতে। ছ-ফুটের ওপর লম্বা, দৈত্যের মত চেহারা ছিল বজোর বাবার। সারা দুপুর হালে-জোতা অবসন্ন প্রাণী দুটিকে গ্রাম থেকে স্টেশন পর্যন্ত কি ভাবে সামলাত, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বজো হাশেমকে দেখে একগাল হাসে। হাসবার সময় তার চোখগুলো বুঁজে যায় আর লাল মুশলো বেরিয়ে পড়ে। বলে, "সেলাম আলেকুম।"

"কি রে নোয়াখালির ছেমড়া ? কয়ডারে মারছস ?"

হাশেমের এ প্রশ্নে বজো কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়ে, যেন নিজের অকৃতকার্যে তাকে মুহ্যমান দেখায়। তারপর মাথাটাকে বড়দের মত ঝাঁকিয়ে উৎসাহের চোটে বলে, "মারমু, মারমু, প্যাশ হলে কয়ডারে যে কোরবানী করতাম !" হাশেমের সঙ্গে সঙ্গে রোকেয়াও সশব্দে হেসে ওঠে।

হাশেম চুপ করে যায়। কথা ঘোরাবার ছলে বলে, ' 'তোর চাচার খবর কী রে ?"

এক মিনিটের মধ্যে বজোর মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। চোখটা ব্যথায় ডাগর হয়ে ওঠে। রাস্তায় দেখা হলেই হাশেম তাকে তার চাচা সেরে উঠেছে কিনা, খবর নেয়। কিন্তু কেন যেন আজ এ প্রসঙ্গে ক্ষেপে যায় সে, রোকেয়ার নানার যে ফোন করা শেষ হয়ে গেছে, সে খবরটা দিতে এসে তার দেওয়া হয় না। অসহিষ্ণু গলায় বলে, "আপনি তো রোজই এক কথা কয়েন। রাতবেরাতে পাইক বরকন্দাজরা চাচারে বাঁশ মাড়াই দিবে, তাতে আফজল সাহেবগর দোষ কি !"

হাশেম ব্যাপারটা জানত। আর একটু শুনবার জন্যে খোঁচা দিয়ে বললে "আফজল সাহেবের দোষ নেই ক্যান ? তার নায়েবটা হইল শয়তান, আর সে হইল গিয়ে পীর, এ কী কস ?"

বজোর চোখে জল এসে পড়েছিল। তবু হাশেমের সামনে সে অপ্রস্তুত হবে না, তাই জোড় দিয়ে বললে, "আপনি বড় ট্যারাইয়া ট্যারাইয়া কন হাশেম সাহেব।" হাশেম অবাক হয়। বজো যে ব্যাপারটাকে নিয়ে এরকম গুমরাচ্ছে, তা আন্দাজ করতে পারে নি সে। রোকেয়ার নানার ভ্রাতুষ্পুত্র আফজল সাহেব একজন প্রতিষ্ঠিত জোতদার। চালের ঠিকেদারি করে আসছেন বিয়াল্লিশ সাল থেকে; ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, স্থানীয় ইস্কুলের সেক্রেটারি ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর মসজিদের সংলগ্ন বাসের অযোগ্য এক টিনের চালাঘরের বাইরে, এক সাঁঝ রাতে খসখস আওয়াজ পান আফজল সাহেবের নায়েব, ইরসাদ সাহেব। বজোর চাচা এসেছিল রাত্তিরে বাঁশপাতা কুড়োতে জ্বালানির জন্যে। ঘরপোড়া গরুর মত ইরসাদ সাহেবও ভয় পেলেন সিঁদুরে মেঘ দেখে। চালাঘরে সাতদিন আগে দুটো তিনমনি বস্তার পা গজিয়েছে। বজোর চাচাকে তাই চোর ঠাউরে, কি ভাবে তার বুকে বসে বাঁশডলা দেওয়া হয়েছিল, তা গাঁয়ের লোক না জানলেও এটুকু জানতো বুড়ো কোনও রকমে হেঁচড়ে হেঁচড়ে শরীরটাকে টেনে ভাই-এর দাওয়ায় এসে শয্যা নেয়।

হাশেম ব্যাপারটা শুনেছিল বজোর মুখে। ছেলেটার এরকম অপ্রত্যাশিত বেদনা-বোধ স্পর্শ করে তার মনকে। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "কি রে, তোরগো বাড়িতে ফোন হব, না হব না?" বজো লজ্জা পায়। মুখের ওপর এসে পড়া খোঁচা খোঁচা চুল-গুলোর মধ্যে হাত চালিয়ে বলে, "আপনাকে তো ডাকতে আইলাম ঐ লগে চলেন।" হাশেম বারান্দায় আসে। বারান্দার লাল মেঝের দু-ধারে ভারী পুরু পর্দা। রোকেয়াই বেশি ডাকাবুকো, পর্দা ছেড়েছে কলেজে ঢুকে। নইলে যে পরিচ্ছন্ন বাঁদীর ভাব এ সমাজে প্রচলিত, এ বাড়ি তার ব্যতিক্রম নয়। তিন-চারখানা ঘর ছাড়িয়ে একখানা বাঁক ফেরে বজো। সামনে সোফায় কয়েকজন বাঙালী-অবাঙালী মুসলিম ব্যবসায়ী, গলা আটকানো শেরোয়ানী আর জিন্না ক্যাপের গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে চা খাচ্ছেন। রোকেয়ার বাবার চেহারা অন্য ধরনের; একটা আমেরিকান খাকি প্যাণ্টের ওপর পাতলা হাফহাতা সিল্কের সার্ট পরে বিজনেস সংক্রান্ত ব্যাপার আলোচনা করছিলেন। হাশেমকে দেখে একবার মাথাটা হেলিয়ে বললেন, "হ্যালো হাশেম।" বারান্দা পার হয়েই ফোন করবার ঘর। হাশেম যখন ফোন তুলল, তখন মাংস রান্নার চড়া গন্ধ ভেসে আসে তার নাকে।
"হ্যালো পি কে ... ... সেই একটানা শব্দের প্রত্যুত্তর কররর—কট ... ... কররর-কট ... কররর-কট ... কতক্ষণ চলল। দু-মিনিট তিন-মিনিট ... নিত্যকে পাওয়া

যাবে না ফোনে, একবার মনে হয় হাশেমের। তারপর নাম্বার বলার পরও, আর কোনও আওয়াজ এল না। লাইন যেন উলটে পালটে গেল। কারা কথা বলতে লাগল ভয়ানক উত্তেজিত স্বরে। মস্ত বড় হলঘর থেকে অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছে মনে হল। অনেকক্ষণ পর এ সমস্ত শব্দ থেমে যায়। একটা মোটা ভারী স্বর জেগে উঠল, "হ্যালো।" হাশেমের একবার মনে হয়, রঙের দোকানের বড়-বাবু ধরেছেন। প্রায় মরিয়ার মত চিৎকার করে ওঠে, "হ্যালো আপনি কি একটু দয়া করে পাশের বাড়ির নিত্যকে ডেকে দেবেন?" "কাকে?" নিত্যকে!" "চিত্তকে?" "নিত্য, নিত্য, আপনাদের দোকানের ও ফুটেই!" "ও আচ্ছা ধরুন।" আবার চুপ। আগেকার মত রহস্যজনক শব্দ উঠতে থাকে ফোনে। হাশেম ঘাবড়ে যায়, মনে হয় বোধ হয় কেটে দেবে লাইন। সময় কাটাবার জন্যে দেওয়ালের দিকে তাকায়। একটা ফটো ঠিক নাকের সামনে ঝুলছে। রোকেয়ার নানার ফটো, অস্পষ্ট হয়ে গেছে। চারদিকে অনেক ফুলের টব। একটা পুরনো মডেলের ফোর্ড গাড়ির পিছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। রোকেয়ার নানা একটা ঢেঙামতন সাহেবের সঙ্গে করমর্দন করছেন। নীচে ময়মনসিং না কি, ঠিক পড়া গেল না।
"হ্যালো, কে?" হাশেম সম্বিৎ ফিরে পায়। "হ্যালো, আমি হাশেম।" "ও তুই?"—নিত্যর গলার আওয়াজ এল। তারপর কোনও কথা শোনা যায় না দু-দিক থেকে। "কি রে, চুপ করে আছিস কেন?"—হাশেমের এ প্রশ্নে আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে নিত্য, তারপর ধীরে ধীরে তার জবাব আসে। "কী বলব, ভাবছি।" হাশেম হঠাৎ হেসে ওঠে। তার হাসিতে সহজ ভাবটা ফিরে আসে তাদের মধ্যে। "ভাবছিস কী, সবাই ভালো আছে তো?" "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবাই ভালো আছে" নিত্য এতক্ষণ পর কথা খুঁজে পায়, বেশ হালকা গলায় বলে, "তোরা নাকি হিন্দু ছেলেদের ধরে কাঁচা কাঁচা খাচ্ছিস?" হাশেমের গলাটা এতক্ষণ পর বেশ স্পষ্ট ও জোরালো হয়ে ওঠে, "তাও ভালো, আমি ভাবছিলাম, বলবি, আমরা আগাগোড়া পাশবিক অত্যাচার করে বেড়াচ্ছি!"
এবার নিত্যর বাঁধ ভাঙল। এত তেড়ে কথা বলতে থাকে যে, মাঝে মাঝে এটা ওটার ঘাড়ে গিয়ে পড়ে।—"আমাদের পাড়ায় এক ভদ্রলোক আছেন, বুঝলি, সারা জীবন মোটা সরকারি চাকরি করে এখন রিটায়ার করেছেন, এখন রোজ পার্কে বিকেল বেলা ছড়ি নাচিয়ে নাচিয়ে বেড়ান। কলেজে তিনি বক্তৃতা দিলেন, বুঝলি? হ্যালো শুনতে পাচ্ছিস?"
"হ্যাঁ বলে যা।"

"একটা একেবারে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। বললেন, আজ নতুন জালিয়ান-ওয়ালাবাগ তৈরি হয়েছে কলকাতার রাস্তায়। এই অন্যায়ের প্রতিশোধ কি ক্ষুদিরামের বংশধররা নেবে না? ব্যাপারটা বুঝেছিস?" হাশেম চুপ করে থাকে। খানিকক্ষণ পরে বলে, "চৌধুরী সাহেবের খবর কি?"

"দাদা আপিসে। বৌদি দিনরাত কাঁদছেন; হাসি খুব কষে ঝগড়া করছে গুজা-রামের সঙ্গে। একটা ভালো খবর দি তোকে। আমাদের বাড়ির কাছে হরেনদের বস্তিতে আগুন দেয় বিশ্বাসদের বাড়ির দারোয়ানরা। একটা সাবানের কারখানা ছিল ওখানে। হরেন বাড়িতে নেই, সারা রাত জেগে হরেনের বুড়ীমা আর তার ছোট বোন পাহারা দিয়েছে তিনটি ছেলেকে। কাল সকালে চালান দেওয়া গেছে।"

"আর আমরা খুব মজায় আছি। দু-বেলা মাংস খাচ্ছি। আর প্রায় কিছুই খাচ্ছি না। গোয়ালাগুলোকে সব মেরেছে, বাড়িতে বাড়িতে বাচ্চাগুলো অষ্টপ্রহর চেঁচাচ্ছে। সবজি আসা বন্ধ, রেশনের দোকানে ডবল তালা, চাল একেবারে ফাঁকা আর কিছু বলতে গেলেই কওমের শত্রু। আমি যে বাড়ি থেকে ফোন করছি, সে ব্যাটা বিরাট গুণ্ডা, কালকে এক বাড়িতে আগুন দিয়েছে, আজকে পিস কমিটির সেক্রেটারি।"

হঠাৎ টেলিফোনের লাইন কিছুক্ষণের জন্যে উলটে পালটে গেল। নিত্য ব্যাকুলভাবে বললে, "আজ বিকেলে একটা রেসকিউ পার্টির সঙ্গে চৌরঙ্গীর কাছটায় যাচ্ছি। আচ্ছা, যে কেবিনটায় আমরা মাটন চপ খেতাম, সে দোকানটা তো সেফ, না রে? পাঁচটা নাগাদ আমি আসব। তখন সব আলাপ করা যাবে, বুঝলি? পাঁচটা নাগাদ, মনে থাকে যেন, ছেড়ে দিলাম, আচ্ছা।"

হাশেম ফোন ছেড়ে দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। আবার ঠিক আগেকার মত মাথা হেলিয়ে রোকেয়ার বাবা বলেন, "হ্যালো হাশেম।" হাশেম বসবার ঘরে ফিরে এসে দেখলে, বোধহয় বড়ো ঘরটা মোছার সময়, বাইরের ধূলোবালি আটকাবার জন্যে দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়েছে। ঘর প্রায় অন্ধকার। শুধু একটা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে এক ফালি রোদের ফলা ঘরের মাঝখানটায়, যেখানে রোকেয়া বসেছিল, সেখানে এসে পড়েছে। রোকেয়া পাশের টেবিলে সাজানো কাল সন্ধ্যের কতগুলো বাসি ফুলের তোড়া থেকে একটা শুকনো গোলাপ টেবিলক্লথের উপর ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলছিল মুখ নীচু করে। হাশেম কাছে এসে বলল, "চলি"। তারপর রোকেয়া মাথা তোলবার আগেই, তর তর করে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

নয়

"আমারটা দাদা আগে নোট করুন।"

"আমার স্থার ছোট ভাই তিন দিন কলুটোলায় আটকে রয়েছে।"

"আপনাকে আর কি বলব দাদু, সবই তো বোঝেন। রাজাবাজারে পড়ে আছে আমার মেয়ে-জামাই। মা দু-দিন অন্নজল ত্যাগ করে; আশা করি আপনাকে আর রিমাইণ্ড করে দিতে হবে না। আমার ফাদার যে মনোকষ্টে আছেন।"

"মেরা—মেরা—মেরা বহু…"

মুশকিলে ফেলল শেষের লোকটাই। বেশ চলে আসছিল এতক্ষণ। বোধহয় মুটে কয়লা ডিপোর। সমস্ত শরীর, গায়ের কোর্তা আর পরনে নেংটির মত করে পরা একফালি কাপড় কয়লার গুঁড়োয় ভর্তি। যদিও পাঁচ দিনের ওপর ডিপো বন্ধ তবু মুখে, পায়ের গোড়ালিতে, চোখের পাতায় কয়লার রেতি পড়ে আছে। লোকটা ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে। চেয়ারে বসে ভয়ানক গম্ভীরভাবে যে ছোকরাটি এতক্ষণ একটা লম্বা নীল রঙের বাঁধান খাতায় নাম ও ঠিকানা লিখছিল, সে খিঁচিয়ে ওঠে, "কেয়া তুম দারু পিয়া?" উত্তর দেবার জন্যে লোকটা নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে। গলা কুঁচকে কান্না বন্ধ করবার প্রাণপণ প্রচেষ্টায় গলার ডিমটা ওঠানামা করে। তবু যখন কথা বলতে চায়, তখন একটা বিশ্রী আওয়াজ বেরোয় মাত্র। এবারে ধৈর্যচ্যুতি হয় ছোকরার। এখনও লোকের দীর্ঘ লাইন এ ঘর ছাড়িয়ে পাশের সিঁড়ি দিয়ে একেবারে বড রাস্তা পর্যন্ত নিরেট দাঁড়িয়ে। পুলিসের কায়দায় গাল দেওয়ার ভঙ্গিতে ছোকরাটি বলে, "কেয়া শালা, মালুম নেই তুম কিধার আয়া?" বলেই কলমটা রেখে কটমট করে তাকিয়ে তার চেহারার ভাবখানা খুব জাঁদরেল গোছের করতে চেষ্টা করে, তবে নেহাত রোগা বলে বিশেষ ভয়াবহ দেখায় না। মুটিয়াটি শান্ত হয়েছে এতক্ষণে। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে সে যখন দাঁড়াল, তখন আরও তোবড়ানো আর ক্ষয়গ্রস্ত লাগে তার চেহারা। গলায় একবার কাশির আওয়াজ করে লোকটা ধীরভাবে বলে, "উন লোগ বোলা রিপোর্ট করনে……"

কাজের দেরি হচ্ছে বলে ছোকরা অফিসারটি অসহিষ্ণু গলায় বলে ওঠে, "কোন রিপোর্ট?"

"হামারা বহু, হামারা এক লেড়কা ঔর এক লেড়কি; মোকাম—মজঃফরপুর।" অদ্ভুত

শান্তগলায় জবাব দেয় লোকটা। তারপর স্বগতোক্তি করে—"মর গিয়া সব লোক। লোহার পুল চার নম্বর। আদমী লোগ বোলা, রিপোর্ট করনেকো লিয়ে।" লোকটা পা টেনে টেনে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। পাশে একটা র‍্যাকভর্তি তেলচিটে মলাটে বাঁধা কাগজপত্র। কারও লাল ফিতে বেরিয়ে আছে, কারও পাতা ফ্যানের হাওয়ায় উড়ছে ফরফর করে। ওপরে দেওয়ালে খুব একটা মজবুত ঘড়ি, নীচে একফালি সাদা কাগজের ওপর লেখা—মঙ্গলবার। ঘড়ির ঠিক উলটো দিকে আরও পুরনো ধুলোপড়া পঞ্চম জর্জের একখানা ছবি। বর্ষার জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে দেওয়ালে গড়িয়ে পড়ে সম্রাটের চেহারার ওপর হামলা করেছে। পাশেই অপেক্ষাকৃত চকচকে পরবর্তী সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের ছবি। দেড় মানুষ উঁচু দুটো লম্বা লম্বা আলমারির ফাঁক দিয়ে ভেতরের বারান্দা দেখা যাচ্ছে। ঘরের ডানদিকের একটা সুইং ডোর দিয়ে ব্যস্তসমস্তভাবে লোক আসা-যাওয়া করছে। ভেতর থেকে আসছে কড়া তামাকের গন্ধ। জরুরি বৈঠক চলেছে উচ্চতম কর্মচারীদের।

ভিড় মানেই গরম। গত রাত্রের বৃষ্টি যেন আজ মনেই পড়ে না। কেমন একটা ভ্যাপসা গরম বোধ হয় সবার। এত ধীরে ধীরে লাইনটা অগ্রসর হয় যে এক-একবার মনে হয় সামনের ছোকরার বোধ হয় কলমই চলছে না। এমন সময় পাশের ঘর থেকে পুলিসের একজন অফিসার বেরিয়ে আসেন। কালো লম্বা সবল চেহারা। চুলগুলো বেশ পালিশ করে ওপর দিকে তোলা। লাইনের কাছে এসে হাত তুলে অফিসারটি বোঝাতে লাগলেন। "একটু ধৈর্য ধরুন খালি।" অফিসারের চেহারাটা হেললে ঠিক বেতের মত লাগে।

ঠিক বেতগাছের মত কখনও ঝুঁকে, কখনও মাথা দুলিয়ে জনতাকে বোঝান, "সবই তো বোঝেন আপনারা। মুসলমানদের গাভমেণ্ট। আমাদের হাতে থাকলে দেখতেন, কী করতাম! কোনও পাওয়ার দিয়েছে শালারা আমার হাতে, বলুন?"

থানার বাইরে, দুটো পুলিসের ট্রাক। গাড়োয়ালী সৈন্যরা ফেট্টি খুলে দিয়ে এলিয়ে আছে। থানার গা দিয়ে যে প্রকাণ্ড নিমগাছটা তার ছায়া এসে পড়েছে তাদের মুখেচোখে। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দু-তিন জন বিহারী পুলিস একটা ভিড়ের সামনে হাত-পা নেড়ে বলছে তাদের অভিজ্ঞতার কাহিনী। একজন আই-বির লোক একটা কাঠের টুলের ওপর বসে পরম প্রশান্তভাবে দাঁত খুঁটছিল।

নিত্য দেহরক্ষীর পারমিট নিয়ে বিশ্বাসদের বাড়ি যায়।

একটা বিরাট লিস্ট হাতে বড়বাবু স্বয়ং বসে আছেন উঠোনে ফরাসপাতা এক চৌকিতে। বিশ্বাসদের ইট বইবার দুটো ট্রাকে চড়ে পাড়ার ছেলেরা হৈ হৈ করতে করতে বেরিয়ে যাচ্ছে। ফিরে আসছে কয়েকটি ঘটিবাটি আর পুঁটলি সমেত চোখ বসে যাওয়া চুল উস্কখুস্ক কতকগুলো উদভ্রান্ত মানুষকে নিয়ে। বিশ্বাসদের বাড়ির বৌ উমা একপ্লেট দুধ আর কিসমিস দিয়ে যায়। পাশ থেকে ফস করে পাড়ার গাঙ্গুলী ডাক্তার বলেন, "এই বয়সেও দাদু, আপান যা খাটছেন!" বড বিশ্বাস চামচ দিয়ে দুধে-ফোটানো ফোলা ফোলা কিসমিস মুখে তোলেন আর চিবোন। তারপর একবার গাঙ্গুলীর দিকে সম্মতিসূচকভাবে মাথাটা হেলিয়ে সড়াক করে সমস্ত দুধটা টেনে নেন চুমুক দিয়ে। গাঙ্গুলী আবার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ে যেখানে যেমন, সেখানে তেমন সুরে বলেন, "আগেকার লোকেরা কী রকম খাটত দাদু! আর এখন মায়ের পেট থেকে পড়লেই হ্যানা ফুড, ত্যানা ফুড! এখন তো শতকরা আশিটা লোকের ভিটামিন ডিফিসিয়েন্সি।"

ছোট্ট চৌকি, প্রায় পাঁচ-ছটা ছোঁড়া ও ভদ্রলোক এবং নিত্যদের মত কয়েকটা কলেজের ছোকরা ঠেসেঠুসে বসেছে। পাশে আরও ভিড় করে আছে জন দশেক। চৌকিটার শেষ প্রান্তে বসেছিলেন অবিনাশবাবু। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের ওপর বই লিখে ডাক্তার হওয়ায় কম কথা বলেন। গাঙ্গুলীর কথায় এতক্ষণ পরে মুখ খোলেন, "আপনি কি আপনার শতকরা আশিটা লোকের মধ্যে মুসলিমদেরও ইনক্লুড করছেন?" গাঙ্গুলী তাকান অবিনাশবাবুর দিকে। মনে হল, অবিনাশবাবু একটা তুলনামূলক সমালোচনা কেন্দ্র করে এখানে একটা তর্ক বাধিয়ে দেবার জন্যে উদগ্রীব। গাঙ্গুলী কিন্তু বললেন অন্য কথা, "তবে একটা গল্প বলি শুনুন।"

গাড়ি বারান্দার নীচে তখন রোদ নেমে গেছে, এতক্ষণ যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিল, তর্ক করছিল, তারা কেউ চেয়ারে, কেউ ঘাসে আধশোয়া আধবসা হয়ে আছে। সবাই ক্লান্ত, আর একখানা ট্রাক ফিরে না আসা পর্যন্ত কোন কাজ নেই হাতে।

বেশ আষাঢ়ে গল্প ফাঁদার মত গাঙ্গুলী আরম্ভ করলেন, "তখন ছিলাম ভোলা সাবডিভিশানে, বেড়ে ছিলাম। সপ্তাহে তিন-চারটে করে খালি জখমির কেস। বর্ষার রাত, চারদিক ভেসে গেছে জলে। একদিন সন্ধ্যেবেলা ফিরছি, হাসপাতালের কাছে আমার কোয়ার্টারে, এমন সময়ে কম্পাউণ্ডার এসে বলল, 'চার নম্বর পেশেণ্টকে পাওয়া যাচ্ছে না স্যার।' লোকটাকে অপারেশন করেছি সেই দুপুরে। টেঁটা লেগে

পেটের নাড়ি সব বেরিয়ে এসেছে। বুকের পাশে খানিকটা জায়গা হাঁ হয়ে আছে। হাত ঢুকিয়ে দিলে এক বিঘত চলে যাবে। কোনও রকমে জুড়ে দিয়েছি। ভাবলাম পেচ্ছাব করতে উঠে, এই অন্ধকার বাদলা রাতে কোথাও পড়ে মরে আছে। সে রাত্রেই পুলিসে খবর দিলাম। কাছে আশে পাশে ডোবাপুকুর খোঁজা হল টর্চ দিয়ে। তারপর ফিরে গেলাম কোয়ার্টারে।"

অবিনাশবাবু বাধা দিলেন। চশমা চোখের ওপর ভালো করে নেড়ে চেড়ে বসিয়ে বললেন, "আপনি যা বলছিলেন ডাঃ গাঙ্গুলী, সেটা কি সত্যই ট্রু ?" বড় বিশ্বাস ডান হাতটা তুলে অবিনাশবাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, "থামো।"

এবার প্রবল উৎসাহে গাঙ্গুলী ডাক্তার বলে চলেন, "সকালে উঠেই দেখি কম্পাউণ্ডার কড়া নাড়ছে। বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বললে, 'পেশেণ্ট ফিরে এসেছে স্যার। খুব বমি করছে।' তখনই গেলুম, দেখি, শুয়ে আছে লোকটা। জিজ্ঞেস করলুম, 'কী রে কোথায় ভেগেছিলি ? লোকটার ঠিক চোখের নীচ থেকে দাড়ি নেমেছে। ঠোঁটের ওপর থেকে দাড়ি সরিয়ে লোকটা বললে, 'ভাবলাম বিবিডারে দেইখ্যা আয়ি। বিবিডা ছাড়ল না, তুডা পান্তা দিল, খালাম।' অপারেশনের রাত্তিরে তিন মাইল হেঁটে লোকটা বিবিকে দেখে পান্তা খেয়ে ফিরেছে!" গাঙ্গুলী ভেবেছিলেন সেপটিক হয়ে যাবে, কিন্তু সাত দিনের মধ্যে সেরে উঠে লোকটা হেঁটে হেঁটেই বেরিয়ে গেল।

গল্পটা শেষ হবার পর, সকলেই বেশ একটু অস্বস্তি বোধ। বড় বিশ্বাস দুবার তিনবার গলা ঝাড়লেন। অবিনাশবাবু 'এমন একটা কি আহামরি গল্প'—এই রকম ভাব করে বসে থাকলেন।

গল্পটা এমনিতে ভালো, তবে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পটভূমিকায় বেশ বেখাপ্পা। দুটো গুর্খা শান্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নিত্যদের ট্রাক যখন মুসলিম পট্টিত ঢুকল, তখন সন্ধ্যে না নামলেও বেলা প্রায় গড়িয়ে এসেছে। আকাশের যে কোণটা শেয়ালদার দিকে নেমেছে সেখানে পড়ন্ত সূর্যের আলোয় মেঘেরা রঙ বদলাচ্ছিল। ট্রাক থেকে নেমে ছেলেগুলো একটু হতভম্ব হয়ে যায়। এমন নিস্তব্ধ আর শান্তিপূর্ণ লাগছে চারদিক, এমন স্বাভাবিকভাবে সিনেমা, রেস্তোরাঁর সামনে ভিড় করে আছে জনতা আর একটা বেঞ্চির ওপর ভাঙ্গা ঝরঝরে একখানা গ্রামোফোন রেখে তার পাশে এমন তন্ময়ভাবে কতগুলি শ্রোতা হিন্দি গানের সঙ্গে সঙ্গে মাথা দোলাচ্ছিল যে, এটা যে একটা ভীষণ শত্রুপুরী, সে ধারণা মোটেই আসছিল না সবার মনে। সামনে দাঁড়-করানো দুটি ফিটনের ধারে দু-তিনজন গাড়োয়ান বিড়ি

ফুঁকছিল, আর আলাপ করছিল নীচু গলায়। তাদের দিকে দেখিয়ে একটি ছোকরা পাশের সঙ্গীকে কনুই-এর খোঁচা মেরে বলে, "কী রকম-জুল জুল করে তাকিয়ে আছে ছাখ।" তবু এই পড়ন্ত বিকেলের ম্লান আলোয় চারদিকে অলিগলি আর মানুষের যাতায়াতে কেউই ঠিক রোমহর্ষের ভাব জাগাতে পারছিল না, নিজেদের মনে। ঠিকানা খুঁজে যে বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামল, তার নীচে একটা চুলকাটা সেলুন। সবার খুব আশ্চর্য লাগছিল সেলুনটার সেই একই মামুলী চেহারা দেখে। পাশে দুটো বাহারওয়ালা নীল কাঁচের ওপর সেই চিরপরিচিত সাদা রঙের ইংরেজি অক্ষরগুলো—

চুলকাটা—'৫৭
দাড়িকামানো—'১২
ড্রেসিং—'১২
চুলকাটা, দাড়িকামানো, ড্রেসিং (একত্রে)—

যেমন প্রত্যেক সেলুনেই দেখা যায়, ঠিক তেমনই এখানেও বন্ধ হয় না, অথবা ইচ্ছে করে বন্ধ করা হয় না এমনি এক আধখোলা দরজার পাল্লা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল কাঁচি চালানো হাতের নীচেই আপাদমস্তক সাদা চাদরে মুড়ে আরামে এলিয়ে দেওয়া আধ শোওয়া শরীর। সবচেয়ে অবাক হল নিত্যর সঙ্গীরা যখন দোকানের লুঙ্গিপরা দুজন কর্মচারি তাদের রাস্তা দেখিয়ে দোতলার একটি বন্ধ কুঠুরির সামনে এনে হাজির করলে এবং তাদেরই গলার সাড়ায় একজন দুজন করে ছ-সাতটি উদভ্রান্ত মানুষ বেরিয়ে এল বারান্দায়। আরও অসম্ভব লাগল সেই দুজন কর্মচারীর একজনের আঙুল ধরে আশ্রয়প্রার্থীদের একটি ছ-সাত বছরের ছেলে বেশ স্বচ্ছন্দে নেমে এল এবং ট্রাক চলতে শুরু করলে ছেলেটি তার পূর্বতন সঙ্গীকে লক্ষ্য করে মনক্ষুণ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "তুমি আসবে না?"

ব্যাপারটি যে এত সহজে ও তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে, তা কেউ ভাবতেও পারে নি। প্রায় মিনিট দশেক পরে বড় রাস্তার মোড় ফিরতেই নিত্য প্রায় লাফিয়ে উঠে বললে, "রোখকে।" হিন্দুপাড়া ও মুসলিমপাড়ার সীমান্তে যেখানে হাশেমের সঙ্গে তার দেখা করার কথা ছিল, সেটা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল আর একটু হলে। নিত্য নেমে পড়ে। এখানে ভয় নেই। কেমন প্যারাম্বুলেটারে করে ফিরিঙ্গি ছেলেমেয়েদের নিয়ে আয়ারা ঘুরছে। দু-তিনটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে পাশের গলি থেকে বেরিয়ে এল। নিত্য জোরে জোরে হাঁটতে থাকে। রেস্তোরাঁর ঠিক সামনেই একটা লোক দাঁড়িয়ে, কাছে আসবার আগেই মনে হল, তার দিকে তাকিয়ে সে হাসছে। কী

ভয়ানক লম্বা দেখাচ্ছে হাশেমকে !

সাদা মার্বেলের টেবিলে দু-কাপ চা নিয়ে বসে দুজনে।

নিত্যই প্রথমে কথা বললে দাঁতে দাঁতে চেপে, "দাদা ঠিক বলে, এদেশের কিচ্ছু হবে না। এখানে যদি কেউ মানুষের ভালোর জন্যে কথা বলে তাহলে তার মুখের ওপর সবাই দরজা দেবে। বড়লোকদের কথায় এদেশের সাধারণ লোক ড্রেনের ময়লা চাটবে। দাঙ্গা করবে না কেন, যদি দরকার হয় নিজেদের মা-কে খুন করবে !"

"কেন মাথা গরম করছিস," হাশেম শান্তস্বরে জবাব দিল।

"কেন করবো না, আমি তো তোর মত কাঠের পুতুল নই, কেন করবো না ?"

"তার ফলে যাদের তুই ঘেন্না করিস, তারাই জিতবে"—হাশেম চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলে।

"তারা এমনিও জিতবে, অমনিও জিতবে, অন্তত আমাদের এই দেশে, এই ভারতবর্ষে, এই ভেড়ার দেশে !"

হাশেম কিছু বলে না। রাগে, দুঃখে, হতাশায় অনেকক্ষণ ধরে নিত্য গাল পাড়ার পরেও হাশেম চুপ করে থাকে।

"কিছু বলছিস না যে ?"

"কী বলব, তুই বড্ড চটে আছিস !"

নিত্য হাশেমের কথায় এবার হেসে ফেলল। বলে, "আচ্ছা, এইবার তুই বল, আমি চুপ করলাম।"

"আজ কত তারিখ রে ইংরেজির ?"

"বাইশ।" উত্তর দিয়েই নিত্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

কথা ছিল নিত্য এ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে হাশেমের সঙ্গে তার দেশ পূর্ববঙ্গের জেলায় জেলায় ঘুরবে, ঢাকায় সেণ্টার করে। বরিশালের স্টিমারের ডেকে বসে, চাঁটগাঁয়ে লাল পাথুরে মাটিতে মাইলের পর মাইল হেঁটে, খালে নৌকোয় করে, বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে গিয়ে বাংলা দেশ দেখবে।

হাশেমের চা শেষ হয়ে যায়। কাপটা সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে বলে, "মাত্র দিন পনের আগেই সেই ময়দানের মিটিংটা। ভাবতে কী আশ্চর্য লাগে !"

"আশ্চর্য মানে, আমার তো…" নিত্যকে বাধা দিয়ে হাশেম বললে, "আমার কিন্তু এখনও চোখের সামনে ভাসছে সে মিটিং, আর সেই কথাটার কী জোর, "তামাম হিন্দুস্থানকো হিলা দেঙ্গে।"

হাশেম চুপ করে থাকে। ছোট ফিরিঙ্গি পাড়ার রেস্তোরা। পাশের দোকান থেকে গ্রামোফোনে বিলিতি নাচের বাজনা বাজছিল।

হাশেম বললে, "জনসাধারণকে গাল দিয়ে কী লাভ? তাদের তো আমরা বুঝি না। বুঝলে কি আর পনের দিনের মধ্যে এত বড় কাণ্ড হয়ে যায়!"

"বুঝেই বা কী করতে পারতাম?"

"চেষ্টা করতাম।"

"কী ফল হত তাতে?"

"ফল? ফল নিশ্চয়ই কিছুটা হত! তবে হাতে নাতে কোনও ফল হয়তো হত না।

"তা হলে আর লাভ কি?"

"লাভ? তা বলতে পারি না। কি জানিস নিত্য, হয়তো আমাদের সারা জীবনই চেষ্টা করে যেতে হবে। হয়তো আমরা বেঁচে থাকতে কোনও ফল দেখে যেতে পারব না। মানুষকে ভালবাসা অত চাট্টি-খানি কথা?"

দোকান তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, সাধারণত যে সময় বন্ধ হয়, তার অনেক আগে। মাত্র সাতটা, কিন্তু দুই বন্ধু যখন রাস্তায় এসে দাঁড়াল তখন রাস্তা বেশ নির্জন। গাড়ি চলাচলও কমে এসেছে।

"তোর কথাটা হয়তো ঠিক হাশু" রাস্তায় নেমে নিত্য বললে। "কিন্তু তুই যে রকম ঠাণ্ডা মাথায় কথাগুলো বলছিস, শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি থাকব না, চেষ্টা করে করে শুকিয়ে শুকিয়ে রাস্তার কুকুরের মত মরে যাব, আর সান্ত্বনা থাকবে, আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজের মানুষগুলো সুখী হবে। ভাবতে রক্ত জল হয়ে যায়!" হাশেম বললে, "তবু ভাবতে তো হবে। যদি বাঁচতেই হয়, তবে বাঁচার জন্যে চেষ্টা করতে হবে না? এ কষ্ট আমারও হয়।"

কথা ছিল, দুজনেই ফিরিঙ্গি পাড়ার ভেতর দিয়ে চৌরঙ্গীর দিকে চলে যাবে তারপর যে যার দিকে রওনা হবে। কিন্তু হাশেম আর নিত্য রাস্তা পার হয়ে চৌরঙ্গীর দিকে কিছুদূর এগুতেই, একজন পুলিস সার্জেন্ট এগিয়ে এসে জানাল, ও জায়গায় দুপুর বেলায় একটা গোলমাল হয়ে গিয়েছে, তারা যেন ঘুরে যায়। গ্যাসের নীল আলোতেও দেখা যায় রাস্তার এক অংশ ইঁটের টুকরোয় লাল হয়ে আছে।

হাশেম আশ্চর্য হল। এখানেও এক মিশ্র বসতি আছে, তা আগে জানা ছিল না। একটু বিচলিত দেখাল তাকে। সামনে পেছনে চৌরঙ্গীর দিকে যাবার মুখে দু-তিনটে মুসলমান পট্টি। তার নিজের পরনে পা-জামা এবং নিত্যর পরনে প্যাণ্ট। কিন্তু যদি চ্যালেঞ্জ করে?

নিত্যকে কিন্তু হাশেম বলে না সে কথা। নিত্যর দাদা সত্যগোপালের খবরের কাগজের জীবনে কোনও এক দিনের বিশেষ ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে করতে তারা এগোল। ডান দিকের প্রথম গলিটা পার হয়েই হাশেম বাঁ দিকে রাস্তা নেয়। তার ইচ্ছে, সোজা খানিকদূর গিয়ে আবার সে ডান দিকে ফিরে চৌরঙ্গীর দিকে পড়বে। এ রাস্তাটা মুসলিম নয়, সেটা তার দৃঢ় ধারণা। বেশির ভাগই বড় সাহেবের বাড়ি আর যে সব হিন্দুরা থাকেন, তাঁরাও খুব সাহেব, অতএব খুব বিপদ নেই।

এতক্ষণ ধরে দুজনের মধ্যে যে রকম স্বচ্ছভাবে আলাপ চলছিল, এখন তা যেন ক্রমশ আটকে যায়। কেমন একটা অস্বস্তির ভাব দুজনেরই মুখে চোখে ফুটে ওঠে। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই তার ওপর গ্যাসের আলোয় আরো নির্জন লাগে চারদিক। পাশের বাগান থেকে চাঁপার গন্ধ ভেসে আসে। নিত্য হঠাৎ মাঝরাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে হাশেমের হাত চেপে ধরে বললে, "হাশু, এবারে আমি চলে যেতে পারব, তুই ফিরে যা।"

"ঘাবড়াচ্ছিস কেন? সামনের ডান দিকে এবারে যে গলিটা পডবে, সেটা দিয়ে বেরিয়ে যাব আমরা" হাশেম জবাব দিল।

কিন্তু সামনে আর ডান দিকে গলি পড়ছে না। মস্ত বড বাড়িগুলো ফটক বন্ধ করে দিয়ে এই সন্ধ্যে রাতেই যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা দুটো বাড়িতে দোতলার কোনও কোনও ঘরে আলো জ্বলছে, তাও রাস্তার দিকে জানালা বন্ধ থাকায়, অত্যন্ত আবছা আবছা বোঝা যায়।

এবারে ডান দিকে সত্যিই গলি পডল। নিত্য নিশ্বাস ছেড়ে বলে, "বাব্বা: !" কিন্তু গলির মোড়েই যেন কারা দাঁড়িয়ে আছে? নিত্য বললে, "দাঁড়া।"

দু-তিনটে ছোকরা একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে, আর তার পাশে একটা খোলা জীপ। কতগুলো কম বয়সী ছেলে খুব গাদাগাদি করে বসে আছে তার ওপর।

নিত্য বলল, "চল পেছনে ফিরি।"

এমন সময় জীপের আলো জ্বলে উঠল। আর আলোটা পডল ঠিক নিত্য আর হাশেমের ওপর।

"কে? কে যায়?" জীপের থেকে আওয়াজ আসে।

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে নিত্য। "আমি" একটু ইতস্তত করে জবাব দেয়।

"আমি শালা কে? হিন্দু না লেড়ে?" কর্কশ গলা বেজে ওঠে। "হিন্দু।"

আধ মিনিট একটা থমথমে নিস্তব্ধতা। তারপর জীপ থেকে মাতালের মত একটা গলা ভেসে আসে, "হিন্দু শালা পা-জামা কবে থেকে পরে র‍্যা?"

এক মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা নিত্যর কাছে। এতক্ষণ যে ঘোর মাথার মধ্যে ছিল, তা যেন পাতলা হয়ে আসছে। কেমন চেনা চেনা মনে হচ্ছে ছেলেগুলোকে। এক ঝলকে নিত্যর মনে পড়ে গেল, প্রতিরোধ পার্টি নামে তাদের পাড়ায় এক ব্যারিস্টার কিছু ভাড়াটে লোক নিয়ে যে পার্টি করেছেন, তাদের একটা অ্যাডভান্স ইউনিট হতে পারে। গত কাল স্টেনগান যোগাড় করবার জন্যে এদের একটা ঘরোয়া গুপ্ত মিটিং তাদের বাড়ির কাছে হয়ে গেছে।

এক ঝটকায় মাথা ঝাঁকিয়ে বিমূঢ় হাশেমকে একটা ধাক্কা দিয়ে নিত্য প্রায় চিৎকার করে উঠল, "রান হাশু, রান।" হাশেম প্রথমে কি করবে বুঝে উঠতে পারে নি। বোধ হয় নিজের অজ্ঞান্তেই নিত্যর হাত ধরে সে পেছন থেকে টান দিতে লাগল। ওদিকে গাড়ির স্টার্ট দেওয়া হয়ে গেছে। মুহূর্তে বিপদের গুরুত্বটা নিত্যকে যেন স্তব্ধ করে দিল।

"তোর পায়ে পড়ছি, হাশু, দৌড়ো" হাঁফাতে হাঁফাতে নিত্য বলে গাড়ির দিকে চোখ রেখে।

জীপখানা গিয়ার চেঞ্জ করে প্রায় শূন্যে লাফ দিয়ে নিত্যর পায়ের কাছে এসে ব্রেক কষল। কাঁধ যথাসম্ভব হেলিয়ে একবার পেছনের দিকে তাকায় নিত্য। প্রায় কুড়ি হাত দূরে গিয়ে হাশেম দাঁড়িয়ে পড়েছে আর এদিকেই তাকিয়ে আছে। জীপ থেকে অশ্রাব্য খিস্তি আর আস্ফালন নিত্যর কানে আসে।

নিত্য ভাবছিল,দাঙ্গার সময় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়ে যারা পার পেয়েছে তাদের কথা। সে রকম কী করা যায়, ভাবতে চেষ্টা করে। এক কথায় মনটা একটু হালকা করে মুখখানায় হাসি-হাসি সহজ ভাব আনা যে বিশেষ প্রয়োজন সেটা সে অনুভব করে। কিন্তু সমস্ত মুখখানা তার সাদা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল, আর কোনও কিছুই সে ভাবতে পারছিল না। শুধু জীপের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নিত্য। ড্রাইভারের পাশে যে দুটো লোক বসেছিল, তাদের মধ্যে একজন বেশ শান্ত গলায় বললে, "দুটিই নেড়ে মনে হচ্ছে।"

একজন লাফ দিয়ে নামল গাড়ি থেকে। এমন সময় নিত্যর গলা পেয়ে থেমে যায়। নিত্য বেশ তীক্ষ্ণভাবে জিজ্ঞেস করে, "আপনারা বোস সাহেবেব লোক না? আমি দীপেনের মাসতুতো ভাই, দীপেন আছে ওখানে?"

"বাঃ শালা!"—জীপ থেকে আবার ভেসে এল সেই পূর্বোক্ত মাতালের গলা। দীপেন, যে সম্প্রতি প্রতিরোধ বাহিনীতে যোগ দিয়েছে, সে সেখানে ছিল কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু নিত্যর কথাটায় যেন ফল হয়। যে লোকটা নামছিল, সে

হাতড়ে জীপের কাবার্ড থেকে একটা টর্চ বের করে নেমে এল। লম্বা লম্বা পা ফেলে সামনে এসে নিত্যর মুখের ওপর আলো ফেলে সে, তারপর বলে, "চেনা চেনা ঠেকছে যাদু! কোথায় থাকা হয় চাঁদের?"

"ফার্ণ রোডে।"

"এত রাত্তিরে?"

"এত আবার রাত্তির কোথায়। মাত্র আটটা বেজেছে।" বিপদের আচমকা ভাবটা কেটে যাওয়ায় অনেকটা প্রকৃতিস্থ লাগছিল নিত্যর গলা। সে বেশ ঝাঁঝিয়ে বলে ওঠে, "দাঙ্গার জন্যে ছেলেপুলে হওয়া বন্ধ থাকবে না কি? এখানে এক নার্সিং হোমে এসেছিলাম, ডাক্তারকে খবর দিতে।"

এর পর পুরো এক মিনিট নিস্তব্ধতা।

"আর তোমার সেঙাত?"

"আমার সেঙাত?" এক মুহূর্তেই সেই ফ্যাকাশে ভাবটা ফিরে এল নিত্যর মুখে। কি ভাবে কথাটা ঘোরাবে, যতই প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করল ততই আড়ষ্ট হয়ে আসে তার গলার কাছটা।

"শালা!" পেছন থেকে চাপা গলায় গর্জন এল। সামনের লোকটার সার্ট ধরে সরিয়ে একটা লোক এগিয়ে আসে। বাবরি চুল, গিলে করা পাঞ্জাবী, হাড়গিলে চেহারা, কিন্তু চওড়া শক্ত কাঠামো, চোখের মণি ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। "শালা। নেড়ের ফ্রেণ্ডও নেড়ে।" মুহূর্তে নিত্যর তলপেটে প্রচণ্ড লাথি পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে যায়। মারাত্মক একটা মোচড়ান ব্যথা পাক খেয়ে খেয়ে আচ্ছন্ন করে দিল চেতনা। জ্ঞান হারাবার ঠিক আগেই নিত্যর কানে এল, "ছেড়ে দে শালাকে।"

বোধহয় পাঁচ মিনিট। তারপর পেটে হাত দিয়ে উঠে বসল নিত্য। মাথাটা ঝাঁকিয়ে উঠবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তলপেটের পেশীগুলোর ওপর কে যেন হাতুরী পিটছে। কোনও লোকজন নেই। জীপটার কোনও চিহ্ন নেই কোথাও। ঝকঝকে মসৃণ রাস্তার ওপর গ্যাসের আলো। হাওয়া দিচ্ছে একটু একটু।

নিত্য উঠে দাঁড়াল। ব্যথাটা একটু কম মনে হচ্ছে। কেউ নেই কোথাও। সোজা খানিকদূর গিয়ে আস্তে আস্তে ডাকে "হাশু! হাশু!" একটা অজানা আশঙ্কায় নিজের কাছে নিজের গলা অবিশ্বাস্য রকমের অচেনা মনে হচ্ছিল। পাশের হলুদ রঙের গেটওলা বাড়িগুলোর একখানা তেতলা ঘর থেকে বেহালা বাজছে বিলিতি সুরে। গেটের পাশে দীর্ঘ মানুষের মত কাঠচাঁপার গাছ। ফুলের গন্ধ আসছে হাওয়ায়। নিত্য দাঁড়াল। খুব জোরে জোরে কয়েকবার নিশ্বাস নিল। দু-দিকে ফটক দেওয়া

গলিটা অনেকখানি পার হওয়ার পর বড় রাস্তার মোড় যতই কাছে এগিয়ে আসছিল, ততই যেন একটা সোয়াস্তি ফিরে আসছিল নিত্যর মনে। এবার মনে হল, হাশেম ফিরে যেতে পেরেছে।

মোড়টার কিছু আগেই অন্ধকার। গ্যাসের আলোটা কারা ভেঙে দিয়েছে। সামনের বড় রাস্তায় কিছুক্ষণ আগেও যেখানে আলো জ্বলছিল, সে জায়গাও অন্ধকার। ল্যাম্পপোস্টের ঠিক নীচেই সাদা সাদা কি দেখা গেল। গোরু বোধহয়। নিত্য অন্য ফুট দিয়ে এগোচ্ছিল। কি ভেবে একবার তাকায় পাশ ফিরে। গোরু না, মানুষ—তার হাশেম। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে লাইট পোস্টের ঠিক নীচেই। আর্ধেক শরীর ফুটপাথে, আর্ধেক রাস্তায়। অনেকখানি দৌড়েছিল নিশ্চয়। তবে মনে হয়, জীপের সঙ্গে পারে নি। নিত্য এসে তাকে চিত করে দেবার সময় জ্ঞান ছিল। চশমার কাচ ভেঙ্গে গেছে। খালি ফ্রেমের ভিতর থেকে ঘোলাটে চোখ মেলে একবার দেখল নিত্যর দিকে। তারপর আস্তে আস্তে ঘুমোবার আগে লোকে যে ভাবে বলে, সেই ভাবে বললে, "একটা গাড়ি ডাক।"

নিত্য দৌড় দিল। পেটে যেন কোনও ব্যথাই মনে হয় না এবার। দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে বড় রাস্তার মাঝখানে গিয়ে সে দাঁড়াল, তারপর মাতালের মত গলায় চিৎকার করতে থাকে "ট্যাকসি! ট্যাকসি!"

শ্বেত করবী

দশ

"নিত্য, ইউ আর ফানি। কী বললি, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্থাপন। বাব্বাঃ, এত বড় বড় কথাও বাংলায় বেরিয়েছে। তা তুই যদি সত্যিই সেই সম্বন্ধ স্থাপন করতে চাস তবে—চায়ের পার্টি দে না, বন্ধুবান্ধবদের খাওয়া, একটা বেশ সলিড লোকের একটি মাত্র মেয়ে—"

ওপাশ থেকে কোন সাড়া আসে না, সত্যগোপালের গলার স্বর হঠাৎ বদলে যায়। মনে হয় যেন সে আর একটা লোক। লম্বা লম্বা চুলের ভেতর হাত বুলোতে বুলোতে কি ভাবেন তারপর আস্তে আস্তে বলেন, "নিত্য,আই হ্যাভ নো ফ্রেণ্ড, অবশ্য তার যে খুব দরকার মনে করি তা নয়। অথচ যখন জীবন প্রথম শুরু করি তখন অন্যরকম মনে হত। মনে হত ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এগুলোই যেন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের মূল কথা। এর জন্যে কি কম ঠকতে হয়েছে? কম কথা শুনতে হয়েছে! আসলে এগুলো একেবারে একস্‌ট্রা, অতিরিক্ত, হলেও চলে না হলেও চলে। কী দরকার হয়ে!"

সত্যগোপালের গলা এবার একটু চড়ে যায়। রাগলেও যে গুজারামকে এমন আস্তে আস্তে ডাকতে পারে তার গলাটা বেমানান ভাবে কেঁপে ওঠে কথা বলতে গিয়ে, "আমি কিছুতেই বুঝতাম না মার ব্যাপারটা। বাবা যখন আমাদের সবাইকে পথে বসিয়ে দিয়ে হরিবোল হরিবোল করে কাশী গিয়ে উঠলেন তখন মাকে জিজ্ঞেস করেছি, তোমার রাগ হয় না, মা! মা হেসেছেন। তারপর যখন হার্টের অসুখ, এক পা যেতে বুকে থচ করে লাগে, তখন পাড়ার কোন ছেলেদের কি ব্যাপারে চারতলা সিঁড়ি ডিঙিয়ে এক পাহাড় আলু কুটেছেন। মাকে বলতাম, 'তুমি কি তোমার নিজের স্বার্থটা কোনদিনও বুঝবে না! আমাকে না হয় রাত জেগে হাত-পাখা করো। সেটা বুঝি। শেষ বয়সে আমি তো তোমায় দেখব। কিন্তু তুমি কেন পাশের বাড়ির চাকরের ছেঁড়া গেঞ্জী সেলাই করতে বসবে?' মা কোনদিন তর্ক করেন নি। ঠিক তেমনি একভাবে হাসতেন।"

সত্যগোপাল একটু নড়ে চড়ে বসে বললেন, "সামনে হাসির বিয়ে। বোধহয় আজ রাত্তিরে একটু সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে পড়েছি। সেটা কি মাস ছিল, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, ঠিক মনে নেই। খুব হাওয়া। বাথরুম থেকে মা বেরোচ্ছেন না, অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করার পর জানালা টপকে ভেতরে গিয়ে দেখি কলতলায় শুয়ে মা

ঘুমোচ্ছেন। মুখে তেমনি হাসি। আর আঁচলটা হাওয়ায় একবার এদিক আর একবার ওদিক করছে।"

"সেই মার কাছ থেকে শিখে আমার কী ভুলই না হয়েছে। খালি ঠকতে লাগলাম। কোন একসট্রার কোন দাম নেই। আর দরকার মানুষের জন্য কিছু করা, না—সেটা বোধহয় আগেকার দিনে কিছু ছিল। এখন দরকার মানুষের জন্যে কিছু করার ভান করা, বিজ্ঞাপন দেওয়া। আর সে আর্টে যে যত পাকা সে তত important member of the society। হয়তো খুব মজা লাগবে শুনে, পরশু দিন ঠিক এ ধরনের একটা ব্যাপার হয়েছে। স্মিথ তো জানিস আমার বহুদিনের বন্ধু লোক। সম্প্রতি ওদের ব্যাঙ্কে কিছু এসিস্ট্যান্ট অফিসার নেবে। কারণ যা অবস্থা তাতে শুনছি সাউথ-ইস্ট-এসিয়ায় ওদের ব্যবসাই গুটোতে হচ্ছে অনেক জায়গায়। তা একটা ছেলে,—বাঙালী—তাকে নেওয়া হয়েছে, এসেছিল বড়সাহেবের কাছ থেকে তালিম নিতে। স্মিথ বললে, "দেখ রায়, সব সময় যে আমরা কত ঘণ্টা অপিসের কাজে দিচ্ছি এটা ঠিক আমাদের কাজের মাপকাঠি না, এই তো আমাদের বড়বাবু আছে, আমরা চলে যাবার পরও আলো জ্বালিয়ে কাজ করে, তাই বলে তো আর—আসলে কি জানো, তুমি যে আছো, এটা সবাইকে তোমার কথাবার্তায় চালচলনে জানিয়ে দিতে হবে।"

সত্যগোপালের কথা এবার একটা মাঝামাঝি পর্দায় বয়ে চলে। বেশ শান্ত অথচ দৃঢ়, কিছুটা দূর থেকে ভেসে আসা আওয়াজের মত লাগে তার গলা। বলেন, "তোর ঐ বন্ধুর ব্যাপারটা। হাশেম তো মরল! কী করতে পারলি শেষ পর্যন্ত? মাঝ থেকে হাশেমের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও তো মরতে বসেছিলি। মরলেই বা কি এসে যেত কিছুই হত না। এই দেশজোড়া ক্ষ্যাপামি আর অন্যায়, এর সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে লাভ কি? আরও যখন বয়স হবে, তখন হয়তো বুঝতে পারবি। একটা ভালো কাজ করার নামে আমরা খালি মন্দ করতেই পারি।"

সত্যগোপাল অন্যমনস্কভাবে পাইপ ধরান। বোধ হয় কি ভাবছিলেন, চুপচাপ খানিকক্ষণ ধোঁয়া ছাড়েন তারপর অন্ধকারে সামনের আয়নাটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলেন, "নাঃ, great man-রা আমায় disturb করে না। আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে আমার মা-কে। তুই দেখিস নি নিত্য, শ্যামবাজারে আমাদের মাসীমাদের পুরনো বাড়ি। আমরা আসতেই ঠাকুর ছাড়িয়ে দেওয়া হল আর কি fantastic রান্নাঘর, মাত্র তিন হাত লম্বা, দাঁড়াতে গেলেই মাথায় সিঁড়ি লাগে। যখন রাঁধতে রাঁধতে কোমর ধরে যেত মার তখন জানালার শিক ধরে

হাঁপাতেন। একবার খুব বিশ্রী একটা ব্যাপার হয়েছে, যা হয়ে থাকে পারিবারিক গণ্ডগোল, একেবারে কথা বন্ধ। মা কিন্তু সকলের সঙ্গে যেচে কথা কইতেন, আর বারবার অপমানিত হতেন। Great man-দের আমি বুঝতে পারি, তারা যতখানি দেয় তার চেয়ে অনেকখানি পাবে আশা করে, এক-একজন ঝানু বিজনেসম্যান তারা। কিন্তু যে লোকটা মারা যাবার শেষ দিন পর্যন্ত কোন কিছু না চেয়ে মানুষকে এমন সৌজন্য দেখিয়ে গেল—তার মত আশ্চর্য ব্যাপার আমার চোখে আর কিছু পড়ে নি।"

অসহিষ্ণুভাবে উঠে দাঁড়ান সত্যগোপাল। অন্ধকারে ঘরময় পায়চারি করতে করতে বলেন "একটা কথা বড্ড মিথ্যে বলা হচ্ছে, বড্ড মিথ্যে, মানে শুনতে ভালো কিন্তু সার নেই তার মধ্যে। আর কি করেই বা থাকবে। নিত্য, আমি জানি তুমি চেয়ার ছেড়ে উঠবে। কিন্তু নেহাত উত্তেজিত হয়ে লাভ কি। আমি আগেও বলেছি এখনও বলব ঐ যে যা লোকে এত চেঁচিয়ে বলছে যে সমাজটা খালি দু-ভাগে ভাগ হয়েছে গরীব আর বড়লোকে, স্রেফ মিথ্যে কথা। আসলে সমাজটা ভাগ হয়েছে ধূর্ত আর বোকা লোকের মধ্যে। তুমি দেখাও, একটা ডিপার্টমেণ্টের একটা বড়-সাহেব আর একটা শাঁসালো পলিটিক্সের পাণ্ডা, এদের ভেতরে কোথায় কি প্রভেদ আছে দেখাও। দুজনেই, কেউ আপিসের নামে, কেউ দেশের নামে অন্যের পিঠে পা দিয়ে উঠবার ফন্দী আঁটছে। আর এটা একেবারে সার্বজনীন।"

"ওঃ! আজ ভয়ানক কথা বলছি। রাত কটা? গুজারাম! গুজারাম! গুজারাম জ্যোৎস্না কি তরকারি কুটছে? হাসি কোথায়! বিশ্বেসবাড়ি? এমন অস্বস্তি হয় মাঝে মাঝে, এমন বিশ্রী লাগে। যদি তুমি ভদ্র হও, বিনয়ী হও, অন্যের সঙ্গে সব সময় ভালো ব্যবহার করতে চাও, তাহলেই দেখবে লোকে তোমায় বোকা বলছে। তোমাকে তোমার চাপরাশী বেয়ারা থেকে বৌ পর্যন্ত কেউ মানবে না। আর যদি তুমি অভদ্র হতে পারো, একটা কথা শুনে সাত কথা শোনাতে পারো, তাহলে তুমি হবে একটা সেরা মানুষ।"

"কাল আসবে আমাদের বাড়ি রায়বাহাদুর দীনেশ মুখার্জী, রিটায়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেট। কী চোয়াড়ে অভদ্র লোক! এসেই আরম্ভ করবেন তাঁর ছেলে সোমেশের কথা, যে বার্ডে চাকরি পেয়েছে। বাবার বন্ধুর মধ্যে বলতে গেলে ভদ্রলোক একমাত্র সুধাংশুবাবু, কিন্তু একদম পাত্তা পান না কোথাও।"

"বড্ড বোরিং লাগছে না? রাত কি নটা বেজেছে, তা হোক, গুজারাম! দো কাপ বড়িয়া 'টি' বানাও! Not that I care for company। কিন্তু অভ্যেস

একটা আছে তো। তোরা সবাই দূরে দূরে চলে যাবি। আর আমি বুড়ো হব একলা একলা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। না ঠিক একলা না। তবে সে তো থেকেও নেই! বড় জোর একটা ভেজা মাদুর। বড্ড খারাপ কথা সব মনে আসছে। মা মাঝরাত্তিরে উঠে গান গাইতেন। আর জ্যোৎস্না! গুজাবাম—জলদি। বেশ হাওয়া দিচ্ছে না? চমৎকার চা হয়েছে। আঃ! কিসের গন্ধ রে?"

"নাগকেশর দাদা, রাস্তার ধারের গাছটা!"

"বাঃ কী চমৎকার নাম রে!"

৫ই বৈশাখ হাসির বিয়ে ঠিক হয়েছিল।

হোগলা বাঁধা শুরু হয়ে গেল ৪ঠার সকাল থেকেই। তখনও খাদ্যনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন হয় নি। কালিঘাটের সেরা ভিয়েন জগন্নাথঠাকুর তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে উনুন তৈরির জন্যে তাল তাল মাটি ছাদের এক কোণে জড়ো করে ফেলল। ওরিয়েণ্টাল আর্ট ডেকোরেশনের ঘিয়ে ঘিয়ে পাঞ্জাবী পরা এক হাড়গিলে ভদ্রলোক পেতলের ওপর নীল মিনা করা চোঙামুখো দুটো ফুলদানি সবার সামনে নাচিয়ে নাচিয়ে বলেন, "কোনও বাজে মাল পাবেন না স্যার আমাদের দোকানে।"

কোথা থেকে সত্যগোপালের এক পিসিমা বিয়ের তিন দিন আগে থেকে বাড়ির সমস্ত ঘরগুলো তাঁর ছেলেপিলে নিয়ে গুলজার করে তোলেন। পিসিমার ছোটছেলে চোদ্দ-পনের বছরের রতন বিয়ের ট্রে থেকে দুটো হেজলিন স্নো, এক কোটো পাউডার আর মাথায় মাখার এক ধরনের লোশন নিজের সুটকেশে স্রেফ চালান দিয়ে পাড়ার কেবিনে বসে স্কুলফেরতা মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে টিপ্পনী কাটতে আরম্ভ করে। কোথা থেকে গ্রামসম্পর্কের এক আত্মীয় পোটনমামা না নোটনমামা উঠোনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বিয়ের ব্যাপারে চিংড়িমাছের মালাইকারি যে এক অভিন্ন বস্তু, তাই প্রমাণ করবার জন্যে বাড়ি সরগরম করে তোলেন।

পিসিমা তিন-চার বার করে তাঁর ছেলেমেয়েদের চা দিতে আরম্ভ করেছেন। রতনের বড় বোন পনের-ষোল বছরের বিনু (ভালো নাম চন্দ্রলেখা) সাবান দিয়ে রগড়ে রগড়ে চান করে মুখের চামড়া প্রায় তুলে ফেলে ইণ্ডিয়ান সিল্ক পরবে, না নীল জর্জেটের সঙ্গে হালকা নীল ব্লাউজ ম্যাচ করে পরবে, তা ভাবতে শুরু করেছে। পাড়ার চারপাশ থেকে ভবি-দি, সদানন্দবাবুর ভাইঝি, অনন্ত সরকারের বৌ রিকাশের দিদিমা ইত্যাদি সকলেই এসে পড়ায় বাড়িখানা সত্যি বিয়ে-বাড়ি বলে মনে হচ্ছিল।

বিকেল হতেই "পিয়া পিয়া বোলো বোলো" নামে যে হিন্দি রেকর্ডটা কলকাতার বাজার ছেয়ে গিয়েছিল, এবং প্রায়ই রেডিওতে শ্রোতাদের তৃপ্ত করার জন্যে বাজানো হত সেটাই সানাই-এর সুরে পাড়া মাতিয়ে তোলে। আর ঠিক সন্ধ্যের পর ছাদের আলসের কাছে তৃতীয়ার এক ফালি ধারালো চাঁদের পাশে তিন-চারটে তারা জ্বল জ্বল করে জ্বলতে শুরু করলে হাসি ছাদে উঠে আসে। ছাদের তিনদিকেই হোগলা বাঁধা। বাকি অংশটায় লম্বা লম্বা বাঁশ পড়ে আছে, পা রাখার জায়গা নেই। এক রাত্তিরের জন্যে সে কতখানি দরকারি লোক হয়ে পড়েছে, তা ভেবে বেশ মজ লাগে হাসির। পিসিমা তো রোজ সকাল সন্ধ্যে তার ঘরে চা নিয়ে আসছেন। আর পিসির সেই চ্যাঙচেঙে মেয়েটা চন্দ্রলেখা ঠিক দুপুর তিনটের সময় পা টিপে টিপে আধঘুমন্ত হাসির পাশে এসে বসেছিল। তারপর টেবিল থেকে একখানা চয়নিকা তুলে নিয়ে হাসিকে প্রতিবাদ করার কোনও সুযোগ না দিয়েই খাটের এক কোণে বসে পড়ে কী রকম হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে ওঠা অস্বাভাবিক গলায় আবৃত্তি করেছিল "বহুদিন হল কোন্ ফাল্গুনে ছিনু আমি তব ভরসায়…।" বিয়ের আগের রাত্তিরে হাসির মেজাজ হালকা মেঘের মতই সমস্ত বিয়ে-বাড়ির ঝঞ্ঝাটের অনেক ওপরে ভেসে বেড়িয়েছে।

হলুদ কাপড দিয়ে বাঁধা ফুটপাথে যে চেয়ারের সারি দেওয়া হয়েছে, তার প্রথমটায় রতনের বন্ধুরা আর পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েরা। রতন সিগারেট দেয় আর গেরুয়া রঙের সিলকের ওপর বুটকি তোলা একখানা শাড়ি জড়িয়ে বেলফুলের মালা দিতে ব্যস্ত থাকে চন্দ্রলেখা। বনেদী বিশ্বাসদের বাড়ি থেকে এসেছেন যাঁরা, তাঁরা প্রায় সকলেই গা-দেখা যায় এমন সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী, কালোপেড়ে কাঁচি ধুতি, কেউ কেউ সাদা বাকস্কিনের জুতো পরে বসে আছেন। দেখে মনে হয় এই ভাবে ফিটফাট হয়ে বিয়ের আসরে এসে এসে চুল পেকে যাবে, তবু এই দুর্জয় গরমে তাঁদের গাম্ভীর্য মাটি হবে না। তিন-চারটে গাড়ি ভর্তি করে তাঁদের মেয়ে-বৌরা আসেন। বেশির ভাগ মহিলাই বেঁটে, মোটা আর ফরসা। যাঁদের অপেক্ষাকৃত বেশি বয়স, তাঁদের পরনে ফরাসডাঙার শাড়ি, হাতে পানের বাক্স, কিংবা উপহার দেবার জন্যে জার্মান সিলভারের ফুলদানি, পাউডারের কোটো, কমদামী চকচকে জরিবসানো মাদ্রাজী শাড়ি ইত্যাদি। গেটের আলোয় তাদের কারো কারো নাকের হীরের ফুল ঝিকমিক করে ওঠে। কমবয়সী বৌদের প্রায় সকলেরই পরনে জ্যাবড়া জ্যাবড়া ফুলের কাজ করা বেনারসি কিংবা টিস্যু শাড়ি। কানের পাশ দিয়ে কারো ব্রাইডল কিংবা সাদা গোলা রঙ গড়িয়ে পড়ছে। উগ্র সেন্টের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে মাথা গোঁজ করে এক প্রকাণ্ড লটবহরের মত তাঁরা বাড়ির ভেতর অদৃশ্য হলেন।

বিশ্বাসরা যেখানে বসেছেন, তাঁদের বাঁ দিকের তিন-চারখানা চেয়ারের পরই দীনেশ মুখার্জী। সত্যগোপালের বাবার বন্ধু দীনেশ মুখার্জী রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট জজ। তাঁর পাশেই জয়গোপাল সেন। তিনিও বড় সরকারি পদে ছিলেন। দীনেশবাবুর বেশ রোগাটে ছিমছাম চেহারা, মাথায় সযত্নে ব্রাশ করা পাকা চুল। বুড়োদের ঘোলাটে দৃষ্টির বদলে চোখে এখনও কমবয়সী তীক্ষ্ণতা বজায় আছে। বেশ বোঝা যায়, চাকরির সময় তিনি পুরোপুরি সাহেব ছিলেন। জয়গোপালের চেহারা গোলগাল, মাথায় টাক, খুব মোটা লোমশ ভুরু কপাল জুড়ে আছে। আজীবন ইংরেজ সেবা করে এখন রিটায়ার করার পর ঘোরতর ইংরেজ বিরোধী এবং সবচেয়ে বড় কথা তিনি একজন প্রচণ্ড রকমের ধার্মিক। সম্প্রতি টালিগঞ্জের সাতাশ বছরের অমিয়া-মার শিষ্য। তাঁর পাশেই গভর্নমেণ্ট কণ্ট্রাক্টর সদানন্দবাবু দৈর্ঘ্য প্রস্থে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ, গরমে হাঁসফাঁস করছেন আর নীল বর্ডারের একখানা ক্যালিকো রুমাল দিয়ে বারবার ঘাড় মুছছেন।

সত্যগোপালকে কাছে আসতে দেখে জয়গোপাল বলে ওঠেন, "প্রথমে ব্যাচেই ওঁদের বসিয়ে দাও সত্য। ড্রাইভারটাকে আবার সকাল সকাল ছেড়ে দিতে হবে তো।" কিছুক্ষণ পর দীনেশ মুখার্জীর দিকে তাকিয়ে বলেন, "কী করছে আজকাল সোমু?"

"বার্ডে আছে।"

জয়গোপাল প্রকাশ্যভাবেই চমকে ওঠেন। তারপর সামলে নেন নিজেকে। মনে মনে তারিফ না করে পারেন না, দীনেশবাবুর কর্মতৎপরতা। সত্যিই দীনেশবাবু ঘুঘু লোক। নইলে সোমেশের মত একটা গোমুখ্যু ছেলেকে এত তাড়াতাড়ি দিলেন বার্ডে ঢুকিয়ে। হাসি-হাসি মুখখানা আরও বিস্তারিত করে ফেলেন জয়গোপাল। ঘাড় নামিয়ে রহস্যজনকভাবে দীনেশবাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, "স্যার বি. এন?"

চাপা অসন্তোষের রেখা দীনেশবাবুর কপালে ফুটে ওঠে। তবু সংযত স্বরেই বলেন, "না, স্যার বীরেনের সাথে আলাপ আছে বটে, তবে উনি তো সোমুকে ঢুকিয়ে দেন নি। সোমু নিজের চেষ্টায় ঢুকেছে। টেনিস খেলে, ভালো ইংরেজি বলতে পারে, সাহেবরা ওই চায়। বি-এ, এম-এ পাশ-করা কটা ছেলে দেখি সোমুর মত ইংরেজি বলতে পারে?"

জয়গোপাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। সাহেবগুলো সব চলে গেল। তবু যদি তাঁর ছেলেটা সে সময় একটু বড় থাকত!

চন্দ্রলেখা এই সময় আরও দু-তিনটি কমবয়সী মেয়ে নিয়ে তাঁদের দিকে আসে। তার হাতে একটা ছোট ট্রে, তার ওপর দু-গেলাস সরবত। পেছনের একটি মেয়ের চুল

সাবান দিয়ে এত বেশি ফাঁপানো যে, তার ছোট্ট শরীরের তুলনায় বড্ড বেমানান দেখাচ্ছিল। দীনেশবাবুর কাছে এসে ট্রেখানা একটু নামিয়ে, মাথা হেলিয়ে চন্দ্রলেখা বলে, "কোল্ড ড্রিঙ্ক, আপনাকে একটু কোল্ড ড্রিঙ্ক দেব?" দীনেশবাবু হাত তুলে মাথা নাড়ালেন।

সদানন্দবাবু উশখুশ করছিলেন, তাঁর প্রিয় বিষয়বস্তুটি উত্থাপন করার জন্যে। সম্প্রতি মানভূমে একটা কোলিয়ারি কেনার পর, তিনি হঠাৎ বেশি রকম বাঙালি হয়ে পড়েছেন। কিন্তু হঠাৎ দীনেশবাবুর পাশেই যে ভদ্রলোকটি ঘাড় নীচু করে বসেছিলেন, তার দিকে সকলের নজর পড়ে। "এই যে, সুধাংশুবাবু, আপনি যে কথাই বলছেন না।" বেশ জমিদারি ঢঙে আহ্বান করেন দীনেশবাবু।

সুধাংশুবাবু মাথা তোলেন। অনেকক্ষণ ধরেই গাড়ি, বাড়ি, ছেলের চাকরির গল্প শুনেও তিনি খুব চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁর নিজের বাড়ি নেই, গাড়ি নেই, ফোন নেই, এমন কি রেডিও পর্যন্ত নেই। ছোট মেয়ে খুশির একটা সেতার ছিল, তাও বছর দুয়েক হল বাজানো ছেড়ে দেওয়ায় মরচে পড়ে গেছে। তাই বেশ কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন তিনি দীনেশবাবুর আহ্বানে। সত্যগোপাল ঠিক এমনি সময় এসে পড়ায় তিনি বেঁচে যান। দীনেশবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে হেসে বলেন, "আজ বোধহয় সাড়ে আটটার মধ্যেই ছাড়া পাওয়া যাবে। ড্রাইভারটাকে একটু সকাল সকালই বাড়ি পাঠিয়ে দেব।" সদানন্দবাবু কিছু বলবেন মনে করে এসেছিলেন, যেমন রাজেন্দ্রপ্রসাদের বেহারীপনা, নেতাজী বেঁচে আছেন কি নেই। কিন্তু কিছু বলবার সুযোগ না পাওয়ায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে হেলতে-দুলতে তিনিও ভেতরে ঢোকেন।

সুবোধকে বর-বেশে বেশ চমৎকার মানিয়েছিল। গরদের পাঞ্জাবী আর তার সাহেবী মুখের ওপর চন্দনের ফোঁটা পরে আবীর-রঙের মখমলের তাকিয়ার ওপর এমন আলগোছে বসেছিল সে, যে অনেকেই ঘুরে ঘুরে তার দিকে তাকিয়ে দেখে। কিছুটা দূরে বসে অমিয়, সাচু আর বুড়ো—তবে বরযাত্রীদের মধ্যে বেশির ভাগ তার আপিসের আর পাড়ার বন্ধু।

তাদের মধ্যে ফর্সা পানা নান্টুবাবু—যিনি বরযাত্রী বেশেও পাইপ ছেড়ে আসতে পারেন নি, একটা টিনের কৌটো থেকে তামাক বার করে পাইপে ঢোকাতে ঢোকাতে বলেন, "বোস ইজ এ পারফেক্ট ফুল।" বোস মানে পাশের বেঁটে মত লোকটি। তিনি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "আমি ফুল নই নান্টু, ওরকম মেয়েছেলেদের মত বাজি ধরি না!"

'মাই ডিয়ার বোস, তাহলেও তুমি একটা প্রকাণ্ড ফুল। বলে দিলাম, সিওর টিপ 'রেড পনি' আর উনি ধরলেন কিনা···সাধে অমিতা তালুকদারের সঙ্গে—" কথাটা শেষ না করে খিকখিক শব্দে হাসতে থাকেন নান্টুবাবু।

অমিতা তালুকদারের নাম উল্লিখিত হওয়ায়, চারদিকে একটা চাপা হাসির আওয়াজ ওঠে। এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। বোস গম্ভীরভাবে বলেন, "অমিতা আমার স্টেনো। কোম্পানী রাখতে গেলে, মেয়ে স্টেনো বাবা রাখতেই হবে। আর আমার না হয় দিশি আর নান্টুবাবুর তো মিসেস ডিউকের সঙ্গে ফারপোতে লাঞ্চ না খেলে ঘুমই হয় না শুনি!"

এতক্ষণে দীনেশবাবুর ছেলে সোমেশ কথা বলে ওঠে—"কে এই তালুকদার হে? ইজ সি এনি গুড?"

"বেশ মাদার টাইপ। আমার ও টাইপটাই ভালো লাগে। তার ওপরে আবার রেফুজী, বরিশালে বাড়ি"—বোস জবাব দেয়।

সোমেশ খোঁচায়, "আপনার আপিসের মুখার্জী, সে তো অনেক কথাই বলে বেড়াচ্ছে। বলছে, আপনি নাকি প্রোপোজ করেছেন।"

"আশ্চর্য! মুখার্জী বলেছে নাকি?"

"কেন, সত্যি কথা বলে ফেলেছে বোধ হয়?"

"সত্যি কথা!" বোস কথাটা বলে চুপ করে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর নিজের মনেই বলেন, "তালুকদার বেড়ে মেয়ে। তাকে যে আমার ভালো লাগে না তা নয়। বেশ আতুরে ভাব। তবে ভালবাসা ফাসা নয়। আমার তো আর মাথা খারাপ হয় নি যে, প্রোপোজ করে বসব। ওসব হয় তোমাদের বয়সে।"

ওদিকে মেয়েদের ঘরে ভবি-দি আসর জমিয়ে বসেছেন। তিনি তাঁর নতুন পুত্রবধূর কথা নিয়ে গল্প করছিলেন মিসেস মুখার্জীর সঙ্গে। ভবি-দি বললেন, "কাল সন্ধ্যে থেকে রেবার মাথা ধরে আছে। নইলে ও যে নাছোড়বান্দা, ঠিক আসত। আর নিজের বৌ বলে বলছি না ভাই, এমন মিষ্টি স্বভাব—মনেই হয় না এত পড়াশোনা করেছে। সেদিন সকালে দেখি একটা গোটা মোচা নিয়ে বসেছে। আমি ভয়ে মরি, এখনই বুঝি প্যাঁত করে গোটা আঙুলটাই কেটে ফেলে! তারপর দেখি একটি একটি করে খোসা ছাড়িয়ে সমস্ত মোচাটা কুটলে। রেবা আমার পেটের বেবির মত। রেবা বলে, লোরেটোতে পড়েছি বলেই কি মা রান্না করতে জানব না?"

মেয়েরা যে ঘরে বসেছিল, আলোয়, সাজসজ্জায়, হঠাৎ চেঁচিয়ে-ওঠা কথাবার্তায় সে ঘরখানা আর সামনের বারান্দা সরগরম হয়েছিল। চন্দ্রলেখা আর তার বন্ধুরা

সরবত বিতরণ শেষ করে আধুনিক সংগীতের আসর জমিয়ে বসেছে। পাশের ঘরখানায় জিনিসপত্র। দুখানা হালকা নীচু হাল-ফ্যাসনের খাটের কোনায় ভাঁজ খোলা অবস্থায় থাকে থাকে শাড়ি সাজানো। একদিকে ট্রেতে এসেন্স, পাউডার, পিয়ার্স সোপ, রুমালের পেটি, রুপোলি ফুলদানি, হরেক রকমের পাউডারের কৌটো, এক কথায় সেই সমস্ত জিনিস, যা বিয়ের তিন মাস পরেও বিয়ের আবহাওয়াটা বজায় রাখে এবং শেষ পর্যন্ত যার বেশির ভাগই আত্মীয়স্বজনের গর্ভে যায়। একপাশে অনেকগুলি বই,—প্রায় সবগুলিই রবীন্দ্রনাথের। ওপরের বইখানা মহুয়া।

মেয়েদের ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায় নিত্য। 'দ্বারিকের দই' খাবেন, না 'জলযোগের দই' খাবেন, একটু চিংড়ি মাছ দি, আর দুটো সন্দেশ—এই করে বেশ নটা পর্যন্ত কাটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখন তার মাজা ব্যথা করতে শুরু করেছে। পিঠের সমস্তটা ঘামে জবজব করছে। নিত্য সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে চৌবাচ্চার পাশে খোলা খিড়কির দরজার কাছে দাঁড়ায়। একপাশে স্তূপ করা এঁটো কলাপাতা, গুচ্ছের খুরি আর মাটির গেলাস। দরজাটা দিয়ে ঝিরঝির করে হাওয়া আসছিল। হঠাৎ পাশের চৌবাচ্চা থেকে হড়াৎ করে এক বালতি জল এসে নিত্যর পায়ের গোড়ালি ভিজিয়ে দেয়।

বছর বিশেকের একটি মেয়ে চৌবাচ্চা থেকে বালতি ডুবিয়ে মুখ ধুচ্ছিল। মেয়েটির পরনে গাঢ় সবুজ রঙের সিল্কের শাড়ি, রঙ না মাখলেও মুখে-ঘাড়ে পাউডারের ছাপ স্পষ্ট। মেয়েটি মুখ ধুয়েই পাশের ছড়ানো জুতাগুলো থেকে মাথা নীচু করে একজোড়া স্লিপার টেনে তার ভেতর পা চালাতে চেষ্টা করে। ঘাড় ফেরাতেই তার চশমাটা আলোয় ঝিকিয়ে ওঠে। নিত্য পাশ দিয়ে বাইরের বারান্দায় চলে যাচ্ছিল। এমন সময় পেছন থেকে অস্ফুট গলার আওয়াজ কানে এল "ও মা, নিত্যদা না?"

নিত্য ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। সত্যি ফিরে দেখার মত মুখ নয়। জৌলুস বিশেষ নেই। তবে মুখের ছিরি একটু আলাদা। গালের দু-পাশ হঠাৎ বাঁক নেওয়ার ফলে বেশ সুন্দর একখানি টোল পড়েছে থুতনিতে। আর চোখের তেজ হাই পাওয়ার চশমার ভেতর থেকেও জানান দিচ্ছে। পুরুষ মানুষের মত কাঁধ, একটা গাঢ় ব্লাউস, হাতার বর্ডারে সোনালী সুতোর কাজ, টাইট ব্লাউসের আড়ালে মেয়েটির বিস্তৃত কাঁধের রেখায় বেশ আত্মবিশ্বাসের ছাপ রয়েছে।

নিত্যকে দেখে মনে হয়, একটু ঘাবড়ে গেছে। চেষ্টা করে হাসছে, বোঝা যায়। মেয়েটি সাহায্য করে। এগিয়ে এসে বলে, "ওমা এত সহজেই ভুলে গেলেন?"

আলোটা এতক্ষণ মেয়েটির মুখে না পড়ে তার পিঠের ওপর খেলা করছিল। এবার

সম্পূর্ণভাবে মুখখানা আলোকিত হওয়ায় নিত্যর গলার আওয়াজ আসে, "ও খুশি, আমি ভাবলাম—"

"আপনি ভাবলেন, কে না কে, না?"—মেয়েটি প্রকাশ্যেই ব্যঙ্গ করলে। ছেলেদের মত চোখ মুখ কুঁচকে হেসে বলে, "আর ভাবলেই বা দোষ কি বলুন? বিয়ের বাজার, আর পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের করিডর, এ ছাড়া বাঙালি ছেলেমেয়েদের কোথায় মেলামেশার জায়গা আছে বলুন?"

নিত্যর অসোয়াস্তি লাগে। খুশিকে সে দেখেছে প্রায় বছর সাত-আট আগে—যখন সে ফ্রক পরত, আর নিত্য যেত তার ভাই অমলের সঙ্গে তাদের বাড়ি ব্যাডমিণ্টন খেলতে। সেই মেয়ে আর এ মেয়ের ভেতরের ব্যবধান যে এক নিমিষেই কাটিয়ে ফেলা যায় না, নিত্যর বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠ তার প্রমাণ দিল, "তোমাকে ভয়ানক বড় দেখাচ্ছে খুশি!"

খুশির চোখের বিদ্রূপ চশমার ভেতর থেকেও ধরা পড়ে। হেসে বলে, "যাক, আপনি তা হলে আগের মতই বোকা আছেন! আমি ভাবলাম, এতদিন পর যখন দেখা হচ্ছে, তখন অন্তত একটু চালাক হবার চেষ্টা করবেন।"

নিত্য চুপ করে যায়। তার মুখের ভাব দেখে মনে হয়, সে এবার বিরক্ত হয়েছে। মেয়েদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে যারা কায়দা করে ল্যাং মেরে কথা বলতে পারে, তারা যত খুশি উপন্যাসের নায়ক হোক না কেন নিত্যর প্রকৃতি তাতে সায় দেয় না। খুশির কথায় তাই সে একটু টেনে টেনে হাসে।

খুশি কথাটা সামলে নেয়। এতক্ষণ পর তার গলায় আন্তরিকতার স্বর ফুটে ওঠে। বলে, "বিরক্ত হচ্ছেন, না, নিত্যদা? ভাবছেন খুশিটা বাঁদর হয়ে গেছে, এইতো? কী করব বলুন? এভাবে পাউডার মেখে গোঁজ হয়ে হাঁসফাঁস করে কতক্ষণ কাটানো যায়? তবু যদি চন্দ্রলেখার মত ছেলেদের সামনে গিয়ে 'কোল্ড ড্রিঙ্ক' 'কোল্ড ড্রিঙ্ক' করে চেঁচাতে পারতুম। আচ্ছা চলি নিত্যদা, বাবা অপেক্ষা করছেন।"

"তোমরা কি সেই পুরনো সার্কুলার রোডের বাড়িতেই আছ?"

"না কালিঘাটে আছি।"

"অমল কোথায়?"

"দাদা? দাদা কানপুরে আছে, হুকুমচাঁদ করমচাঁদ মিলের সুপারভাইজার।"

"ও:," আরও কথা বলবার চেষ্টা করে নিত্য, কিন্তু খুঁজে পায় না। মনে হয় আর একটু কথা বললে মন্দ হত না। খুশি দু-তিন পা এগিয়ে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, "যাবেন একদিন আমাদের ওখানে। দাদা না থাকলে কি যেতে নেই?"

"আচ্ছা যাব"—নিত্য এবার বেশ উৎসাহের সঙ্গে মাথা নাড়ায়।

মেয়েটির গলায় আবার বিদ্রূপের স্বর বেজে ওঠে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, "যাবেন বলছেন, কিন্তু বই-টই বিক্রি করতে যাবেন না যেন!"

"বই বিক্রি করতে?" নিত্য অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে।

"হ্যাঁ," মেয়েটি মাথা ঝাঁকাল। "শুনলাম আপনি কি সব পার্টি-ফার্টি করছেন। আমাদের ওখানে গেলে কিন্তু খালি হাতে যাবেন, নইলে যাবেন না।" মেয়েটি তার কথার জবাব দেবার সুযোগ না দিয়েই অন্তর্ধান হয়ে যায়।

রাত্তির বারোটা পর্যন্ত কলকাতার বিয়ে-বাড়িতে যে সমস্ত ব্যাপার হয়ে থাকে তা সমস্তই হল সত্যগোপালের বাড়িতে। পান চিবোতে চিবোতে সস্ত্রীক দীনেশবাবু আর বিশ্বাসবাবুরা "সুন্দর বর হয়েছে, চমৎকার দেখতে হয়েছে বাবাজী" বলতে বলতে গাড়িতে উঠলেন। সুবোধের কয়েকজন বন্ধু আস্তিন গুটিয়ে পিঁড়ি ঘুরোবার জন্যে পাঁয়তারা কষছিল। কিন্তু হাসি হেঁটে হেঁটেই সাত পাক ঘুরল। প্রত্যেক জায়গায় যেমন হয়ে থাকে, এখানেও ঠিক তেমনিই চপ ফ্রাই শেষ ব্যাচে কমে যাওয়ায়, ছোট ছেলেমেয়েরা চেঁচামেচি লাগিয়ে দিল। "আমাকে দই-এর মাথাটা দিও বাবা"—কোনও প্রৌঢ় বয়সী মাস্টার মশাই চেঁচিয়ে বললেন। তারপর কলাপাতাগুলো ফুটপাথের উলটো দিকে ফেলতেই চার-পাঁচটা কুকুর তাদের গলার শক্তি পরীক্ষা করতে লেগে গেল।

খাটে শুয়ে হাসির ভীষণ গরম লাগে। অনেক কষ্ট করেও পিসিমা, বিশ্বাসবাড়ির উমা আর পাড়ার কতগুলো কমবয়সী মেয়ে-বৌ প্রায় আধঘণ্টা আড়ি পেতে আর মশার কামড় খেয়ে খালি একটা কথাই উদ্ধার করতে পারল হাসির মুখ থেকে, "বড্ড গরম লাগছে, ফ্যানটা খুলে দাও তো।" চন্দ্রলেখা অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিল, এবার বুঝি সুবোধ আর হাসি চুমু খেতে আরম্ভ করবে। যখন সে রকম হবার কোনও সম্ভাবনাই দেখা গেল না এবং পরিশ্রান্ত সুবোধ পাঞ্জাবীটা খুলে নেহাত খাটের একপাশে গড়িয়ে পড়ল, তখন চন্দ্রলেখাও এক পা এক পা করে সার্বজনীন শোবার হলঘরে এসে দাঁড়ায়। অন্ধকারে ঢালা বিছানায় যেখানে সেখানে পরিশ্রান্ত ছেলে বুড়ো মেয়ে পুঁটলির মত হয়ে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ চন্দ্রলেখার অসহায় নাকী গলা ভেসে আসে, "ওমা বিজুটা বিছানা একেবারে ভাসিয়ে দিয়েছে।" পিসিমা এক ঝটকায় উঠে পড়ে ভিজে কাপড়খানা-সুদ্ধ চার বছরের বিজুকে উলটে দিয়ে চাপা গলায় বলেন, "যত সব শুয়োরের পাল পেটে ধরেছি।" ঘুমন্ত বিয়ে-বাড়িতে পিসিমার সেই স্বগতোক্তিই হল শেষ কলরব।

পরদিন সকালে সব মরা-মরা লাগছিল। দুপুর পর্যন্ত সবার মুখে চোখে ভীষণ ক্লান্তির ছাপ। সত্যগোপাল সারা রাত দু-চোখ এক করতে পারেন নি মশার কামড়ে। খালি হলুদ রঙের ট্যাকসি যখন বেলা তিনটের সময় সুবোধ আর হাসিকে নিয়ে যাবার জন্যে বাড়ির দোরগোড়ায় এলো, তখন পাড়ার মেয়েদের চিৎকারে শাঁখের আওয়াজে খানিকটা জীবনের আওয়াজ উঠল বাড়িটা থেকে। পাশের ছাদ-গুলো থেকে হুমড়ি খেয়ে দেখছিল মেয়েরা। হাসি কেঁদে কেঁদে চোখের পাতাটা বেশ ফুলিয়েছে। যাবার সময় সত্যগোপালের কোমর জড়িয়ে ধরলে সত্যগোপালের চোখদুটো কেমন ছলছল করে ওঠে। ট্যাকসিটা প্রথমে ব্যাক করে, তারপর সোঁ করে বড় রাস্তার দিকে বেরিয়ে যায়। পাড়ার মেয়েরা দরজা থেকে ফিরছিল, এমন সময় হঠাৎ ভবি-দির গলার আওয়াজে সকলে চমকে যায়। "কী রকম টেক্কা দিয়ে গেল হাসিটা দেখেছিস? কেমন লভ করে বিয়ে করলে! এদিকে দেখতেই শুধু ফড়িংবাবু নন, কোম্পানীর সাহেব।"

এগার

নিজের মনকে চোখ ঠেরে কী লাভ! খুশি ব্যাপারটা ভেবে দেখেছে। আর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে হাই তুলে তুলে তার সমস্যার যে কিনারা হবে না, এ বিষয়ে সে একেবারে নিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

তবে কী করবে, সেটাই হল কথা। সোজা একটা রাস্তা আছে। মার মতে মত দিয়ে ছোড়দিকে যে ভাবে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেভাবে বিয়ে করবে, অর্থাৎ কি-না বরের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় যখন তার হাত ধরে পরীক্ষা করে দেখবে, গায়ের রঙটা খাঁটি না আলগা, তখন চুপ করে বেশ স্নিগ্ধ একখানা ভাব মুখে আনতে হবে। আর না হলে মাস্টারি করা, স্টেনোগ্রাফি শেখা, টেলিফোন-গার্ল, নার্স হওয়ার রাস্তায় পা-বাড়ানো। খুশি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ফ্যানের হাওয়ার নীচে মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে নিজের মনেই মাথা নাড়ায়।

খুশির মনটা এদিক থেকে বেশ হিসেবী। তার মনে হয়, চাকরি করতে গেলেও অন্যের পায়ে তেল দিতে হবে। আর অনেকগুলো লোকের পায়ে তেল মাখানোর

চেয়ে একটা স্বামীর পায়ে তেল মাখানো নির্ঝঞ্ঝাট মনে হয় তার কাছে।
কিছু দিন আগে সে 'গোরা' পড়েছিল। পড়বার সময় তার একবার মনে হয়েছিল, সুচরিতা হওয়া যায় না? সেই কোনও এক প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া মানুষের কথা শুনবে, বুক কাঁপবে, চোখের কাছে জল আসবে সন্ধ্যেবেলায় তারার দিকে তাকিয়ে! কিন্তু সেই প্রকাণ্ড মানুষ মানেই তো সে বড় চাকরি-বাকরি করবে না, কোনও বেসরকারি কলেজ কিংবা কোনও খবরের কাগজের আপিসে একটা ছিঁচকে চাকরি নিয়ে দিন গুজরাবে। কলেজের ঘণ্টা কমিয়ে কি ভাবে দুটোর ওপর তিনটে টিউশনি করবে, তাই ভাববে সারা দিন। তারপর আলো কেটে দেওয়া হবে, কনকনে ঠাণ্ডায় বাথরুমের এককোণে কাপড় কাচতে হবে। চার-পাঁচ বছর পর তার স্বামীটি বাজারের থলি হাতে সকালে তার সামনে এসে যখন দাঁড়াবে, তখন তার সঙ্গে খুশির স্বপ্নে দেখা সেই প্রকাণ্ড মানুষটার কোনই সাদৃশ্য থাকবে না।
খুশির মা তার মেয়ের মনের কথাটা টের পেয়ে বলেন, "আমরা তো আর জোর করে তোর বিয়ে দিতে চাই না! তোর মনের মত কাউকে দেখেই বিয়ে কর না।" তারপর মেয়ের একটু সাহিত্য পড়ার ঝোঁক আছে জেনে বোধ হয় বললেন, "না হয় যদি তোর সাহিত্যিক-টাহিত্যিক ভালো লাগে, তবে সরকারি কলেজের কোনও—"
খুশি অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়িয়ে বলে, "মা তুমি বোঝ না, কিচ্ছু বোঝ না।"
"এতে বোঝা না-বোঝার কী আছে? বিয়ে তো একটা করবি, না করবি না?"
খুশি জোর গলায় বলে, "বিয়ে করব না আমি।"
"তাহলে কী করবি? একটা কিছু তো করতে হবে।"
একটা কিছু করতে হবে, এটা সুধাংশুবাবুর বাড়ির ভেতরে বসে খুশি মর্মে মর্মে অনুভব করে। তাকে বসে থাকতে, ধীরে ধীরে নিজের মনের জট খুলে নিজের হৃদয়কে প্রতি মুহূর্তে চিনে নিয়ে এগিয়ে চলার সুযোগ কেউ দেবে না।
সুধাংশুবাবুর অবস্থা দীনেশ মুখার্জীর চেয়ে নেহাত কম না। দুজনেই প্রায় একই ধরনের চাকরি করতেন। তবে দীনেশবাবু সমাজের আরও ওপরের কাঠামোয় ঢুকেছেন, দিল্লী সার্কেলের সঙ্গে ছেলে কিংবা জামাই মারফত সংযুক্ত হয়েছেন। সুধাংশুবাবু অবশ্য নির্ভর করেছিলেন খুব বেশি করে তার বড় ছেলের ওপর, যে বিলেতে ডাক্তারি পড়তে গিয়ে সেখানেই সংসার পেতেছে। দ্বিতীয় ছেলেটিকেও নিয়ে পড়েছিলেন, তাকে পাইলট বানাতে। তবে চার বছর কাটিয়ে সে ছেলেটি এখন বেরিয়ে এসেছে যে প্লেনের লাইসেন্স নিয়ে সে প্লেনটা নাকি বাজারে আজকাল চলে না।

সুধাংশুবাবু যখন কোনও মতেই তাঁর ছেলেমেয়ের এবং বাড়ির আর্থিক সুরাহা করে উঠতে পারছিলেন না ঠিক এমন সময় খুশির দিদির দেওর পিণ্টুবাবু হাজির হলেন। দিন কয়েক দরজা বন্ধ করে ফুসুর-ফুসুর গুজুর-গুজুর কি হল, একদিন খেতে খেতে সুধাংশুবাবু স্ত্রীকে বললেন, "পুরুষের ভাগ্যতে কী না করা যায়? টাকা তো কলকাতার রাস্তাতেই ছড়িয়ে আছে। আমরা সারা জীবনটা নটা-ছটা করে কী বা করতে পারলাম, বড জোর একটা বাড়ি। আর এতদিন বিজনেস করলে—"

খুশি বলে, "বাবা, এতো তোমার নিজের কথা না। নিশ্চয়ই তোমাকে কেউ বুঝিয়ে দিয়েছে! তুমি তো নিজেই এতদিন বলতে 'বিজনেসম্যানরা চোর'।"

"চোর আজকাল কে না, মা? গভর্নমেণ্ট চুরি করছে না? গভর্নমেণ্ট অফিসাররা ঘুষ নিচ্ছে না?"—সুধাংশুবাবুর মত শান্ত প্রকৃতির লোককেও উত্তেজিত দেখায়। সেদিন ঐ পর্যন্তই।

এর কিছু দিন পর একদিন সন্ধ্যেবেলায় পার্কে বেড়িয়ে সুধাংশুবাবু যখন বাড়ি ফেরেন, তখন তাঁকে অসম্ভব উৎফুল্ল দেখায়। স্ত্রীকে হেসে বলেন, "ঐ যে তোমাদের ভবি-দি, উনি যখন এবার আসবেন ওঁর বাড়ি-গাড়ির গল্প করতে, তখন ওঁকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিও তো। বলো, ওরকম চাকুরেদের আমি কিনে বেচতে পারি।"

খুশির মা মেয়ের মতই হিসেবী। তিনি সহজেই উত্তেজিত হন না, আবার স্বামীর উৎসাহের অভাবকে সব সময়ে খোঁচা মেরেও আনন্দ পান। বলেন, "পার্কের ঐ বুড়ো-হাবড়াটা রেস্তার্সের টিকিট গছিয়েছে নাকি?"

সুধাংশুবাবু সেদিকে কান দেন না। উৎসাহের ঝোঁকে বলেন, "সেদিনকার ছেলে পিণ্টু। কী রকম সার্প মাথা!" পিণ্টু মানে ছোড়দির দুর সম্পর্কের দেওর। সুধাংশুবাবুর স্ত্রী বলেন, "কী আর মাথা! সেদিনও তো ইনসিওরেন্সের এজেণ্ট হয়ে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরত। আজ শুনি বিজনেস করছেন।"

সুধাংশুবাবু ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকেন। কি একটা গুপ্ত কথা যেন তাঁর গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠছে; অথচ তিনি বলতে পারছেন না। তাঁর স্ত্রী একটু অবাক হন, চিরদিনই শান্ত, পেট আলগা মানুষটি কোনও গোপন খবরই তো এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে পারেন নি। কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়েই তিনি বলেন, "তোমার শরীর খারাপ হয় নি তো?"

এতক্ষণ ধরে সুধাংশুবাবুর মুখে-চোখে যে চাপা উত্তেজনা জমেছিল, তা এবার ভেঙে পড়ে। সাংসারিক উদ্বেগে সম্প্রতি তাঁর মুখচোখ অনেক বসে গিয়েছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় ছেলের সুপারিশের জন্যে তাঁর নিম্নপবন্থ অনেক অফিসারের ঘরে কার্ড

পাঠিয়ে দিয়েও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার দৈনন্দিন অপমানেও তাঁর আগেকার চেহারা অনেক পালটে গেছে। কিন্তু এখন আনন্দে আর খুশিতে বেশ উঁচু গলায় হেসে ওঠেন তিনি। বলেন, "না, না, শরীর খারাপ হয় নি। এই বুড়ো হাড়েও যে জোর আছে," বলেই চট করে অন্য প্রসঙ্গ পাড়েন, "পিণ্টুর সঙ্গে আমিও বিজনেস করব ভাবছি।"

"তোমার টাকা কোথায়?"—স্ত্রী জিজ্ঞেস করেন।

"কেন আমার পেন্সনের জমানো টাকা? অবশ্য সবটা খরচ করছি না এখন।"

ব্যাপারটা যে গুরুতর হয়ে উঠেছে, এটা খুশি আর তার মা এতক্ষণে টের পান। খুশি উত্তেজিতভাবে বলে, "তুমি বাবা বিজনেসের মারপ্যাচ কিচ্ছু বোঝ না। তোমার এত কষ্টের রোজগারের টাকা, ও নিয়ে তুমি ছিনিমিনি খেলো না বাবা।"

"কী বলছিস খুশি! ছিনিমিনি এর মধ্যে কী আছে? একেবারে প্লেন অ্যাণ্ড সিম্পল এরিথমেটিক! পিণ্টু কি বলে জানিস? পিণ্টু বলে, 'টাকাটা ঠিক জায়গায় ইনভেস্ট হল কিনা, এটাই হল আসল ব্যাপার। ওখানেই বিজনেস-ব্রেন'।"

খুশি অসহিষ্ণু হয়। মাথা নাড়িয়ে বলে, "আমি বিজনেস ব্রেন-ট্রেন বুঝি না বাবা। আমার বড্ড খারাপ লাগছে। তুমি কি পিণ্টুবাবুকে এরই মধ্যে টাকা দিয়ে ফেলেছ?"

খুশির কথায় তার মারও মুখেচোখে উদ্বিগ্ন ভাব ফুটে ওঠে। সুধাংশুবাবু অবাক হন। বিজনেস করতে গেলেই তো টাকা দিতে হবে, এরকম অবশ্য-কর্তব্য ব্যাপারটা তাঁর স্ত্রী-কন্যা কেন বুঝে উঠতে পারছে না, এটা ভেবে তাঁকে বেশ ক্ষুব্ধ দেখায়। প্রথমে একটু আমতা-আমতা করে, তারপর জোর গলায় বলেন, "টাকা তো আর জলে দিই নি। এতে এত ভাবনা-চিন্তার কী আছে?"

"কত দিলে?" শান্ত নিস্পৃহ গলায় স্ত্রী জিজ্ঞেস করেন।

সুধাংশুবাবু এবার গরম হয়ে যান। তিনি যেন একটা মস্ত দোষ করেছেন, আর তার জন্যে যেন তাঁকে জেরা করা হচ্ছে, এ ভাবটা তাঁর কাছে অসহ্য ঠেকে। চেঁচিয়ে উঠে বলেন, "আমি সব কিছু ভেবেই এ-কাজে হাত দিয়েছি। ভেবো না আমি অত কাঁচা ছেলে।"

খুশির মার মুখচোখ দেখে মনে হল, তিনি সন্দেহের দোলায় দুলছেন। স্বামীর টাকা আর তাঁর সরল মনের সুযোগ নিয়ে একটি সুবিধাবাদী ছোকরা নিজের রাস্তা পরিষ্কার করছে এটা তাঁর প্রথমেই মনে হয়েছিল। তারপর তাঁর মনে হয়, বিজনেসের ব্যাপারই হয়তো এরকম। কাঁচা টাকা তো অনেকেই করেছে আজকাল এভাবে!

লাভের অঙ্কটা সুধাংশুবাবু যা বললেন তা ভেবে তাঁর চোখজোড়া সহসা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

খুশি কিন্তু বাধা দিল প্রচণ্ডভাবে। সুধাংশুবাবু বললেন, "আচ্ছা, কাগজ কলম নিয়ে আয়,কষে দেখাচ্ছি।"

মেয়ে কাগজ কলম নিয়ে এলে সুধাংশুবাবু তাতে আঁচড় কাটতে কাটতে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেন, "আচ্ছা এটা তো ঠিক। ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের এখন হস্পিট্যালের জন্যে অনেক লোহার খাট দরকার।" খুশি না বুঝে ঘাড নাড়ায়। সুধাংশুবাবু বলে চলেন, "হাসপাতালের খাটের জন্যে একেবারে হন্যে হয়ে গিয়েছে গভর্নমেণ্ট, আর সেই খাট এডেনে এসে জাহাজে আটকে আছে। পিণ্টু যার সঙ্গে বিজনেস করে সেই মহাবীর প্রসাদ এমন লস খেয়েছে যে, আজ-কালের মধ্যেই চল্লিশ হাজার টাকার খাট ছাড়ছে দশ হাজারে। ভেবে দেখ খুশি, লাভটা,—আটশো খাটের ওপর মাথা পিছু একশো টাকা, তাহলে হয় আশি হাজার। পিণ্টু অর্ধেক। আমি অর্ধেক, একেবারে প্লেন এরিথমেটিক।"

খুশি ভাবে, এ কি বাবার নেহাত লোভ? সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ায়। লোভ হতে যাবে কেন? বাবা তো লোভী নন। খুশির মনে হয় তার ছেলেবেলার কথা। তখন তারা মুন্সীগঞ্জে। একদিন তাদের ঘাটে মস্ত সাজানো গ্রিনবোট এসে লাগল। বোট ভর্তি ভীম নাগের সন্দেশ, ফারপোর কেক, আরো রকমারি জিনিস। সেগুলো একে একে ভারীদের মাথা থেকে জমা হতে লাগল তাদের এক কামরায়। প্রায় ছাদ ঠেকেছে এত খাবারের স্তূপ, আজো সে ভোলে নি। বাবা ছিলেন না। ফিরে এসে চাকরকে দিয়ে সমস্ত খাবার খালের জলে ফেলে দিলেন। তখন বুঝতে পারে নি। পরে শুনেছিল খুশি, এক শাঁসালো আসামীর আর এক শাঁসালো আত্মীয়ের তরফ থেকে এসেছিল সে উপহার। সুধাংশুবাবু মাথা ঠাণ্ডা না করে কিছু করেছেন জ্ঞান হবার পর থেকে খুশি তা দেখে নি।

খুশির বরং মনে হল যখন এরকম একটা সুযোগ হঠাৎ হাজির হয়েছে তখন তাকে হেলায় হারিয়ে কি লাভ? আর বাবা তো বিজনেস করতে যাচ্ছেন না। এ-টাকাটা পাওয়ার পর আর কিছু না করলেই হল। এক এক করে তার মনে হয়। কতবার পই পই করে সে বলেছে দু-এক পয়সা বাঁচিয়ে কি লাভ, তবু বাবা মাঝ দুপুরে কাঠফাটা রোদে চৌরঙ্গী থেকে ডালহাউসি স্কোয়ার ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে যাবেনই। আর গেঞ্জি কেনার ব্যাপারে তো রীতিমত মারামারি। আবার হঠাৎ মনে হয় যদি সমস্ত ব্যাপারটাই মিথ্যে হয়!

আর মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞেস করে, "টাকাটা কি সব দিয়ে দিয়েছ ?"

সুধাংশুবাবু যেন এই প্রশ্নটার অপেক্ষাতেই ছিলেন। বললেন "স-অব দিয়ে দিয়েছি।"

"রিসিট টিসিট—"

সুধাংশুবাবু হেসে বললেন, "না তাও নিই নি। শুনে হয়তো আশ্চর্য হচ্ছিস।"

খুশি বললে, "একেবারে মুখের কথায় তোমার এত রক্ত-জল-করা টাকাগুলো এভাবে দিয়ে দিলে ?"

"জলে তো দিই নি। আর বিজনেস করতে নেমে অবিশ্বাস করলে চলবে কেন ? পিণ্টুকে আমি যে ছেলেবেলা থেকে জানি। আমায় ঠকালে তারও তো বাজারে বদনাম রটবে।"

সে সাতটা দিন এমন একটা আশঙ্কা চেপে বসে খুশিদের বাড়ির ওপর যে, কেউ কারো সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারে না। শুধু খুশির ভাই তার মাকে একবার বলেছিল, "বাবা টাকাটা পেলেই কিন্তু আমি বিলেত যাব। এদেশে থাকলে কিছু হবে না।" তারপর হাত খরচের জন্যে পাওয়া টাকা থেকে এক প্যাকেট ক্যামেল সিগারেট কিনে বন্ধুবান্ধবদের মহলে তার ভাগ্য যে অস্বাভাবিকভাবে খুলে যেতে পারে, তার আভাস দিতে চলে গেল সে।

খুশি কলেজে বসে অসোয়াস্তি বোধ করে। তুটো ক্লাস না করে সাত দিনের দিন সকাল সকাল বাড়ি ফিরে আসে। সন্ধ্যে হয়, তারপর রাত্রিও হয়ে গেল। মা আর মেয়ে প্রত্যেকটা পায়ের শব্দে চমকে ওঠে। কখনও গাড়ির শব্দ হলে ভাবে, সুধাংশুবাবু হয়তো ট্যাকসি হাঁকিয়ে ফিরছেন।

রাত্তির প্রায় এগারোটা করে ফিরলেন সুধাংশুবাবু। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হতেই মা-মেয়ে ছুটে যায়। মুখচোখ বসে গেছে সুধাংশুবাবুর। চোখের নীচে চামড়ার ফুলো আরও প্রকট। নিজেকে সামলে নিতে গিয়ে তিনি যেভাবে হাসলেন, তাতে খুশির কাছে ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে যায়। সুধাংশুবাবু চেয়ার বসে পড়ে বলেন, "পিণ্টু কলকাতায় নেই।"

বার

সেবার শরৎকালটা কলকাতায় এমন জাঁকিয়ে এল যে, রোজ সকালে এক পশলার মত ঝিরঝিরে বৃষ্টি হবার পরই আকাশের দিকে তাকালে চোখ ফেরানো বেশ কষ্ট হত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘ বিরাট নীল সমুদ্রে গা ভাসিয়ে চলেছে।

খুশির মনে কিন্তু এই বিরাট শান্তির ছিটে ফোঁটাও পড়ল না। তার বয়সে যে-সব হয়, অন্তত লেখকরা যে-সব জিনিস লিখতে ভালবাসেন, তার সবই হাজিরা দেয়। বিছানায় চাঁদের আলো পড়লে গা শির শির করে, স্নান করতে গিয়ে নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে নিজেকে ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু এ সমস্ত ঘটনাই ছোট হয়ে যায় একটা বিরাট ঘটনার কাছে—তাকে বিয়ে করতে হবে, ইচ্ছে না থাকলেও। তবে খুশির খালি ভয়, শেষে ছোড়দির মত না হয়ে যায়!

সে দিনই সন্ধ্যের পরই হাতমুখ ধুয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দি দোতলায় উঠে প্রায় ভেঙে পড়েন। বলেন, "কালকেও হরিয়া সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। আর যাবি যা, খাবারগুলো উনুনের ওপর চাপা দিয়ে যা। তা না সব ঠাণ্ডা জল হয়ে আছে।"

খুশির মা ইজিচেয়ারে রানী ভিক্টোরিয়ার মত বসে থাকেন। অসহায় এই বড় মেয়েটির সাংসারিক গণ্ডগোলে তিনি যেমন বিরক্ত হন, তেমনই মনে মনে যে আনন্দও না পান তা নয়। বলেন, "তোর বাড়িতে তো আরও লোকজন আছে! কেন লক্ষ্ কি এখনও এতটুকু খুকি আছে?" লক্ষ্ মানে লক্ষ্মী, ছোড়দিব স্বামী অনিলের ভাই-ঝি, একবাড়িতে থাকে।

"লক্ষ্মীর কথা? কী যে বলো! লক্ষ্মী দেখতেই অমনি। একেবারে মিটমিটে ডান। আবাব মন পাবার জন্যে আপিস থেকে এলেই তার মাথা টিপে দেওয়া হয়।" উত্তেজিত হয়ে গেলেই গলা চড়ে গিয়ে ছোডদির অবস্থাটা আরও অসহায় হয়ে পড়ে। খুশির মা বলেন, "তুই তখন কী করিস? তখন হরিয়ার পিছনে টিকটিক করে রান্নাঘরে না ঘুরে তুইও স্বামীর মাথাটা টিপে দিতে পারিস। আমার মেয়ে হয়ে…"

ছোড়দি বলেন, "আমার মেয়ে, আমার মেয়ে করো না। জানো না তো কী তিরিক্ষি মেজাজ! সেদিন বুবুর মাথার জল ভালো করে মুছি নি বলে…"

কাঁদবার আগে, ছোড়দির গালের ফর্সা রঙ সিঁদুরে হয়ে যায়। ইনফ্লুয়েঞ্জা হলে মুখচোখ যেমন থমথমে হয়, ঠিক তেমনিই দেখায় ছোড়দিকে। মা বলেন "কেন,

অনিল আবার বকাবকি করলে না কি ?"

"বকাবকি ? এর চেয়ে যদি হাত দিয়ে দু-ঘা মারত—"

"তুই যে আমার মত মায়ের মেয়ে হয়ে এমনি হলি ! অনিলটা বদরাগী। কিন্তু কই পরশু সে এসেছিল, সেদিন তো আমার সঙ্গে কত কথা বললে ! বললে, বিজনেস ভাল যাচ্ছে, দিল্লী যাচ্ছে সামনের মাসে, আর এই পালপ দিয়ে পুতুল তৈরি করে কী হবে, কেউ কেনে না আজকাল, ইত্যাদি অনেক কথা।"

ছোড়দি বলেন, "অন্যের সঙ্গে ওরকম দহরম-মহরম সবাই করে। আজ দুপুরে খেতে বসেছি, হরিয়া সকালে লক্ষ্মীকে দুধ দিয়েছিল, তাই ভাতপাতে আর দেয় নি। শাশুড়ি ঘরে হবিষ্য রাঁধছিলেন। শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, 'লক্ষ্মকে আমি রনোর কাছে নিয়ে যাব, ভাবছি। পড়ার চাপ পড়েছে, তার ওপর দু-বেলা গান শিখছে। একফোঁটা দুধ পাচ্ছে না মেয়েটা।' শুনে তো সে লাফিয়ে উঠল। চেঁচামেচি করে এমন যা-তা বলতে লাগল। আমি ঠিক বলছি মা, অন্য কোনও মেয়ে হলে এতদিনে সুইসাইড করত।"

আজ বারো বছর বিয়ে হয়েছে ছোড়দির। আর বিয়ের তিন বছর পর থেকেই সুইসাইডের স্বপ্ন দেখে আসছে সে, মা তাই খুব বিচলিত হন না মনে হয়। জিজ্ঞেস করেন, "লক্ষ্মী আবার গান শিখছে কবে থেকে ?" ছোড়দি কাঁদবার সময় ফঁং ফঁং করে সর্দি ঝাড়ার মত শব্দ করেন। নাক ঝেড়ে একটু সুস্থ হয়ে ভারী গলায় বলেন, "সে তো প্রায় তিন মাস হল শিখছে। আর গানের কী ছিরি রে ? আমরা যে গান করি নি, এমনও তো নয়। ময়মনসিং-এ থাকতে মিসেস ব্যানার্জী আমাকে আর চন্দনাদিকে কী আদর করতেন গানের জন্যে। মনে আছে মা ?"

খুশির শোবার ঘরে ঢুকতে বাঁ দিকে যে ফটো আছে, তাতে বাইশ বছর আগে ময়মনসিং আনন্দমোহন গার্লস স্কুলের কয়েকটি মেয়ে দুই সারিতে দাঁড়িয়ে। মাঝখানে কোনও গভর্নরের স্ত্রী ও হেডমিস্ট্রেস। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলভর্তি মাথায়, ফ্রক পরে ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির শেষ ধাপে একটি মেয়ে—ছোড়দি। আর তার পাশেই অত্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে একটা লম্বাপানা মেয়ে এস্রাজখানা সোজা পুতুলের মত ধরে দাঁড়িয়ে, ছোড়দির বন্ধু চন্দনাদি। খুশি আজও কোনও মিল খুঁজে পায় নি এই ছোড়দি আর সেই ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে উনিশশো চব্বিশ সালের ফটোতে দেখা মেয়েটির সঙ্গে। ছোড়দি আবার শুরু করেন "সেদিনকার বিজি বাঁদর, আর গান গায় মা এমন বিচ্ছিরি, যে কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে করে।"

"ওদের এখন বয়স কম—"

"বয়স কম বলেই, 'কাছে এস প্রিয়, হাতখানি রাখো হাতে, জ্যোছনা চামেলি নয়ন মেলি'—এসব করতে হবে!"

মা শান্ত গলায় বলেন, "তুই সব ব্যাপারেই চটে যাস। ঐ জন্যেই অনিল তোকে দেখতে পারে না। নইলে অনিল তো আর খুব বদরাগী নয়। মা-মাগীটাই খেয়েছে ওকে। পড়ত যদি আমাদের হাতে!" তারপর অন্য প্রসঙ্গে বললেন, "ঐ যে অজিত ছোঁড়াটা! বিয়ে করেই মার সঙ্গে আলাদা হয়ে অন্য বাসা বানাল! অমন মাকে ঝাঁটা মেরে বৌকে মাথায় নিয়ে নাচাও যেমন শোভা পায় না, তেমনি আবার বৌ ফেলে সারা জীবন মার কোলে মুখ বুজে বসে থাকা, এও ভালো দেখায় না বাপু। তা হলে বিয়ে করলি কেন! সব জিনিসেরই একটা সামঞ্জস্য আছে।" এতক্ষণ যে ভাবে কথা চলছিল তার পূর্ণচ্ছেদ পড়ে। খুশির মা এপাশ ওপাশ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, "ছেলেমেয়েদের দিয়ে আর সুখ নেই। সব হাড় জালিয়ে খায়। সব তোর বাবার দোষ! ছেলে মেয়ে বলতে অজ্ঞান। আমি হলে কবে খুশির বিয়ে দিয়ে দিতাম।" ছোড়দি এতক্ষণে একটা কথা পেয়েছেন মনে হল, বললেন, "কী যে বুদ্ধি তোমাদের! খুশিকে আবার এম-এ পড়াতে গেলে। অবশ্য বি-এ পর্যন্ত পড়া যেতে পারে। আমরাও তো এমন ফেলনা নই। আশুতোষ থেকে বি-এ-টাও তো দিয়েছিলাম। এসব আজকালকার ছেলেদের যতই দেখছি মা, ততই ঘেন্না ধরে যাচ্ছে। আমাদের সময়ে সেই যে স্কটিশে একসাথে আমরা আই-এ দিলাম, বিনতা বলে সেই মেয়েটা! তার সঙ্গে কী যেন এক ছেলে ছিল, এখন ছাই নামও ভুলে গেছি। কয়েক বছর ধরে কত ঢলাঢলি! তারপর কলেজ থেকে না বেরিয়েই একটা বড় গোছের চাকরি নিয়ে ছেলেটা একেবারে হাওয়া!"

মা বলেন, "খুশির রঙও যা হয়েছে—ঠিক পোড়া কাঠ। দিনরাত টই টই করে ঘুরছে। আজ স্টিমার পার্টি, কাল দিলীপ বলে মেডিক্যালে পড়ে সেই ছেলেটা —তার সঙ্গে সিনেমা!"

"আচ্ছা দিলীপের বাবা খুব বড়লোক না?"

"তাতে তোর কি?

"বাঃ বলই না—আমি তো আর কাউকে বলতে যাব না।"

মা অসহিষ্ণুভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন, "কী হবে শুনে?"

"আরে বলই না মা, আমি কি তোমার পর?"

মা জবাব দেন, "দিলীপের বাবা অ্যাটর্নি, কলকাতায় দু-তিনখানা বাড়ি আছে,

দেওঘর না মধুপুরে কয়েক বছর আগে বাড়ি কিনেছে।" হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ছোড়দি বলে ওঠেন, "খুশিটা বড় বোকা, দিলীপকে বিয়ে করলেই পারে।" মা বলেন, "তুই বড্ড সরল রে ; বড্ড ভালো মানুষ। সেই জন্যে অনিল তোকে অমন করে বলে। স্বামী হাজার বারো-শো কামালেও, মনের মত একটা তাঁতের শাড়ি কিনতে পারিস না কি সাধে! আসলে তুই এখনও বড্ড ভালো মানুষ।"
ছোড়দির চোখে জল আসে। মনে হয়, এখনই তিনি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠবেন। বলেন, "আমি কোথায় দিনান্তে তোমাদের কাছে আসি, অন্তত একটু সিম্প্যাথি পাব বলে, আর তোমরা কিনা—" কান্নায় ছোড়দির গলা বুজে আসে।
মা একটু অসন্তুষ্ট হন। নিস্পৃহভাবে বলেন, "এতে কাঁদবার কি আছে?" তারপর সন্ধ্যে হয় দেখে ছাদের ঘরের দিকে চলে যান।

দশ বছর আগেও খুশির মা সন্ধ্যেবেলায় শাঁখ বাজাতেন। কি ভাবে যে সে পাট উঠে গেছে বলা মুশকিল। এখন ছাদের ঘরের এক কোণে কিছুক্ষণের জন্যে খুশির মা চুপ করে বসে থাকেন। সামনে আগের বছরে পুজো করা সরস্বতী, শ্রীকৃষ্ণরাধার ছাপা দুখানা ফটো, দেওয়ালে টাঙানো মাকালীর ছবি তেল আর সিঁদুরে ঠাওর হয় না। সন্ধ্যে হয়েছে, খুশি ফিরেছে কিনা, জানা যায় না। সুধাংশুবাবু গিয়েছেন পার্কে বেড়াতে। একলা ঘরখানিতে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে ভালো লাগে খুশির মার। দু-তিনখানা বাড়ির পরেই একটা জায়গা খালি ছিল এতদিন। সেটা ব্যবহার হত মোষের খাটাল হিসেবে। তার পাশে কয়েকটা নারকেল গাছের সারি। আশে পাশে নতুন বাড়ি হওয়ায়, নারকেলকুঞ্জ এখন প্রায় লুপ্ত। তবু দু-তিনটে গাছের পাতায় পড়ন্ত রোদ্দুরের খেলা শুরু হয়। আর খুশির মার কয়েক মুহূর্ত রেশন আর ধোপার জগৎ থেকে, ছেলের চাকরি আর মেয়ের বিয়ের ভাবনা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে ভালো লাগে।
এমন সময় দোতলার অন্ধকার সিঁড়িতে সুধাংশুবাবুর গলায় আওয়াজ পাওয়া যায়। "কে, কী চাই?" "আমি। খুশি আছে?" "খুশি তো নেই।"
"না বাবা আমি ফিরেছি।" খুশি বেরিয়ে আসে। তারপর সিঁড়ির দিকে একনজর তাকিয়ে বলে, "ও নিত্যদা, আসুন।"
নিত্যর ঘরে ঢুকবার সময় মনে হয়, তার আপাদমস্তক সুধাংশুবাবু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন।
"আমি ভেবেছিলাম, আপনি আসবেন না।"—খুশির একথার কি উত্তর দেবে

বুঝতে না পেরে, নিত্য টেবিলের ওপর থেকে একখানা বই তুলে নেয়। বইখানা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী'। "তারাশঙ্করকে তোমার খুব ভালো লাগে না?"—বইখানা হাতে নিয়ে নিত্য বলে।

খুশি জবাব দেয়, "মোটেই না। ভয়ানক ডাল। একবন্ধু নেহাত গছিয়ে দিয়েছে, একটু নাড়াচাড়া না করে তো ফেরত দেওয়া যায় না, তাই রেখে দিয়েছি।"

নিত্য বলে উঠল, "তারাশঙ্কর ডাল হতে যাবে কেন! নেহাত চমকপ্রদ কথা না থাকলেই ডাল হয়ে যাবে; তা হলে তো—"

খুশির দিকে তাকিয়ে চুপ করে যায় সে। খুশি হাসছে তবে হাসিটা যেন বিদ্রূপের। হাসি থামিয়ে বললে, "উঃ! আপনি কী সিরিয়াস নিত্যদা! আচ্ছা বেশ, তারাশঙ্কর ডাল না, খুব ইণ্টারেস্টিং, কিন্তু তাতে আমার কি আসছে যাচ্ছে!"

কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ কাটে। নিত্যর মনে হয় সব সময়ে সিরিয়াস কথা বলার অভ্যেস ছাড়তে হবে, নইলে মেশাই যাবে না কারো সঙ্গে। অকারণে খুশির দাদা অমলের প্রসঙ্গ পেড়ে বসে সে, "আচ্ছা অমল এখন কোথায় আছে!"

"ওমা সেদিন বললাম না, দাদা এখন কানপুরে আছে হুকুমচাঁদ করমচাঁদ মিলে। দাদার কথা না তুলে আর কথা পাচ্ছেন না বুঝি!" নিত্য বোধহয় এবার জবাব দিতে একটু মুশকিলে পড়ত, কিন্তু ঠিক এমন সময়ে ধড়াম করে ভেজান দরজা খুলে যায়। দিলীপ, সাদা পপলিনের সার্ট, হালকা চকলেট রঙের গ্যাবার্ডিনের প্যাণ্ট, চীনে বাড়ির জুতো, চোখেমুখে হাসি ও আত্মপ্রত্যয়।

"ওঃ খুশি তুমি আছ! কী লাক আমার!" কথাটা বলে নিত্যকে দেখতে না পেয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে থিয়েটারি ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে বলে, "ওঃ খুশি—'আই হ্যাভ কাম ফ্রম আলবামা উইথ এ ব্যাঞ্জো অন মাই নী!"

"এটা বুঝি তোমার নতুন সিনেমার গান!" খুশি বলে।

"নতুন, মানে হ্যাঁ, লাস্ট শনিবার মেট্রোতে গিয়েছিলাম, 'পাইনঅ্যাপল কীড'—বিউটি-ফুল ক্যামেরাওয়ার্ক—একেবারে পারফেক্ট! একটা স্ট্র্যাঙ্গল সিন আছে, লাভার তার লেডি-লাভকে স্ট্র্যাঙ্গল করে তিনতলা থেকে ফেলে দিচ্ছে। একেবারে থ্রিলিং!"

খুশি উদাসীনভাবে জিজ্ঞেস করে, "কি করছে।"

"মুখে একটা বালিশ দিয়ে চেপে ধরে..."

"ও হরিড, তোমার যা টেস্ট।"

দিলীপ বলে, "টেস্ট মানে! তোমার ঐ যতসব বাংলা প্যানপেনে ছবি।—লাস্ট

সিনে যত চিতা-ফিতা! যত সব সিরিয়াস ব্যাপার! যাদের সময় আছে, বিকেল-বেলায় চান করে পরিপাটি চুল আঁচড়ে বৌ কি সঙ্গিনী নিয়ে অ্যাডভ্যান্স বুকিং-এ টিকিট করে যায়, তাদের ও সব পোষায়। তারা মাসে একটা দুটো ছবি দেখবে, সিরিয়াস ডিগনিফায়েড ব্যাপার। জীবন সম্বন্ধে আলোকপাত হবে। আমরা বাবা দুপুরে ঘামতে ঘামতে যাই, ও সব বড্ড বোরিং লাগে। তা ছাড়া ফ্যাক্ট তোমার ভালো না লাগতে পারে। কিন্তু ক্যামেরা ওয়ার্ক, নাচ, গান—কোনও চাল নেই বাবা। কতবার বললাম দেখতে লাস্ট ছবিটা, এলিটে হয়ে গেল!"

খুশি জিজ্ঞেস করে, "কোনটা?"

"কেন ঐ যে, কিস অফ ডেথ?"

খুশি এতক্ষণ পরিচয় করিয়ে দেয় নি দিলীপকে নিত্যর সঙ্গে। নিত্য কিছুটা দূরে একটা বেতের চেয়ারের আড়ালে দিলীপকে দেখছিল। দিলীপ থামতে খুশি বলে, "আর একজন লোক আছে ঘরে।" দিলীপ অপ্রস্তুত হয়ে যায়। তারপর চেয়ারের পাশে একজোড়া চোখ দেখে রেগে বলে, খুশির দিকে তাকিয়ে "আমার সঙ্গে ঠাট্টা হচ্ছিল এতক্ষণ?"

খুশি হেসে ফেলে বলে, "আলাপ করিয়ে দি। ইনি হচ্ছেন দিলীপ বোস, মেডিক্যাল কলেজ, সিক্সথ ইয়ার; আর ইনি নিত্য চৌধুরী," তারপর একটু থেমে বেশ স্নেহের সঙ্গে বলে, "দেশের কাজ করেন।"

খুশি বোধ হয় প্রকাশ্যেই ব্যঙ্গ করছে মনে হল। কিন্তু এমন পরিষ্কার তরল গলা যে ঠাট্টার স্বরটা কোথায় লেগে থাকলেও ছাপিয়ে উঠছে না। নিত্য কিছু না বলে নমস্কার করে।

নিত্যকে দিলীপ বলে, "ও আপনি! আপনাকে কোথায় দেখেছি যেন মনে হচ্ছে!" মুখে চোখে দিলীপের বেশ ভাবান্তর হয়, একটু জড়সড় হয়ে বসে, চোখের চাউনিতে ঔৎসুক্যের ভাব এসে যায়। নিত্য জিজ্ঞেস করে, "কোথায় দেখেছেন?"

"ঠিক কোথায় বলতে পারছি না,—কোনও মিটিং-টিটিং-এ বোধ হয়।"

দিলীপের কথা শেষ না হতেই, নিত্য সোজা প্রশ্ন করে, "কোন মিটিং-এ?"

খুশি ব্যাপারটার সহজ সমাধান করে দেয়, বলে, "নিশ্চয়ই কোথাও দেখেছেন, মনে পড়ছে না।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে যায়। তারপর দিলীপ প্রায় নিজের মনেই চুলের ভেতরে হাত বোলাতে বোলাতে কথা শুরু করে। যেন কোনও এক গোপনীয় অব্যক্ত ইতিহাসের পাতা ধীরে ধীরে তুলে ধরতে চেষ্টা করছে সে। আস্তে আস্তে বলে,

"আজকাল কেউ পলিটিক্স না করে পারে? যে কোনও ইনটেলিজেন্ট লোক, পলিটিক্স করা ছাড়া তার উপায় নেই, এখনই না হয় মড়া কেটে কেটে কাঠখোট্টা হয়ে গেছি। কিন্তু এমন তো ছিলাম না।"

এক মুহূর্ত আগের পরিহাসতরল গলা যে কি করে করুণ করে ফেললে দিলীপ, এই ম্যাজিক দেখে নিত্য আশ্চর্য হয়ে যায়। দিলীপ বলে, "আমাদের দেশ মাদারিপুর, নিত্যবাবু। সে সব কী দিন গিয়েছে। আমরা তখন নেহাত ছোট, তবুও দাদাদের সঙ্গে মিছিল করেছি। মিলিটারি রেজিমেন্ট গিয়েছে আমাদের গাঁয়ে।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, খুশির অবাক চোখের দিকে এক নজর তাকিয়ে দিলীপ বলে যায়, "আপনার কথা শুনেছি নিত্যবাবু। আপনারা সত্যি মস্ত বড় কাজ করেছেন। লেগে থাকতে খুব কষ্ট হবে জানি। কিন্তু এই ভাবেই তো আমাদের দেশে আন্দোলন হয়েছে। একদিন না একদিন জিতবেনই।"

নিত্য চুপ করে থাকে। একটা কথা তার মুখের কাছে এসে যেন থেমে যায়, তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, "আপনি বলেছিলেন না দিলীপবাবু আপনার গম্ভীর ব্যাপার বড্ড বোরিং লাগে!"

সাপ কামড়াবার মত চমকে উঠল দিলীপ। এতক্ষণ ধরে যে সে তন্ময় হয়ে কথা বলছিল, তার কোনও দামই দেয় নি তাহলে এ লোকটা! খুব একটা কড়া কথা বলবার সময় মুখ যেমন থমথমে হয়ে আসে, ঠিক তেমনই হয় তার মুখ। খুশি সামলে দেয় ব্যাপারটা। কথাটা একটু রূঢ় কিন্তু মুখ গম্ভীর না করে প্রায় হেসে হেসেই সে বললে, "আপনি সবটাতেই বড় সিরিয়াস। আপনার সঙ্গে কথা বলাই তো মুশকিল নিত্যদা।"

নিত্য আঘাত পায়, চুপ করে থাকে। তারপর একটুখানি ম্লানভাবে হাসে। দিলীপ তার অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠে বলে, "কী যে বলো খুশি। উনি আমাদের মত না কি, দেশের কথার ওপর চায়ের মজলিস বসাবেন। তুমি তো জানো না, ওঁরা কত কাজ করেন।" কতর 'ও'-কারটা হঠাৎ দীর্ঘায়িত হওয়ায়, ব্যঙ্গ মনে হল কথাটা। এর পর কি রকমভাবে তা-না-না করে প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ কেটে গেল। ওদের উভয়ের পরিচিত এক ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়েতে কে কি রকম অভদ্র ব্যবহার করেছিল, তাই নিয়ে পাঁচ মিনিট, খুশির কলেজে কোন উৎসবে কে এক গীতশ্রী হালদার 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান' গানটা কি রকম বেসুরো গেয়েছিল, তার ওপর দশ মিনিট, নান্টুবাবু বলে তাদের পরিচিত এক বিজনেসম্যান তাঁর তরুণী বৌ গায়ত্রীকে নিয়ে চৌরঙ্গীতে হাত ধরাধরি করে কি সব করেছেন,

তার ওপরে আরও কয়েক মিনিট, এর পর বাবুন সরকারের ছেলে হয়েছে—"কী মিষ্টি বাচ্চাটা," আর সবশেষে এল অবিনাশবাবু বলে কোন অধ্যাপক—বিলেত না আমেরিকা—কোথায় যাবেন।

"অবিনাশবাবু? অবিনাশবাবুটা কে?"—জিজ্ঞেস করলে দিলীপ।

"ও মা অবিনাশ সেন! চেন না? ঐ যে সাহিত্যের মজলিসে সভাপতি হয়। রেডিওতে বক্তৃতা দেয়।"

"ও বেঁটে মতন, বড্ড পাউডার মাখে! সব সময়ে শাল গায়ে দেয়! ওটা আবার ইংরেজি পড়ায় কবে থেকে!"

খুশি চোখ মটকায়, "হ্যাঁ স্যার, অনেক কিছুই করেন, ইস্ট-ওয়েস্ট ক্লাবের পাণ্ডা, ভারতীয় কালচার, মহেঞ্জোদরো,—এসবের কি জান তুমি বলো! ওদের আবার একটা ক্লাবের মিটিং-এ গিয়েছিলাম। এজেণ্ডা কী ছিল জান!—'মুনলাইট পিকনিক'—অবশ্য ব্যাপারটা নেহাত একঘেয়ে। লেকের ধারে কাদার ওপর কয়েকটা চেয়ার টেবিল পেতে দ্বারিকের সিঙাড়া খাওয়া আর অবিনাশবাবুর ইণ্ডিয়ান কালচারের ওপর বক্তৃতা শোনা।"

"বেশ ইণ্টারেস্টিং তো।" দিলীপ জবাব দেয়।

খুশি চেঁচিয়ে বলে, "ইণ্টারেস্টিং না ছাই! তার চেয়ে বাড়িতে পড়ে পড়ে ঘুম দেওয়া ভালো। আমাদের সাথে একটি ছেলে পড়ে—অমিয়—শুনি ভীষণ চালাক। সে কি বলে জানো! বলে, ওসব বুজরুকি। কখনও রামকৃষ্ণ, কখনও গান্ধী কখনও বা রবীন্দ্রনাথ করবে। আসল কথা হল, এসব করে যদি কাউকে ভজিয়ে বিলেত-আমেরিকা ঘুরে কেউকেটা হওয়া যায়।"

দিলীপ বলে, "না না সব জিনিস ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দিও না খুশি। অনেক জিনিস আমরা হয়তো বুঝি না। অনেক ব্যাপারে ইণ্ডিয়ার অনেক কনট্রিবিউশন আছে। এই ধরো মেডিক্যাল লাইন। তুমি হয়তো হাসবে খুশি। আপনিও নিশ্চয়ই হাসবেন নিত্যবাবু, কিন্তু বললে বিশ্বাস করবেন না। আমিও মাদুলি পরি। ছেলেবেলায় ভীষণ অসুখ করত। কত ডাক্তার কোবরেজ হল। শেষ পর্যন্ত মা একটা মাদুলি দিলেন। তারপর আর কোনও অসুখ-বিসুখ নেই। অবশ্য মাদুলিটার একটা সায়েন্টিফিক কারণও থাকতে পারে। বেশির ভাগ ওষুধই তো গাছ-গাছরা থেকে তৈরি। বোধহয় তামা কিংবা ঐ জাতীয় কিছুতে ভরে ধারণ করলে, একটা কেমিক্যাল অ্যাকশন হতে পারে।"

সন্ধ্যে পার হয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। পাশের রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলল।

নীচে ঠিক সিঁড়িতে উঠতেই কলতলা—কেউ কাপড় কাচছে। তার আওয়াজ ছাপিয়ে লেকের ওপার থেকে ট্রেনের হুইসল বেজে উঠল। খুশি উঠে আলো জ্বালাতে যাচ্ছিল। দিলীপ নীচু গলায় বলে, "থাক না।" তারপর অনেকটা আত্মগতভাবে ধীরে ধীরে বললে, "ঠিক এই সময়টা বড্ড ভালো লাগে খুশি। যখন সন্ধ্যেটা নামছে! অনেক কথা মনে পড়ে যায় একসঙ্গে। মাদারিপুরে ফুটবল খেলে ফিরছি, অনেক তারা উঠেছে—" দিলীপ থেমে যায়। খুশি যেন আরও অপেক্ষা করে শোনবার জন্যে। দিলীপ আবার বলে, "এখন কেমন হালকা হয়ে গিয়েছি, তখন ঠিক তা ছিলাম না। যখন ক্লাস টেনে পড়ি, দশমীর দিন চোখে জল আসত; সব কিছুতে বেশ একটা উৎসাহ ছিল। এখন যখন খালি ফুটবল আর সিনেমা দেখি, তখন কিছুক্ষণ বেশ হৈ হৈ করে থাকি। তারপর বড্ড ফাঁকা লাগে, খুশি।"

"আমি আজকে উঠি"—অপ্রাসঙ্গিকভাবে নিত্য হঠাৎ বলে উঠল।

"এখন যেন সব কী রকম হয়ে গিয়েছে," একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দিলীপ বললে। অন্ধকারে তার গোলমুখ আবছা বোঝা যায়—তার বসবার ধরনটুকু পর্যন্ত খুশি লক্ষ্য করে ভুলে যায় নিত্য কি বলছে। নিত্য আবার বলে উঠল, "দিলীপবাবু আজ চলি।"

খুশির চমক ভাঙে। বলে, "এখনই যাবেন? আচ্ছা চলুন, তুমি একটু বসো দিলীপ।"

বারান্দা অন্ধকার। কালিঘাটের পুরনো সেকেলে বাড়ি। কাঠের সিঁড়িটার হাতলগুলো এককালে নিশ্চয়ই মেহগনি পালিশে চকচক করত। এখন হাত দিতেই চটা-ওঠা কাঠের ধারগুলো হাতে বেঁধে। নীল রঙ দিয়ে একসার পদ্ম আঁকা রয়েছে সিঁড়ির মাথায়, মধ্যে দু-তিনটে জলে ধুয়ে গেছে। আবছা দেখা যায়।

খুশি আলো জ্বালবার আগেই ওপরের সুইচ থেকে আলো জ্বলে উঠল। খুশির মা নামছেন। ডাক দেন, "কে দিলাপ!" নিত্য জড়সড় হবার আগেই খুশি বললে "না উনি দাদার বন্ধু, একসাথে পড়তেন।" একবার খুশির দিকে, একবার নিত্যর দিকে তাকিয়ে নিরুৎসাহ কণ্ঠে মা বলেন, "ও দিলীপ আসে নি!" "হ্যাঁ ঘরে আছে।" "ও"—মা মিলিয়ে যান অন্ধকারে।

নিত্য নামছিল তাড়াতাড়ি। কাঠের সিঁড়িতে চেষ্টা না করলেও ধপধপ করে আওয়াজ হচ্ছিল। "শুনুন একবার"—নিত্য আচমকা থেমে যায় খুশির কথায়।

খুশিও যে তার সঙ্গে নীচে নেমে এসেছে খালি পায়ে, এটা সে লক্ষ্য করে নি। সিঁড়ির হাতলের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে খুশি। নতুন লাগে। চওড়া ঘাড়ের

ওপর হেলে আছে মুখ। খোলা চুলে আলো পড়েছে। কিছু বলবার উত্তেজনায় তার নিশ্বাস দ্রুত পড়ছিল। "আমায় বলছো?"—নিত্য বললে।

"হ্যাঁ, দেখুন আপনি আর আসবেন না।"

নিত্য বেশ চমকায়। "কী হয়েছে?" কথাটা এমন ফিস ফিস করে বলে যে, নিজেই অবাক হয়ে যায়। খুশি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "আমরা অত্যন্ত সাধারণ নিত্যদা। সাধারণ থাকতেই ভালবাসি। কেউ ভগবানকে চাইলে, আমি তার থেকে দূরে পালাই।" তারপর উত্তেজনা প্রশমিত হলে, যেমন শান্ত স্থির নিশ্বাস ফেলে লোকে, তেমনই একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, "দিলীপকে আমি ভালবাসি।"

দুজনেই চুপ। নিত্য কী বলবে বুঝে উঠতে পারে না। খুশি আবার বলে, "আপনি ভাবছেন, আমি খুব সস্তা না, খুব সস্তা আমার রুচি?" নিত্য কোন জবাব দেয় না।

খুশি ভুলে যায় দিলীপ তার জন্যে অপেক্ষা করছে আর এভাবে সিঁড়ির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আলাপ করা উচিত নয়। আর নিত্য অবাক হল, এমন সরলভাবে অকপটে খুশি তার মনের কথাগুলো খুলে বলতে পারে বলে। খুশি হাতলের ওপর ঝুঁকে ধীরে ধীরে বলতে থাকে, "আপনি ঠিক গলিতে ঢুকতেই দেখবেন, মাধব কোবরেজের বাড়ি, মার মুখে শুনেছি, আগে টেররিস্ট ছিলেন। কদ্দিন জেলে কাটিয়েছেন, রাত্তিরে আসতেন লুকিয়ে লুকিয়ে, রিভলবার জমা দিতে মার কাছে। সেই লোকটাই, জানেন নিত্যদা, আমি যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটি, এমনভাবে তাকায়! দিলীপকে আমি বুঝতে পারি, সে এলে তাকে ডবল ডিম ভেজে খাওয়াই, সিনেমায় যাই হৈ হৈ করে। কিন্তু আপনাদের একদম চিনি না। বড্ড ভয় হয়, যদি ভালো কথা বলে ঠকিয়ে যান।" দীর্ঘনিশ্বাস চাপবার চেষ্টায় গলা কেঁপে ওঠে তার। অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, "আমি আর ঠকতে রাজি নই।"

এবারে কেউ কথা বলে না। খুশি খুব বিচলিত হয়েছে বোঝা গেল। তিন-চার ধাপ সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে সে, কিন্তু তার ভারী উষ্ণ নিশ্বাস যেন স্পর্শ করছিল নিত্যকে। নিত্য যাবার আগে কি বলবে ভাবছিল। খুশি বলে, "রাগ করবেন না আমার ওপর। আবার আসবেন," বলে কথাটার পূর্ণচ্ছেদ টানবার আগেই বলে ফেলে, "যদি প্রয়োজন মনে করেন অবশ্য।" নিত্য জবাব দেয়, "আবার আসব খুশি।"

রাস্তায় নেমে কিছুক্ষণ বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল নিত্য। তারপর গলির মোড়েই

এসে দেখে, নীল কাঠের ওপর সোনালি লেখা— কবিরাজ মাধব চক্রবর্তী। একতলা জানালার শিক দিয়ে বড় বড় ওষুধের দু-তিনটে আলমারি, আর টেবিলের ওপর ঝুঁকে-পড়া একটা মানুষের অর্ধেকটা দেখা যায়।

নিত্য ট্রামে না গিয়ে হাঁটতে শুরু করে। চওড়া রাস্তা, চাঁদের আলো পড়েছে। প্রচুর লোক বেড়াচ্ছে রাস্তাঘাটে। চায়ের কেবিনে ভর্তি ছেলে, হাতে চায়ের কাপ নিয়ে কেউ কেউ রাস্তায় বেঞ্চ পেতে বসেছে। একটা ময়রার দোকানে গান চলেছে অ্যামপ্লিফায়ারে, "ওগো তুমি পঞ্চদশী, পৌছিলে পূর্ণিমা রাতে।"

নিত্যর মাথায় একরাশ চিন্তা জট পাকাচ্ছিল। খুশি তাকে একটা ধাক্কা দিয়েছে "আপনাদের ভয় করি, নিত্যদা।" কেন? কী চায় সে? সে কি অসম্ভব কিছু চায়, যার জন্যে তার আশেপাশের লোকদের হাবভাব ভালো লাগে না কিংবা খুশির চাওয়ার কোন মানে নেই? নেহাত খুশি একটা অন্তঃশীলা গৃহিণী, সুযোগ পেয়ে কথাগুলো বলে নিয়েছে। নিত্যর খালি মনে হয়, খুশিরা যে ফালতু, এ বিষয়ে যদি সে নিঃসংশয় হতে পারতো! পরক্ষণে তার মনে হয়, কিন্তু তাই বা কি করে হবে! সব সমাজেই তো খুঁত থাকবে, মানুষের ভেতর। তাহলে? সে কি নিজে যথেষ্ট পরিমাণে মানুষকে ভালবাসতে পেরেছে? খুঁত আছে, এমন লোককে সহ্য করতে পারবে?

অনেকগুলো সিগারেট পুড়িয়ে নিত্য সেদিন বাড়ি ফিরল বেশ রাত করে।

তের

যুদ্ধের সময় থেকে কলেজ স্ট্রীটের অ্যালবার্ট হল কফি হাউসে পরিণত হবার পর তরুণসমাজের কাছে এটি একটি বিশেষ আকর্ষণের জায়গা হয়ে আছে।

এর প্রধান কারণ হল এক কাপ কফি নিয়ে দু-ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেও এখানকার বয়-বেয়ারারা আপত্তি করে না। কেবল রাত্তির হয়ে পড়লে ফ্যানের সুইচ অফ করে দেয়। কাজেই যাঁরা কফি খেতে ভালবাসেন না, তাঁরাও এখানে আসেন। সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউ-এ শহরের আর একটি প্রধান কফি হাউসে তেজী-মন্দী, সোনে-চাঁদিকা-ভাও, আপিস পলিটিক্স, বিজনেসডিল ইত্যাদি ব্যাবহারিক জীবনের ব্যাপারই বেশি আলোচিত হয়।

কিন্তু এ কফি হাউসে অব্যাবহারিক আলোচনা ও আচার-বিচারই বেশি।
তরুণদের মধ্যে যাঁরা নতুন বিয়ে করেছেন, অথবা করব করব করছেন, তাঁরা স্ত্রী-পুরুষ দুজন দোতলার ব্যালকনিতে স্তব্ধ তন্ময়চিত্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আইসক্রীম খান। অপেক্ষাকৃত কমবয়সী ছেলেরা, যাদের পরীক্ষা কাছে, তারা একরাশ বই এদিক সেদিক ছড়িয়ে সম্ভাব্য প্রশ্ন নিয়ে আলাপ করে। আর যাদের পরীক্ষা খুব সুদূরে অথবা পরীক্ষাশেষে চাকরির সন্ধানে পা বাড়িয়েছে, তারা সদ্য আগত হলিউড-নায়িকার ফিগার আইডিয়াল বলা চলে কিনা, বাঙালি মেয়েরা অ্যাট্রাকটিভ, না পাঞ্জাবী মেয়েরা অ্যাট্রাকটিভ, শান্তিনিকেতন কি ফ্লার্ট করার জায়গা না আরো কিছু, ক্রিস্টোফার কড্‌ওয়েল লাভ সম্বন্ধে কি বলেছেন, লেনিনের এম্পিরিও ক্রিটিসিজমের মোদ্দা কথাটা কি, পিকাসো-মাতিস এরা কমিউনিস্ট পার্টির সত্যি সভ্য কিনা, স্তালিন কবার ব্যাঙ্ক লুঠ করেছেন, টি. এস. এলিয়ট চল্লিশ বছর না চব্বিশ বছরে প্রথম কবিতা লেখেন, গান্ধীজী কি বলতেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন সম্বন্ধ থাকবে না, এ সব প্রশ্ন গভীরভাবে অনুধাবন করে।
একেবারে ঘরের শেষ প্রান্তে একটা টেবিল ঘিরে যে দুটি তরুণ বসেছিল, তাদের একজনের বয়স বছর তেইশ, দু-বার ড্রপ করে এবার এম-এ দিচ্ছে। একটু বেঁটে আর মোটা, কিন্তু তার বেমানান শরীরটাকে মানিয়ে দিয়েছে ঘন কালো চুলের ঝাড় এবং তীক্ষ্ণ নাকের পাশে একজোড়া স্বপ্নময় চোখ। ছেলেটির নাম অমিয়। পাশের সঙ্গীকে সে জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা দিলীপ, ঐ যে তোমরা খুশি খুশি করো, ও মেয়েটা কে !"
দিলীপ বললে, "ও খুশি ! ওরা কালিঘাটে থাকে। এখন আপাতত হস্টেলে উঠে এসেছে। আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। সি হ্যাজ সো মাচ ইনটেলিজেন্স, সো পারফেক্ট আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং, সো···"অমিয় হেসে উঠে বললে, "হয়েছে, হয়েছে, ওগুলো সব জানি। আসলে যেসব মেয়েরা ইউনিভার্সিটিতে ভেড়ার মত আসে যায়, তাদের থেকে একটু আলাদা এই বলতে চাও তো !"
দিলীপ অধীর গলায় বললে, "না অমিয়, তোমাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না, তুমি এমন কোলড, সব কথাই এমন ঠাট্টার মতন করে নাও, কিন্তু খুশির সম্বন্ধে কোন সস্তা জেনারালাইজেশন খাটে না।"
"না খাটলেই ভালো। তবে আমার যদি ব্যক্তিগত মতামত জিজ্ঞেস কর, তবে বলব, মেয়েরা বিয়ের আগে একটু ছলবল করেই থাকে। তাই বলে যদি ভাব, তারা ইংরেজি সাহিত্যের ব্রন্টি সিস্টারেস, তা হলে আমার কিছু বলার নেই।"

দ্বিতীয় বার কফি আসে। এবারে কথা হয় একতরফা। অমিয়ই বলে। কফিতে চুমুক দেওয়ার পর দূরে দেওয়ালের দিকে একবার বড় বড় চোখ দুটো ঘুরে আসে। দুজনে সিগারেট ধরাবার পর বেশ জমাটি লাগে। অমিয় বলে, "জানো দিলীপ, রাস্তা দিয়ে যখন হঠাৎ 'চাই বেল ফুল, চাই বেল ফুল' বলে হেঁকে যায়, তখন কেমন যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।"

"কেন!" দিলীপ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে।

"চিৎপুরের একটা গলির কথা মনে পড়ে যায়। আমরা ছিলাম চারজন। যুদ্ধের বাজার, চোখে-ঠুলি দেওয়া আলোর সারি। আমাদের মধ্যে যে ছিল লিডার, সে আবার আমাদের কলেজের এক প্রোফেসরের ছেলে, ভীষণ রগুড়ে। সে দেশলাই জ্বেলে জ্বেলে রাস্তার-ধারে-দাঁড়ানো সারি সারি মূর্তিগুলোর মুখে আলো ফেলেছিল। ঘরে ঢুকে দেখি, পনেরো পাওয়ারের টিমটম বালবের আলো, আর আলোর ঠিক নীচেই দরজার ওপর কাঠের তাকে হেলান দেওয়া রামকৃষ্ণের একটা ফটো। অদ্ভুত লাগল। ভাবলাম পরে জিজ্ঞেস করব, ওটা কেন রেখেছ? কিন্তু পাচ মিনিট যেতে না যেতেই এমন বিশ্রী ব্যাপার হল। খাটের নীচ থেকে একটা কচি ছেলে এমন বেয়াড়াভাবে চেঁচিয়ে উঠল…।"

দিলীপ অসহিষ্ণুভাবে বললে, "তারপর?"

অমিয় জবাব দেয় তার স্বাভাবিক ঠাণ্ডা হাসি হেসে, "তারপর? মেয়েটা আলো জ্বেলে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল খাট থেকে, গায়ে কাপড় নেই, আর প্রাণপণে ছেলে চাপড়াচ্ছে, পাছে খদ্দের বিগড়ে যায়। বেরিয়ে এলাম। দরজার কাছে প্রোফেসরের ছেলেটি। সোঁ করে ভেতরে ঢুকে গেল।"

দিলীপ এবার ধীরভাবে বললে, "এটা কিছু নতুন ব্যাপার নয় অমিয়। বেশ্যাবাড়িতে গিয়ে বিয়াত্রিচে খোঁজা, এটা লেখক-অলেখক অনেকেই করেছে, শুধু অমিয় দত্তই করে নি।"

অমিয়কে এতক্ষণে একটু অসন্তুষ্ট দেখাল। বেশ অসহিষ্ণু গলায় বললে, "আমি তো বলি নি, এটা নতুন ব্যাপার। তবে তোমরা যে 'লাভ' 'লাভ' কর, সেটাও আসলে ঐ। কতকগুলি শারীরিক ও আর্থিক আরাম আদায় করার জন্যে যত সব ন্যাকামি। হৃদয়-ফ্রিদয় সব বাজে কথা।"

"কোনও একটা সস্তা কথাকে যদি চালাকভাবে বলা যায়, তাহলেই সত্যি হয়ে যায় না," দিলীপ বেশ জোর দিয়ে উত্তর দিল।

অমিয় চটল না। হাসতে হাসতেই বলল, "মূল্যবান কথাটা হল কি? ভালবাসা?"

দিলীপ জবাব দেয়, "হ্যাঁ কথাটা পুরনো, শুনতেও হাসি পায়। তবে খুব উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

অমিয় নিজের মনেই গজরাতে লাগল, "ভালবাসা! জীবনে জীবন যোগ করা! কমরেডশিপ! এস আমরা হাতধরাধরি করে হাঁটি, উদয়ের পথে রওনা হই! যত সব বস্তাপচা বুলি!" তারপর গলা চড়িয়ে বললে, "না হয় খুশিকে ভালবাস, তাই বলে যত রাবিশ শুনিয়ে আমার সময় নষ্ট করবে, এটা একেবারে অসহ্য!"

অমিয় এত জোরে চেঁচিয়ে ওঠে যে, কিছু দূরেই সদ্য আগত দুটি কমবয়সী ছেলেমেয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়। দিলীপকে ভয়ানক অপ্রস্তুত দেখাল সঙ্গে সঙ্গে। সে চেঁচিয়ে বলে, "সাচু, এদিকে সিট আছে।" তারপর মেয়েটির দিকে একঝলক তাকিয়ে অমিয়র কানের কাছে ঝুঁকে চাপা গলায় বললে, "খুশি!"

খুশির সঙ্গে সাচু বলে যে ছেলেটি এসেছিল, সে অমিয়র দিকে তাকিয়ে বললে, "আমরা নিত্যর সম্বন্ধে বলছিলাম।"

দিলীপের চোখ নেচে ওঠে। খুশির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, "ও সেই যে ছেলেটা তোমার ওখানে এসেছিল?" খুশির কাছে সে যে একটু বেশি অন্তরঙ্গ, সেটা যেন অমিয়র কাছে প্রথম থেকেই জানিয়ে দিতে চায় দিলীপ।

সাচু বললে, "হ্যাঁ, নিত্যটা আগে বেশ সার্প ছিল। এখন কেমন গেঁজে গেছে।"

"পলিটিক্স করলেই ওরকম হয়। পলিটিক্স করলেই এমন একরোখা হয়ে যায় মানুষ!" দিলীপ বলে উঠল।

সাচু সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। বলে, "ও রকম পলিটিক্স করার অর্থ বুঝি না। পলিটিক্স যদি করবি, তবে বড় বড় মিটিং কর, বক্তৃতা দে, লোকে তোকে চিনুক, জানুক! একটা গণ্যমান্য লোক না হলে, তোকে পুঁছবে কেন লোকে! তা না বছরের পর বছর ধরে ছেঁচড়ামো করা!"

দিলীপকে বেশ বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। সে চিন্তিতভাবে বলে ওঠে, "এ যেন একটা হুজুগ এসেছে দেশে। পলিটিক্সের কথা না হলে লোকে শুনতে চায় না। হয় তোমাকে কমিউনিস্ট হতে হবে, নয় কমিউনিস্টদের গালাগাল দিতে হবে, হয় গান্ধী গান্ধী করতে হবে, নয়তো বা গান্ধীকে বলতে হবে জোচ্চোর! কি বলব অমিয়, আমাদের পাড়ার ক্লাস সেভেন-এইটের ছেলেগুলো পর্যন্ত 'সামন্ততান্ত্রিক' 'ধনতান্ত্রিক', এই সমস্ত গালভরা বড় বড় কথাগুলো বেমালুম বলে যায় আজকাল। লাইফের সিমপ্লিসিটি একদম নষ্ট হয়ে গেছে।"

এতক্ষণ যে আলোচনা হচ্ছিল, তাতে খুশি অমিয় দুজনেই যোগ দেয় নি। মাঝখানে

শুধু খুশিকে নেহাত সৌজন্যের খাতিরে অমিয়র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল দিলীপ। এবার দিলীপ খুশির দিকে তাকিয়ে বেশ একটু মুরুব্বির চালে বলে, "তুমি যে একেবারে চুপ করে আছো এ ব্যাপারে। তোমার মতটা কি বল?"

"এ ব্যাপারে আমার কোনও মত নেই"—ছোট্ট উত্তর দিল খুশি আর তাকে একটু বিব্রতও দেখাল।

অমিয় বললে উদাসীন ভাবে, "এ সব কথা নিয়ে তো অনেকবার আলাপ করেছি দিলীপ। আজকে উনি নতুন এসেছেন, আমরা একটা নতুন কিছু নিয়ে আলাপ করি। যদি ইণ্টারেস্টিং কিছু মনে না আসে, তা হলে অন্তত মান্নার ফ্রি কিক্ নিয়ে গল্প কর। তারও একটা মানে আছে। আফটার অল, লাইফ ইজ এ ফ্রি কিক্ টু অ্যান্ আন্নোন্ গোলপোস্ট!"

অমিয়র এমন ধারাল আর উজ্জ্বল কথায় আলোচনার মোড ফিরে গেল। আড়ষ্ট ভাবটা সবাই-এর কেটে যায়। খুশিও আলাপে যোগ দেয়। আর দিলীপ কথার ফাঁকে ফাঁকে আকারে-ইঙ্গিতে জানিয়ে দিতে ছাড়ে না যে খুশির সঙ্গে তার একটা গোপন হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে।

ঠিক উঠবার মুখে খুশিকে অমিয় জিজ্ঞেস করে, "আপনি খেলা দেখেছেন কখনও?"

খুশি একটু অবাক হয়। খুব একটা মজার কথা মনে পড়ায় তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, "ফুটবল খেলা? হ্যাঁ জলপাইগুড়িতে দেখেছিলাম একবার। বিবাহিত আর অবিবাহিতদের মধ্যে খেলা হয়েছিল।

অমিয় হেসে জিজ্ঞেস করে, "খালি পায়ে আর মালকোঁচা মেরে?"

"কারা জিতেছিল?" দিলীপ জিজ্ঞেস করে।

খুশির চোখে চশমার ভেতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। দিলীপের দিকে তাকিয়ে বললে, "কারা জিতলে, তোমার সুবিধে হয়?" তারপর দিলীপ অপ্রস্তুত হবার আগেই তাকে যেন সান্ত্বনা দিলে "না, না, বিবাহিত ছাড়া আর কারা জিতবে!"

সবাই হেসে উঠল খুশির কথায়। অমিয় খুশিকে বললে, "চলুন না, সামনের সোমবার খেলা দেখে আসি, চ্যারিটি ম্যাচ—খুব হৈ হৈ হবে।"

খুশি কিছু বলার আগেই দিলীপ বলে উঠল, "আমার কিন্তু সেদিন ওয়ার্ড-ডিউটি খুশি, একদম সময় নেই।

"সোমবার ছাড়া তো আমার সময়ই হবে না, অনেক ক্লাস পড়ে গেছে।" খুশি জবাব দেয়।

"তবে যাও," বেশ নিরুৎসাহ কণ্ঠেই দিলীপ জবাব দিল।

ঠিক হল আগামী সোমবার অমিয়, খুশি আর সাচু যাবে চ্যারিটি ম্যাচ দেখতে।

প্রায় হাজারখানেক লোকের এক উৎসুক লাইন অধীর প্রতীক্ষায় একটি স্বল্পপরিসর সবুজ কাঠের ঘরের এক ক্ষুদ্র ফোকরের সামনে ঘণ্টা তুয়েকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচটা বাজতে এখনও আধঘণ্টা দেরী। প্রায় দশ-বারো হাজার লোকের এক অশ্রান্ত চাপা গর্জন ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব গ্রাউণ্ড থেকে সমস্ত ময়দানে ছড়িয়ে পড়ছে। যাদের সিজন টিকিট আছে, সাদা গ্যালারির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। একটা ফাঁকা জায়গায় এসে টিকিট দেখিয়ে লোকে ঢুকছে। চারদিকে গাড়ি, পুলিশ সার্জেন্ট। গ্যালারির অর্ধেকের ওপর ভর্তি হতে না হতেই বাইরে এক প্রচণ্ড চিৎকার শোনা গেল। আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের হুড়োহুড়ির আওয়াজ উঠল। লাইনে বচসা ও গণ্ড-গোল হওয়ায় লাঠিচার্জ শুরু হয়েছে। চারটে লাল তেজিয়ান ঘোড়ার ওপর চড়ে খুব হাসিখুশি কমবয়সী চারটে লাল সার্জেন্ট এগিয়ে এল। তাদের মধ্যে সামনের লোকটির বয়স সবচেয়ে কম, ঠোঁটের ওপর পাতলা গোঁফের রেখা। সে সোজা লাইনের সামনে এসে, তার ঘোড়ার তু-পা তুলে দেয় টাকওয়ালা একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের উপর। একটু মৃতু হেসে বাঁ দিকে হেলে গিয়ে বেটনটা নামিয়ে ঝাঁকি মারে মাথার ওপর। ভদ্রলোকের হাতে একটি রেশনব্যাগ। বেটনের বাড়ি খেতেই তাঁর মুখে স্মিত হাসির রেখা ফুটে ওঠে, তু-হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করেন. তারপর চিত হয়ে ঘুরে পড়ে যান। পরের ঘোড়াটি এসে ঠিক তাক করে রেশনব্যাগটার ওপর পড়ায়, ব্যাগটা থেকে কয়েকটা কমলালেবু আর পটল কাদায় গড়িয়ে পড়ে। চারদিকের হৈ হৈ হট্টগোলে কানে তালা লেগে যায়।

খুশি এসে পড়ে ঠিক এই সময়। এই বিরাট জনারণ্যে এত কলরবের মাঝখানে কোনও থৈ পায় না সে। তার ওপর যখন বুড়ো ভদ্রলোকটি ঠিক তার হাত পনেরোর ভিতরেই গড়িয়ে কাদার ওপর পড়ে গেল, তখন খুশি থেমে পড়ে বললে, "চলুন, আমার খেলা দেখা অনেক হয়েছে।"

"না, না আমাদের স্পেশ্যাল স্ট্যাণ্ডের টিকিট আছে"—অমিয় রাস্তা দেখিয়ে খুশিকে তাদের সিটে নিয়ে যায়। স্পেশ্যাল সিটে মারামারি, চিৎকার অনেক কম। তবে বচসা, বিজনেস-ব্যাপার, সিনেমার গল্প খুব জোরে চলছে। সামনে সবুজ মখমলের মত বিস্তৃত মাঠের চারপাশে গ্যালারির ওপর কাতারে কাতারে লোক দেখে খুশির এবার সত্যিই আরাম লাগে। সে একটা অন্য জগতে এসে গেছে মনে হয়। অমিয়র পাশে বসে উৎসাহের সঙ্গে বলে ওঠে, "আপনি কি করেন অমিয়বাবু বলুন তো?"

অমিয় অবাক হয়ে বলে, "কী করি মানে ?"

"মানে চাকরি-বাকরি করেন, না পার্টি করেন, না আর্ট করেন ?" খুশি এমন উজ্জ্বল মুখ করে বলে যে, অমিয় অসন্তুষ্ট হতে পারে না। বলে, "কী শুনেছেন, আমার সম্বন্ধে ?"

"অনেক কিছু। আপনি যাকে বলে একজন বড়লোকের ছেলে। অথচ সব কিছুই ছেড়ে দিতে প্রস্তুত, কোনও আইডিয়াল-এর জন্যে। অথচ কোনও আইডিয়ালই আপনার কাছে ঠিক আইডিয়াল নয়। বেশ মজা লাগে ভাবতে।"

অমিয় বুঝতে পারে না, তাকে এভাবে সমালোচনা করায় তার চটে ওঠা উচিত কিনা। চুপ করে থেকে সে বলে, "বেশির ভাগ শোনা কথাই মিথ্যে হয় কিন্তু!" খুশি আবার তার পরিহাস-মুখর কণ্ঠে বলে ওঠে, "আর আপনার একটা বিশেষ গুণ, যেটা দিলীপ আমাকে বারবার বলে, সেটা হল মেয়েদের ব্যাপারে আপনি না কি ভীষণ উদাসীন!" ভীষণের ওপর ভীষণ জোর দিতে গিয়ে চাপা হাসিতে টোল খায় খুশির গাল।

অমিয়র একটা খুব চালাক উত্তর মনে এসেছিল। কিন্তু কিছু বলবার আগেই দু-দিক থেকে খেলোয়াড়রা শূন্যে বল শুট করতে করতে মাঠে ঢুকে পড়ে। বিরাট সবুজ মাঠের বুকে এক দলের হলুদ রঙের জার্সি। আর এক দলের লাল আর কালো রঙের পোশাক। হাঁটুর ওপরে সাদা ফেট্টি। গোলকীপারের নী-প্যাড, হাতের গ্লাভস্, সব কিছুই অদ্ভুত লাগে খুশির। মফস্বলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে কলকাতার খেলোয়াড়দের সত্যিই পার্থক্য আছে মনে হয়। বিশেষত বিবাহিত-অবিবাহিতদের মধ্যে যে খেলাটা সে দেখেছিল, জলপাইগুড়ির রেসকোর্সে, তাদের মধ্যে তিনজনের ছিল মালকোঁচা মারা। খুব জোরে শুট করতে গিয়ে একজন ব্যাকের কাপড়ের খুঁটো খুলে পড়েছিল। খুশি স্তব্ধ দৃষ্টিতে খেলা দেখতে থাকে। ভুলে যায় চারপাশের জগৎ। আর অমিয়র চোখের সামনে প্রতি সিজনের পরিচিত খেলোয়াড়দের অতিমাত্রায় চেনা বিশেষ কায়দাগুলোর চেয়ে আরও চমৎকার লাগে তার পাশেই উপস্থিত তন্ময় তরুণীটিকে।

মিনিট কুড়ি পরই ইস্টবেঙ্গলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড মোহনবাগানের হাফের পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে যায়। সামনের দুজন প্রতিপক্ষের কাছে খানিকক্ষণ ড্রিবল করে সাঁ করে ডানদিকে সরে গিয়ে এমন প্রচণ্ড শক্তিতে শুট করে গোলের মুখে যে, এতক্ষণের মৌন অপেক্ষা একটা চাপা গুঞ্জনের মত ভাঙতে আরম্ভ করে। গোলকীপারের শরীরটা শূন্যে মাছের মত লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু তার

দু-হাতের পাশ কাটিয়ে তীব্র গতিতে বলটি ধাক্কা মারে জালের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড উত্তেজনায় মাঠ ভেঙে পড়ল। গ্যালারিতে এক জায়গায় মারামারি শুরু হয়ে গেল, দুই দলের সাপোর্টারদের মধ্যে। পাগলের মত সবাই সিটের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে থাকে। প্রায় মাঠের মধ্যে একটা টাকওয়ালা বুড়ো ভদ্রলোককে দেখে খুশি অবাক হল। যিনি কিছুক্ষণ আগে সার্জেণ্টের বেটনের আঘাতে পড়ে গিয়েছিলেন, তিনি এখন একটি ছাতা খুলছেন আর বন্ধ করছেন, দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরুচ্ছে গলা থেকে।

এরপর খেলা ঝিমিয়ে এল। দু-পক্ষের গোলের কাছে মুহুর্মুহুঃ আক্রমণ চলা সত্ত্বেও কোনও গোল হল না। শেষ দশ মিনিট ভীষণ ক্লান্তিকর মনে হচ্ছিল খুশির। স্ট্যাণ্ড থেকে নেমে মাঠ পেরুতেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি এসে ক্রীড়ামোদীদের অভ্যর্থনা জানাল। খুশির চুলে গুঁড়ি গুঁড়ি শিশিরের মত জল জমছিল। একটু ইতস্তত করে অমিয় তার হালকা ওয়াটারপ্রুফটা খুশির পিঠে চাড়িয়ে দেয়, তারপর তারা চা খেতে যায় চৌরঙ্গীর রেস্তোরাঁয়।

চা খেয়ে যখন তারা বেরিয়ে এল, তখন ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় সাতটা। একপশলা বৃষ্টির পর বেশ অদ্ভুত লাগছিল চৌরঙ্গী। মসৃণ, চকচকে রাস্তার এক কোনায় ছই ফেলে রিক্সাগুলো দাঁড়িয়ে আছে, মেট্রোর আলোর নীচে জল থেকে গা বাঁচাবার জন্যে যে-সব পথচারী ভিড় করেছিল, তারা বেরিয়ে পড়ছে। অমিয় বললে, "আপনার কি এখন না গেলেই নয় ?" খুব একটা অস্পষ্ট মিনতি তার গলায়।

খুশি সহজভাবে বলে, "না, না, আমার হাতে এখনও সময় আছে। চলুন না, কোথাও বসে গল্প করা যাক।

সাচু মাঝখান থেকে রসভঙ্গ করলে, সে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে উঠল, "না, আমার বড্ড টায়ার্ড লাগছে খুশি। খেলা দেখলাম, চা খেলাম, এর পরও গল্প করার মত মেজাজ আর নেই।"

সাচুর কথায় খুশি চটে উঠল, "এলেন কেন তাহলে ? মেজাজ না থাকলে এলেন কেন ?" বিরক্তি ফুটে ওঠে তার গলায়।

সাচু খুশির কথায় জবাব না দিয়ে অমিয়কে লক্ষ্য করে বললে, "অমিয় কিছু মনে করো না। আমার সত্যিই বড্ড টায়ার্ড লাগছে, আমি চললাম।"

সাচু চলে যাবার পর তারা দুজন নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে। অমিয় বলে, "চলুন মনুমেণ্টের তলাটায় বসি। চারদিকে যা ভিজে।"

মনুমেণ্টের তলায় এসে খুশি আর অমিয় দুজনেই খুব অবাক হয়। কতগুলো

লোক আগাগোড়া সপ সপ করছে ভিজে, কয়েকটা টেবিল চেয়ার সরাচ্ছে। চার-পাঁচজনের পরনে ট্রাম-কণ্ডাক্টরের উর্দি। চশমা পরা একটি কমবয়সী মেয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "ও পুষ্পদি তোমায় না আবার চেতলা যেতে হবে। হরেনদা ডাকছে তোমায়।" বলবার সঙ্গে সঙ্গেই খাকি প্যাণ্ট আর হলুদ ছিটের সার্ট পরা একটি আটাশ-তিরিশ বছরের লোক এগিয়ে আসে। সর্বাঙ্গ-ভেজা গোলাপি রঙের শাড়ি পরা ষোল-সতেরো বছরের একটি মেয়ে কি একটা বলে খিল খিল করে হাসতে থাকে। খুশি দাঁড়িয়ে পড়ে দেখছিল। একটা ভেজা লাল ফেস্টুনে লেখা—"বিড়ি মজদুর ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।" সবুজ চকরাবকরা লুঙ্গি পরনে একটা লোক সেটা গুটিয়ে নিচ্ছে। আর একটা ঢেঙা প্যাণ্ট-পরা লোক একটা ভেজা লাল রঙের ফ্ল্যাগ কাঁধের ওপর গামছার মত করে ফেলে নেয়। কতগুলো বাঁশের বাখারির ওপরে লালকালি দিয়ে স্লোগান লেখা, "বাঁচার মত মজুরি চাই"—অর্ধেক লেখা জল লেগে ধেবড়ে গেছে। একটি আট-দশ বছরের বাচ্চা ছেলে, সেগুলো একসাথে করে কাঁধের ওপর তুলে নিল।

খুশি বিস্ফারিত চোখে এই নানান ধরনের মানুষগুলোকে দেখছিল এক দৃষ্টিতে। হঠাৎ অমিয়র চাপা বিদ্রূপ মাখানো গলায় তার চমক ভাঙে। অমিয়র মুখে কী রকম এক বিজাতীয় ঘৃণা ফুটে উঠেছে। তার গলার আওয়াজ ভেসে আসে, "চমৎকার! সুন্দর! বাঁচার মত মজুরি চাই! আর কি চাই?" খুশির দিকে চোখ পড়তে সামলে নিল নিজেকে। আত্মস্থ হয়ে হেসে বললে, "মিছিল করে কারা বলতে পারেন?"

এরকম বেখাপ্পা প্রশ্নের উত্তরে খুশির যে কথাটা মুখে এল, সেটাই বললে, "না ঠিক জানি না, ঠিক বুঝি না ব্যাপারটা।"

"মিছিল করে তারা, যাদের মনে বিশ্বাস নেই। তাই মিছিল করে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে নিজেরা বিশ্বাস করতে চেষ্টা করে, মানুষের খুব ভালো করছে তারা। আসলে চাই আত্মবিশ্বাস। এসব মিটিং-ফিটিং-এ কিছু হয় না।"

লোকগুলো চলে যাবার পর চারদিক খুব ফাঁকা ঠেকে। দূরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ওপরে দুটো জ্বলজ্বলে তারা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে আসে চারদিকে।

বৃষ্টির পর সন্ধ্যাবেলা বলেই হোক, কিংবা খেলা দেখার উত্তেজনার পরে বলেই হোক, চারপাশের এই শান্ত চুপচাপ পরিবেশের মেজাজটা কেমন ভারী লাগছিল খুশির। বারে বারে চোখ পড়ছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাথার ওপর তারাগুলোর দিকে।

দুজনে পাশাপাশি মনুমেন্টের সিঁড়িতে বসার পর অমিয় একটা পুরনো কথার সূত্র ধরে বললে, "দিলীপ সেদিন খুব প্রশংসা করছিল বইটার। আমার তো ভালো লাগে নি। কেমন যেন বড্ড সোজা।"

খুশির কানে যেন কথা ঢুকছিল না। সে যে কী ভাবছে, বোঝা গেল না। অমিয় একটু কাছে সরে আসে। ঘাড় নামিয়ে তার বিষাদভরা একাগ্র গলায় বলতে থাকে, "ভালবাসায় পড়তে গেলেই কি আদর্শ পুরুষ হতে হবে? একেবারে অভ্রান্ত হতে হবে? তা হলে ভালবাসার দাম কি? তাকে আলাদা আমি কেন বলব? ভালবাসার কথা উঠলেই আমার কি মনে পড়ে জানেন, কেন জানি সেই যীশুখ্রীষ্টের কথা মনে পড়ে যায়। যীশু যেমন কুষ্ঠরোগীকে বুকে নিয়েছিল,. তেমনি যেন একটা ভাব আছে ভালবাসার মধ্যে, একটা দয়ার ভাব, একটা ক্ষমার ভাব!"

খুশি চমকাল। শীতে যেমন লোকে হঠাৎ কেঁপে ওঠে ঠিক তেমনি ভাবে মনে হল এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার মেরুদণ্ড শির শির করে উঠল। আর অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে হয়ে উঠবার সাথে সাথেই খুশি অনুভব করলে, অমিয়র ভারী উষ্ণ নিশ্বাস, তার পিঠের ওপর।

খুশির আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যায় সঙ্গে সঙ্গে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ওপরের তারা যেন কোথায় অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যায় তার মন থেকে। অমিয়র চোখে চোখ পড়তেই সে অবাক্ হয়ে যায়। একেবারে বদলে গেছে অমিয়র মুখ। তাকে আর চেনা যায় না। তাকে আর কিছুতেই এক করা যায় না, এই ঘনায়মান অন্ধকারের স্বপ্নময় পরিবেশের সঙ্গে।

খুশি বিরক্ত হয় মেয়েদের সম্বন্ধে কথাবার্তায় এই চরম উদাসীন লোকটির এইরকম অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে। মাঝে আরও দু-দিন অমিয়র সঙ্গে আলাপ হয়েছে কফি হাউসে। একদিন ইওরোপীয় মিউজিক নিয়ে খুব আলোচনা করেছে সে। এসব চেষ্টা, এত ভালো ভালো কথা কি নেহাত কতগুলো মুহূর্তের সন্তুষ্টির জন্যে?

পরিষ্কার সহজ গলায় খুশি বললে, "আপনার সম্বন্ধে আরও ভালো ধারণা রাখতে চাই অমিয়বাবু।"

অমিয় এবার চমকাল খুশির এমন সহজ দৃঢ় কথায়। কিন্তু গাঢ় গলায় বললে, "তোমার এখনও অনেক শিখতে বাকি খুশি। (আপনি বাদ দিলেও অস্বাভাবিক লাগল না অমিয়র গলা) তুমি ভাবছ, জীবনটা খুব তাজা, না? তাই এখনও যা চাও, তা মন খুলে স্বীকার কর না।"

'আপনাকে তো আমি চাই না"—এত বড় স্পষ্ট জবাবটা ফস করে বেরিয়ে পড়ে

খুশির মুখ দিয়ে। তারপর কি মনে করে কথাটাকে যেন পরিষ্কার করার জন্যেই বলে "আপনাকে তো আমি চিনিই না অমিয়বাবু!"
অমিয় কষ্ট করে হাসল। এক ধরনের রুগ্ন মলিন হাসিতে তার মুখের রেখাগুলো বদলে যায়। নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্যে হাসতে গিয়ে আরও বেমানান দেখাচ্ছিল তাকে, আর এই অপ্রস্তুত অবস্থাটা কাটাবার জন্যে সে একটা পুরুষালী ধমক দিলে, "তুমি বড্ড বড় বড় কথা বলছ খুশি!"
খুশি দাঁড়িয়ে ওঠে। বেশ ঋজু দৃপ্ত ভঙ্গি। এ ধরনের ধমকে অমিয়র দুর্বলতা আরও পরিষ্কার হয়ে যায় তার কাছে। মেয়েদের সম্বন্ধে চরম বিতৃষ্ণার আড়ালে, এ ধরনের সস্তা মনোভাব তার কাছে অসহ্য লাগছিল। তার মনে হয়, এর চেয়ে দিলীপ অনেক সোজা, অনেক ভালো।
যাবার আগে এক মুহূর্ত মনুমেণ্টের পাশ দিয়ে সন্ধ্যের চৌরঙ্গীর দিকে তাকিয়ে, খুশি হঠাৎ নিজের মনেই বলে উঠল ফিস্‌ফিস্‌ করে, "আমি কি বারে বারেই ঠকব? বারে বারেই বোকা বন্‌ব?" তারপর তার উজ্জ্বল চাউনিতে অমিয়কে যেন পুড়িয়ে দিয়ে খুশি রাগে, দুঃখে কাঁপতে কাঁপতে বললে, "এত বড় বড় কথা বলতে পারেন অমিয়বাবু, আর সামান্য সত্যি কথাটাও বলতে শিখলেন না!" কথাটা বলেই মুখ ফিরিয়ে ট্রাম লাইনের দিকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।
বাসস্ট্যাণ্ডে ভিড়ের মধ্যে থেকে বাস ধরবার সময় খালি একবার থমকে দাঁড়ায় সে। কাছেই কোনও গ্রামোফোনের দোকান। রেকর্ডে মেমসাহেব কাতর গলায় গাইছে—

"প্লিজ থিঙ্ক অফ মি
হোয়েন ইউ আর লোন্‌লি,
থিঙ্ক অফ মি ওনলি!
প্লিজ থিঙ্ক অফ মি-ই-ই-ই—"

চোদ্দ

'কাল রাতে তোমায় স্বপ্নে দেখলাম। দেখলাম তোমার মুখখানা আমার মুখের খুব কাছে সরে আসছে। তারপর একরাশ শ্বেত করবী হয়ে গেল তোমার মুখ। আমি ভুল করেছি। বুঝতে পারি নি যে, যখন আমাদের দুটো পৃথিবী এগিয়ে

আসছে পরস্পরের অতি নিকটে, তখন তাদের জোর করে আরও কাছে টানতে গেলে ছন্দ যাবে কেটে। আমায় ক্ষমা কর খুশি।

তুমি আমাকে তিরস্কার করেছিলে, বলেছিলে, 'এত বড় বড় কথা বলতে পারেন, আর সত্যি কথাটা বলতে পারেন না?' মনে বিঁধে আছে সে কথা। কিন্তু আমার মুহূর্তের দুর্বলতা তো বড় কথা নয়। আসল ঘটনা তোমার কাছে তুলে ধরলাম। আমার পঁচিশ বছরের জীবনেই আমি এক বৃহৎ অরণ্য—দাবানলে যা পুড়ে খাক হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে আছি বৃষ্টিহীন আকাশের নীচে। তুমি আমার জীবনে বৃষ্টি হও খুশি। তোমার মধ্যে আছে যে সবলার দৃষ্টি আমার অভিজ্ঞতায় তা বিরল। তোমার মধ্যে যে এক অপরূপ নিষ্ঠুর বৈরাগ্যের সন্ধান পেয়েছি, তা আমার মনের সুরেই বাঁধা। আমাদের দুই পৃথিবী মিলতে বাধ্য।

সামনের রোববার সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে থাকব, তোমার অপেক্ষায়, এস। যদি বিরূপ হও, তাহলেও আমার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার মত সহজ দুর্বলতার ফাঁদে পা দেবে না আশা করি। ভালবাসা। —অমিয়

খুশি চিঠিটা পড়ে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলেছিল। ভেবেছিল ছিঁড়ে ফেলার সাথে সাথেই চিঠির কালি মন থেকে মুছে যাবে। কিন্তু গেল না। খুশি নিজেই তার এরকম অস্বাভাবিক দুর্বলতার কথা ভেবে আশ্চর্য হল। অহেতুকভাবে অমিয়র স্বপ্নময় চোখ, তার উদাসভাবে কথা বলার ভঙ্গি কেন মনের কোনায় উঁকি দিচ্ছে, তার কোনই যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেল না সে। বারবার সে নিজেকে নেড়ে চেড়ে দেখল। বারবার তার মনের সামনে এই তীক্ষ্ণ প্রশ্নটা তুলে ধরল, অমিয়কে কি সে ভালবাসে? কিন্তু মন সায় দিল না একেবারেই। অমিয়র অভিনয় সত্যিই তাকে বিরূপ করে তুলেছিল, সত্যিই তার সেদিনের ব্যবহার অশ্রদ্ধা এনে দিয়েছিল তার প্রতি কিন্তু চেষ্টা করেও অমিয়র স্মৃতি তাড়াতে পারল না খুশি নিজের মন থেকে। কলেজে অধ্যাপকদের ক্লান্তিকর লেকচারের নোট টুকল। দিলীপকে নিয়ে একটা বাংলা কাঁদো কাঁদো সামাজিক ছবি দেখে মাথা ধরাল। একটা রাত্তির হস্টেল থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়ে কয়েক ঘণ্টা বাবার মাথা টিপে এল। কিন্তু মনের পেছনে যে খোঁচাটা বিঁধে ছিল, বিশেষ করে অমিয়র চোখ, আর তার চিঠির শেষ লাইন মনের মধ্যে বিঁধে রইল। না গেলে দুর্বলতা দেখানো হবে, এই সান্ত্বনায় খুশি পরদিন আধ ঘণ্টা দেরীতে পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম থেকে নামল।

"আমি জানতাম, তুমি আসবে," প্রতীক্ষমান অমিয় বলে।

খুশি প্রথমে খুব একটা রাগের ভাব দেখাবার চেষ্টা করে গুম হয়ে থাকে কিছুক্ষণ।
অমিয় বললে, "রেগেছ ?"
"নাঃ রাগব কেন ?" দীর্ঘনিশ্বাসের মত কথাগুলো উচ্চারণ করে খুশি।
খুশি ভাবছিল তার নিজের কথা। খুব জমকালো ব্যাপার কিছু নেই। তবে আঠারো বছর বয়সে সে 'শেষের কবিতার' লাবণ্য হতে চেয়েছিল, তারপর বছর দুয়েক যেতে না যেতেই লাবণ্যকে মনে হল, নেহাত ন্যাকা, সুবিধাবাদী মেয়ে, নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবার প্রবৃত্তিসম্পন্ন স্ত্রীলোক মাত্র। তাকে যে প্রাইভেট টিউটর ব্রাউনিং পড়াতেন, তিনি যখন কবিতার মারফত তাঁর হৃদয়ের কথা জানালেন তাঁর ছাত্রীকে তখন খুশির বেশ বিশ্রী লেগেছিল। প্রেমের বিচিত্র গতির নামে যে একঘেয়ে রুটিন বাঁধাধরা হিসেবে তার কাছে হাজির হয়েছিল—কখনও কোনও সহপাঠীর চাউনিতে অথবা আকারে আভাসে তার ভেতর থেকে কোনও নবজীবনের ইঙ্গিত খুশি অন্তত খুঁজে পায় নি।
অমিয় চা খেতে খেতে সেদিন কোন চমকপ্রদ ব্যাপার নিয়ে আলাপ করলে না। কেন জানি তার মনে হল, এ ধরনের আলাপে সে যতই তার বন্ধুবান্ধবদের ভেতর প্রতিষ্ঠা লাভ করুক না কেন, খুশির কাছে সে ধরা পড়ে যাবে। আজকে যতক্ষণ তারা একসাথে ছিল, ততক্ষণ শুধু এক দৃষ্টিতে একজোড়া চোখ দেখতে লাগল খুশিকে, খুশির সমস্ত মুখ—কখনও উদাসীন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে। খুশির মনের যে স্বাভাবিক গতি, তার বিচার করার প্রবৃত্তি এমন কি তার শরীরে যে স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালন, তা যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। চেষ্টা করে স্বাভাবিক থাকবার জন্যে পা নাচাচ্ছিল খুশি। কিন্তু একটা তীব্র প্রতিক্রিয়ার মতই অমিয়র সেই দৃষ্টি তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে। মনটাকে ঝাড়া দিয়ে বারবার সচেতন হবার চেষ্টা করলে খুশি, কিন্তু বারে বারেই অমিয়র সেই আয়ত একজোড়া চোখ আরও রহস্যঘন হয়ে আঘাত করতে লাগল তার জোর করে বন্ধ করা মনের দরজায়। বাইরে বেরিয়ে এসে অমিয় তার স্বভাবসিদ্ধ উদাসীন গলায় বললে, "চল না খুশি কাল বেড়িয়ে আসব কোথাও !"
"কোথায় ?" খুশি তার তন্দ্রার ভেতর থেকে একটা অস্ফুট প্রশ্ন করলে।
অমিয় ভাবতে থাকে। গড়ের মাঠের কোণে হাঁটতে হাঁটতে ঘাসের ওপর সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, "ক্যানিং যাবে ? চমৎকার জায়গা।"
কি উত্তর দেবে ভেবে পাচ্ছিল না খুশি। তার ইতস্তত দোমনা ভাব দেখে বিদ্রূপে অমিয় ঠোঁট বাঁকাল, চোখ জ্বলে উঠল। বেশ চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বললে, "বুঝতে

পারছ না বোধ হয়, যাওয়াটা ঠিক উচিত হবে কিনা।"

খুশি সোজাভাবে জবাব দেয় না, বলে "না, গেলে আর মন্দ কি?" কথাটা বলার সময় নিজের কাছে নিজেকে ছোট লাগছিল খুশির।

ইংরেজরা যখন প্রথম সুতানুটি, গোবিন্দপুর এবং কলকাতা নিয়ে ষাট লক্ষ অধিবাসীর বর্তমান কলকাতার গোড়াপত্তন করলে তারই সমসাময়িক কালে ক্যানিং টাউন শুরু হয়। সাহেবরা ভেবেছিল, মাতলা নদীর মুখে বসাবে বন্দর। জেটি ডকের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। শুরু হয়েছিল পার্ক, প্রমোদ উদ্যান, বিশাল বিশাল প্রাসাদের প্ল্যান। পরে ইঞ্জিনিয়াররা আবিষ্কার করলেন, ওটা একটা খাড়ি মাত্র। তাই এক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, নদীতে পলি পড়তে লাগল ক্রমশ, লোনা জল ছাপিয়ে উঠল বাঁধ ভেঙে। তারপর সাঁওতাল আর মেদিনীপুরের চাষীরা বন কেটে ক্ষেত বসাল। জমিদারেরা বাঁধ কেটে দিয়ে আবার তাদের ক্ষেত ভাসিয়ে দিল যখন, তখন লোনা জলে তাদের নতুন ধানের চারা চেটে পুটে নিয়ে ভাগাড়ে জমির মত পতিত করে রেখে দিল তাদের জমি। আরও চড়া খাজনায় জমিদাররা সম্পন্ন চাষীর হাতে জমি তুলে দিলে তারা হল গৃহত্যাগী। এমনি ভাবে কলকাতার দক্ষিণের চাষীরা মাত্র এক ফসলের ক্ষেতে সারা রাত বাঁধ পাহারা দিয়ে, বাঘ-সাপের জঙ্গল কেটে, কখনও ভিক্ষে করে, কখনও লাঠির সামনে লাঠি ধরে দিন কাটাতে লাগল। সাহেবরা পালিয়ে গিয়েছিল তাদের ক্যানিং টাউন ছেড়ে। শুধু পড়ে থাকল তাদের জেটির ভগ্নাবশেষ, পার্কের বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনা। ক্যানিং টাউন বলতে আজ কয়েকটা বড় বড় চালের গুদাম ঘর, বাজার, ভোরের সময় কলকাতায় মাছ রপ্তানী করার সময় অসংখ্য নৌকোর সারি, নদীর পাশেই মণ্ডলদের চালের কল, সিনেমা হাউস, নদীর দু-পাশে দশ হাত উঁচু বাঁধের নীচেই সবুজ কচি ধানের চারা, গ্রাম আর শহরের একাকার একটি পরিবেশ।

ভোর ছটা-পঞ্চাশে ক্যানিং-এ যাবার ট্রেনে উঠেই অমিয় বুঝল, ভুল করেছে সে। তৃতীয় শ্রেণীর কামরাটিতে অসংখ্য লোকের ভিড়। বেশির ভাগই দক্ষিণে লোক। সামনে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক, মুখে প্রায় পনেরো দিনের দাড়ি, পানে ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত, অথচ সব সময়ে হাসিতে উজ্জ্বল মুখচোখ, হাতে মাছ ধরার একটা দীর্ঘ হুইল, থলিতে চার ও বঁড়শি। পাশের সহযাত্রীর সঙ্গে ট্রেন চলবার সাথে সাথেই সে অবিশ্রাম মাছের গল্প শুরু করলে।

পাশের লোকটি অপেক্ষাকৃত সম্রান্ত, দক্ষিণে লোক নয় বলেই মনে হয়। ফর্সা রং, বোধহয় জমিদারের নায়েব, তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে প্রথম লোকটি তার থলি

থেকে দু-তিন রকম বঁড়শি তুলে নাড়াচাড়া করে। কোনটার ডগা বেশি বাঁকা, কোনটার মুখ ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ।

একটা ভোঁতা মত বঁড়শি হাতের তেলোতে তুলে নিয়ে প্রথম ব্যক্তি মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তারপর নিজের মনেই বলে চলে, "সেবার সোনারপুরের এক স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে আলাপ। মাছ বলতে একেবারে পাগল। নিয়ে গেলেন সোজা বাড়িতে—কোনও কথাই শুনতে চাইলেন না। তিন রকম মাছ খাওয়ালেন তাঁর বৌ, নিজের হাতে রেঁধে। ওঃ, একরকম লম্বা লম্বা পারশে মাছের ঝাল করেছিল, সে যা মাছ!" লোকটি তার চোখ সরু করে নিজের তালুতে রাখা বঁড়শিটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, "সেদিন রাত্তিরেই বসলাম ছিপ নিয়ে। বাড়ির ঠিক পেছনেই পুকুর, সেয়ানা মাছ, শালা ঠুকরেই পালিয়ে যায়।

পাশের ভদ্রলোকটি এতক্ষণ পরে আকৃষ্ট হন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখ তুলে একবার তাকিয়ে বলেন, "কাতল, না?"

"কাতল নইলে এমন সেয়ানা হয়?" মাছের চরিত্রের উপযুক্ত সমঝদার পেয়ে লোকটির মুখচোখ একেবারে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আবার শুরু হয় তার গল্প, "সারা রাত বসে রইলুম, টুপ করে শব্দ হয় তো, তাকাই। চোখের পাতা নড়ে না। আকাশে মেঘ জমছে, তারপর বাতাস দিলে। গায়ের ওপর টপটপ করে বিষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। ভাবলুম, মিতের বৌ মাছ খাওয়ালে, আর আমি শুধু হাতে সকালবেলায় যাব তার কাছে!"

খুশি মন দিয়ে শুনছিল মাছের গল্প। মাছ নিয়ে যে এত বিহ্বল হবার ব্যাপার আছে, এমন পাগল হবার প্রশ্ন আছে, সে যেন জানলে প্রথম। অমিয় দু-তিনবার চেষ্টা করলে খুশির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। জানালার বাইরে তাকিয়ে বললে, "কী সুন্দর হয়েছে দেখেছ?" খুশি এক নজর বাইরে তাকায়। বর্ষার জলে চকচক করছে হোগলার বন, মাইলের পর মাইল জুড়ে সবুজ সাপের ফণার মত হাওয়ায় দুলছে। খুশি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়।

এতক্ষণে বেশ জমিয়ে নিয়েছে লোকটি, তার গল্পের শেষ অংশটা খুশির কানে এল, "তখন একেবারে শেষ রাত। বিষ্টি থেমেছে, একটা ফিকে চাঁদ উঠল, মিতের বাড়ির ওপর দিয়ে। ভৌ ভৌ করে কুকুর ডেকে উঠল পাশের চালাটা থেকে। আমার কেমন যেন মনে হল, এইবার পড়বে। কী বলব মাইরি, গা শিরশির করে উঠল। তারপর টুপ করে ডুবল ফাতনার ডগা।"

কেমন করে সেদিন একটি প্রায় আধমনি মাছ জল থেকে তুলেছিল, তার গল্প শেষ

করে, সামনেই বসা উৎসুক তরুণীটি ও সুসজ্জিত তরুণটির দিকে সে বেশ গর্বের সঙ্গে তাকায়। ট্রেনের দু-ধারে বিরাট বিরাট বিল, সকালের রোদ্দুরে চিকচিক করছে। জলের ওপর বক উড়ছে, চিল মাছে ছোঁ দিচ্ছে, একটা দুটো তালের ডোঙা ছবির মত স্থির হয়ে আছে বিলের বুকে। সেদিকে তাকিয়ে নায়েব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। এক তন্ময় বিষণ্ণতার আভায় তার প্রৌঢ় চোখদুটো ছলছলে দেখাল। "সেদিন কি আর আছেরে ভাই? সে মাছও নেই, সে মাছ ধরার লোকও নেই। তারা সব মরে গেছে।" লোকটি কথা শেষ করে মাথা নাড়াতে থাকে।

খুশি উৎসুকভাবে লোকটিকে দেখছিল। লাল চকচকে টাক, ঠোঁটের ওপর দিয়ে কাঁচা পাকা গোঁফ ঝুলে পড়েছে। বেশ ঘন জোড়া ভুরু ছিল বোধ হয় এককালে। এখন পাতলা হয়ে গেছে। ভদ্রলোক দুঃখ করেন, "সে সব মাছের গতর কি! তাঁদের শরীরই আলাদা। আমার এক কাকা মাছ ধরতেন। তিন দিন তিন রাত ঠায় ডোঙায় বসেছিলেন, মায় পেচ্ছাপ-বাহ্যে করতে ওঠেন নি; আর এখন চারবার করে চা চাই, হ্যানা চাই, ত্যানা চাই, কিছুই নেই হে, বুঝলে! সে মাছও নেই, মাছ ধরার লোকও নেই।" ভদ্রলোকটি অনেকক্ষণ তাঁর মাথা নাড়ান। চম্পাহাটি স্টেশন এলে দুজন লোক নেমে গেলেন।

অমিয় বললে, "বাঁচা গেল।" তারপর আর একবার কামরার লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে, বললে "এদিকে না এলেই পারতাম খুশি।"

পনের

ক্যানিং স্টেশন থেকে মাইল দেড়েক দূরে কুমারশা গ্রাম। কুমারশা আর রায়বাঘিনী একেবারে ঘেঁষাঘেঁষি;—একটি চোদ্দ-পনেরো হাত খালের ব্যবধান এই যা। রায়বাঘিনী ইস্কুল মানে একটা আটচালা, এ ছাড়া মদনের দোকান, বারো-চোদ্দ ঘর চাষী, ধান বিক্রি করে পয়সা মেরেছে এমনি এক জোতদারের একখানা মার্বেল-মোজাইক করা দোতলা বাড়ি, আর খালের দু-পাশ দিয়ে একেবারে মাতলার বাঁধ পর্যন্ত ধানের চারা। সকালবেলায় জাল ফেলে খালের ধারে চিংড়ি মাছ ধরা হচ্ছিল। একজন ফড়ে মদনের দোকানের সামনে একটা বাবলা গাছের স্বল্প ছায়ায় জেলেটিকে দাঁড় করিয়ে বললে, "কততে দিবি?"

জেলেটি বুনোদের ছেলে। তার বাবা ঠাকুর্দা ক্যানিং-এর চার পাশে ঘন জঙ্গল কেটে গ্রাম বসিয়েছিল। অবশ্য এখন তাদের নিজেদের কোনও জমি নেই। এখন সে জাল টানছে হাসিমুখে। একগাল হেসে চোখ কুতকুত করে চোদ্দ-পনেরো বছরের বুনো ছেলেটা বলে, "এখন যে বউনির সময় গো।"

"নে নে ঢাল" ফড়েটি নিজের হাতে ঝাঁকার ডালা খুলে উপুড় করে দেয় মাটির ওপর। প্রায় সেরখানেক তাজা চিংড়ি, নীল রঙের খোলা, ধুলো লেগে পাশুটে দেখায়। তার সঙ্গে বড় বড় আট-দশটা কই ঘাসের ওপর পড়ে লাফাতে থাকে। "কই গো বল, কতয় দেবে? আমায় আবার সকাল নটা ধরতে হবে। তোমার মত দাঁত দেখালে তো চলবে না আমার।" তারপর সে তার পাশের সঙ্গীটিকে বলে উঠল, "তোল, তোল।" সঙ্গীটি মনিবের কথায় গামছা খুলে মাছগুলো তুলতে আরম্ভ করে। চার পাশে এক নজর তাকিয়ে নেয় ফড়েটি। কোঁচড থেকে গুণে গুণে বারো আনা পয়সা বার করে। বুনো ছেলেটা ঘাড চুলকোয়। মাছের সঠিক দাম না জানা থাকলেও এটুকু তার ধারণা আছে মাইল-দেড়েক দূরে মাতলার ঘাটে এই ফড়েদের লোকই অন্তত চার টাকায় বেচবে মাছগুলো। কিছু না বলতে পেরে চোখ নীচু করে জালটা গুটোতে থাকে, তারপর হঠাৎ প্রাণপণে চেঁচিয়ে ওঠে, "তুলবেন না গো। আমি মাছ বিক্রি করব না।"

এমন সময় মদনের চালা থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। বছর চল্লিশ বয়স, বেশ খাঁটো চেহারা। ফড়েটাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে সে বললে, "মাছ কতয় দিচ্ছ গো?" এবার বুনো ছেলেটা কাতরভাবে বলে, "দুটো টাকার কমে দিতে পারব নি।" নিস্তব্ধ ফড়েটি এবার রাগে ফেটে পড়ল, "বলে দিচ্ছি, খারাপ হবে কিন্তু! সকাল-বেলায় বাণিজ্য করছি।"

এবার আগন্তুকটির সাদা চকচকে ছোট দু-পাটি দাঁত হাসিতে ঝিলিক মারে। মাথার ওপর খোঁচা খোঁচা চুলগুলো ডান হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে ডাক দেয়, "ও মদন, যা তো, তোর ছেলেটাকে দিয়ে পাঠিয়ে দে মোদের বাড়ি। বৌটার যা নোলা বেড়েছে! বলছি মাছ নেই পুকুরটায়, তবু সকাল থেকে ছিপ ফেলে বসে আছে।" এক টাকার দুখানা নোট খুঁট থেকে বার করে বুনো ছেলেটার হাতে গুঁজে দেয়। ফড়েটি এবার লোকটিকে চিনতে পারে। চাপা গলায় ফিসফিস করে বলে, "শালা অনিল মাস্টার।" রাগে থুথু ফেলে গামছা দিয়ে মুখ মোছে।

অনিল মাস্টারের মুখখানা তীক্ষ্ণ আনন্দে ঝকমক করে। মদনের দাওয়া থেকে নিজেই সিঁদুরে রঙের শালুক পাতায় মোড়া মাছগুলো নিয়ে বাড়ির দিকে অগ্রসর হয়।

প্রায় এগারোটা বাজে। বর্ষার পর চড়চড়ে রোদে স্নিগ্ধ মনোরম লাগে চারদিক। বাঁধের ওপরের মাটি সূর্যের আলোয় ধোওয়া শুকনো কাপড়ের মত দেখায়। তার ফাটলে ফাটলে পোকা খেতে বসেছে অসংখ্য সারস। নতুন জলে পুকুরগুলো প্রায় ক্ষেতের সাথে মিশে টলমল করছে। নীল শালুক ফুল মাথা তুলে আছে, গোলগোল সিঁদুরে পাতার ভেতর থেকে। অনিলের বাড়ির কয়েকটা হাঁস ক্ষেতের মধ্যে গলা ডুবিয়ে খাবারের সন্ধানে ঘুরছে। পালক সাফ করছে ঠোঁট দিয়ে। ওপরে বিস্তীর্ণ আধহাত রোওয়া ধানের চারাগুলোর ওপর ঝলমল করছে রোদ।

অনিল খুব আরাম বোধ করে। সে নিজে চাষীর ছেলে। তার বাপ এসেছিল মেদিনীপুর থেকে প্রায় বছর চল্লিশ আগে, আর এই দক্ষিণে মাটি, জল, হাওয়া এমনভাবে জড়িয়ে আছে অনিল মাস্টারের সর্বাঙ্গে যে, কলকাতায় গেলে ট্রামে-বাসে চলাফেরা করতে ইস্ত্রি করা সাদা শার্ট, পায়ে জুতো দিতে তার ভয়ানক অসুবিধেয় পড়তে হয়। বর্ষার সময় এক কোমর কাদা, শীতে আবছা চাঁদের আলোয় কান মুড়ি দিয়ে শিশিরে ভেজা সাঁকো পার হওয়া, মাতলার ওপারে বুনোদের গাঁয়ে গিয়ে, তাদের বিয়েতে নাচ দেখা, বাঁধ নিয়ে জোতদারদের সঙ্গে ফাটাফাটি করা, আর খেজুরের রস খেয়ে খালের ধারে দিগন্তবিস্তৃত ধানের দোল খাওয়া দেখে চোখ জুড়ানো—অনিল মাস্টার এখনও তার স্বভাবে ভয়ানক তরুণ। দুর্ভিক্ষ, স্বল্পবেতন, (সাড়ে বাইশ টাকা প্রতি মাসে, যদিও স্কুলবোর্ডের কৃপায় একসাথে পাঁচ মাসের ওপরও তা "হেল্ড ওভার" হয়ে থাকে) কলেরা, জোতদারদের সাথে মামলা, আই-বি আর পুলিসের কর্তাদের শাসন আর সর্বগ্রাসী বাঁধভাঙ্গা লোনা জল কিছুই অনিল মাস্টারের মনের তারুণ্যের কঠিন বর্ম ছেঁদা করতে সক্ষম হয় নি।

দাওয়ায় যখন অনিল উঠল তখন ভেতরের পুকুরটার পাড়ে একটা লাউমাচার নীচে বসে তার বৌ রমা ছিপ ফেলে চিংড়ি মাছ ধরছিল। অনিল যখন তার কাছে এল, তখন রমার দৃষ্টি কিন্তু ফাতনা ছাড়িয়ে বিশ-তিরিশ হাত দূরে তালগাছ-গুলোর ফাঁক দিয়ে বাঁধের ওপর নিবদ্ধ। দুটো লোক যেন নামছিল। কাছে এলে মনে হয়, সবুজ রঙের কাপড়টা লুঙ্গি নয়—শাড়ি, মেয়ে। শহরের মেয়েই মনে হল, আর তার সঙ্গে এক শহুরে বাবু। মেয়েটার আলের ওপর দিয়ে লাফিয়ে ওঠা নামা, ছেলেটির পিছনে পিছনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অনুসরণ করার প্রতিটি ভঙ্গি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছিল রমা।

অনিল এসে এক ঝটকায় ছিপটা টেনে নেয়। পাতায় মোড়া মাছের পুঁটলিটা রমার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বলে, "অনেক মাছ ধরেছ গো, এবার নাওতো

এগুলোর দিকে একটু কৃপাদৃষ্টি দাও।" রমা সেই একই ভাবে তালগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে স্বামীকে জিজ্ঞেস করে, "ওরা কে গো?" অনিলও তাকায় তার বৌ-এর দৃষ্টিপথে। ঠিক তালগাছ যেখানে শেষ হচ্ছে, তার পাশেই নলখাগড়ার বন সবুজ ঘন হয়ে আছে। অনিল সেদিকে একনজর তাকিয়ে ঠোঁট উলটে বলে, "এ আর নতুন কি। কলকাতার কোনও বাবু এসেছেন মাগী নিয়ে ফূর্তি করতে!"
"উঁহু"—রমা মাথা নাড়ায়।
অনিল পাতায় জড়ানো মাছগুলো বার করে। ভেতর থেকে একটা বঁটি আনে। তালের কালো গুঁড়িতে বাঁধা পিছল ঘাটের ধাপগুলোতে সাবধানে নেমে শেষ ধাপে জলের কোলে বসে মাছ ধুতে শুরু করে। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলে, "কলকাতার বাবু কেন? নিজের ছাত্তরের কথাই বলি। এই পরশুদিন বারোটার ট্রেনে কলকাতা থেকে ফিরছি। ঘুটঘুটে অন্ধকার, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাতাস দিচ্ছে। ভাবলুম মাঠের মধ্যে বাজ পড়ে মরব বুঝি। সাঁকোটা পার হয়েছি, এমন সময় আলোর পাশে কিসের এক ধ্বস্তাধ্বস্তির আওয়াজ পেলুম। টর্চ মারতেই দেখি দুটো মানুষের মাথা। হলপ করে বলতে পারি, ওপরের মাথাটা পরাণের। চাষার ছেলে—আই-এ পাশ করেছে, একেবারে বয়ে গেছে ছোঁড়াটা।"
বেশ নিপুণভাবে মাছগুলো কুটে খোলা ছাড়িয়ে ধুয়ে একটা কলাইকরা ঢাকনায় সেগুলো রেখে কাপড়ের খুঁটে হাতদুটো মুছে নিয়ে উঠে দাঁড়াল অনিল। দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে, "এরাও তেমনি কিছু তাল খুঁজছেন। দেখছ না, কী রকম ঘুরঘুর করছে নলখাগড়ার জঙ্গলের পাশটায়।"
"কী যা-তা বলছ?"—রমা বলে ওঠে। "দেখছ না, সেরকম মেয়ে বলে মনেই হয় না। কেমন চশমা পরেছে।"
অনিলের মুখে এসেছিল—ওরকম মেয়েদের কি চশমা পরতে নেই। কিন্তু খুব কাছেই তাদের আসতে দেখে থমকে যায়। এবার তাদের মুখের খাঁজগুলো পর্যন্ত নজরে আসে। প্রেম করার চেয়ে অনেক বেশি উদভ্রান্ত মনে হয় তাদের। মেয়েটির চুল উড়ছে হাওয়ায়। ঘামে নেয়ে উঠেছে, দূর থেকেও তা বোঝা যায়। পেছনের যুবকটির অবস্থা আরও শোচনীয়। এখনই বোধ হয় কাদায় আছাড় খেয়েছিল, ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া কাদা শার্টে, কাছায়। হাত দশেকের মধ্যে এসে পড়লে যুবকটির গলা শোনা গেল, "তোমার জন্যেই এ রকম হল। বললাম, স্টেশনের কাছে আমার বন্ধুর বাড়ি চল।" তার সুন্দর কপালের ওপর ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে। মেয়েটি কর্ণপাত করলে না। অনিল মাস্টারের চালের ওপরে

লাউ-এর লতা উঠেছে, তার পাশে বেগুন আর শশার ক্ষেত। সেদিকে একবার তাকিয়ে মেয়েটি এগিয়ে এল। ঠিক অনিল আর রমার সামনে এসে একটু ইতস্তত করে কাপড়ের খুঁটটা হাতে পাকাতে পাকাতে বললে, "আমাদের একটু জল খাওয়াতে পারবেন?"

অনিল মাস্টারের অতিথি-বৎসলতার খ্যাতি আছে। সে মাছ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আসুন ভেতরে।"

হাতচারেক উঁচু দাওয়ার ওপর অনিলের ছোট ছেলেটা খুঁটির সাথে বাঁধা জালের দোলনায় অকাতরে ঘুমোচ্ছিল। রমা ছুটো আসন পেতে দেয়। ঠাণ্ডা মাটির দাওয়ায় বসতে অনভ্যস্ত হলেও অমিয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কিছুক্ষণ পরে অনিল আসে। রমা ছুটো কানা-উঁচু থালা ভর্তি মুড়ি আর নারকেল-কোরা অমিয় আর খুশির সামনে নামিয়ে দেয়। খুশি ঢকঢক করে জল খায়, খুব সাগ্রহে থালাটা তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করে। অমিয়র এভাবে একথালা মুড়ি খাওয়া কোনও কালেই অভ্যেস নেই। খুশির এরকমভাবে খাওয়ায় সে একটু আশ্চর্য হয়। নারকেল-কোরাগুলো নাড়াচাড়া করতে থাকে আঙুল দিয়ে। এ অবস্থায় সাধারণত গাঁয়ের গরীব সজ্জন বিনয় দেখান, বলেন—গরীবের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, আমাদের কি সাধ্য আছে আপনাদের মর্যাদা করা। কিন্তু অনিল মাস্টার অন্যরকম। অমিয়র দিকে চেয়ে তীক্ষ্ম স্পষ্ট গলায় অনিল বলে, "আপনারা বিস্কুট-পাউরুটির ওপর মাখন মাখিয়ে খেতে অভ্যস্ত। স্টেশন-ঘাটে ওগুলো পাবেন।"

তার বৌ হেসে উঠল। অমিয়র সুন্দর, অসহায়, কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুখখানা দেখে তার মায়া হল। বলে, "কী যে বল! ওঁর বোধহয় তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে। আপনি একটু জল খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিন।"

খুশি খেতে খেতে দাওয়ার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকায়। কী বিস্তৃত বিপুল ধানে ভরা জলে জলাকার মাঠ, সমস্ত আকাশ ঝলমল করছে রোদে। যতদূর তাকানো যায়, শুধু আকাশ আর মাঠ। দাওয়ার নীচে জল এত পরিষ্কার যে কাদা, শামুক, গুগলি একনজরে চোখে পড়ে। মাচার তলায় শরীর টান করে একটা বেড়াল ঘুমোচ্ছে।

অনিলের মেয়েটিকে ভালো লাগে। শহুরে আলোকপ্রাপ্ত মেয়েদের সম্বন্ধে তার প্রচণ্ড অবজ্ঞা। তার মতে তারা না গাঁয়ের মেয়ে, না মেমসাহেব। তারা চুল ফাঁপাবে, শাড়ি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পরবে, একদিন চাকর-ঠাকুর না থাকলে, সংসার মাথায় করবে চেঁচিয়ে, কচি ছেলেকে বুকের ছুধ না দিয়ে পচা বাসি ফুড খাওয়াবে,

অথচ সন্ধ্যের পর বেরুতে চাকর সঙ্গে থাকা চাই। এর চেয়ে অনিলের মতে গাঁয়ের মেয়ে শত অংশে ভালো। তারা একসাথে ঢেঁকিতে পাড় দেয়, ছেলেকে মাই দেয়, রাত-বেরাতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলে যায়। কিন্তু খুশির চালচলনে ও কথাবার্তায় যে দৃঢ়তার ভাব ছিল অনিলের মত কাঠখোট্টাকেও তা মুগ্ধ করে।

খুশি অমিয়কে বলে, "এখান থেকে এই রোদ্দুরে দু-মাইল হেঁটে তোমার বন্ধুর বাড়ি যেতে পারব না বলে দিচ্ছি।" অনিলের দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে বলে, "কলকাতা থেকে এলাম আপনাদের দেশে। আপনারা কি না খাইয়েই ছেড়ে দেবেন?"

"আপনি না বললেও আপনাদের না খাইয়ে ছাড়তুম না। তা ছাড়া আমাদের বাড়িতে তো মাছ সব দিন হয় না। আজ সকালে একটা ফড়েকে জব্দ করে…" অনিল হাসতে হাসতে সকালবেলার গল্প শুরু করলে।

খুশি বলে, "আপনি তা হলে এখানকার খুব মান্য লোক।" অনিল খুশির কথায় লজ্জা পায়। রমাই প্রশ্নটার জবাব দেয়। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে, "ওদের সামনে লজ্জা পেয়ে আর কী লাভ!" তারপর খুশিকে বলে, "আমার তখন সবে বিয়ে হয়েছে। সেই লবণ আন্দোলনের সময়ের কথা। কী দিন গেছে। তখন উনি জেলে গেলেন। তারপর দুর্ভিক্ষ হল, এখানে অনাথ-আশ্রম খুললেন, কত গ্রাম গ্রামান্তরের লোকে যেত সেখানে!" অনিলকে ব্যঙ্গ করে বলে, "কতবার বলি ওকে, এবার কাউকে ধরে-টরে একটা মন্ত্রী হয়ে যাও। তা আমার যা পোড়া কপাল। এখনও লাঠালাঠি।"

অনিল মাস্টার এতক্ষণ নিজের সম্বন্ধে কথাবার্তায় বেশ অসোয়াস্তি বোধ করছিল। বৌকে থামিয়ে দিয়ে বললে, "ও সব ধানভানার গল্প ছাড়। এদের তো চান করার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের তো আর চানের ঘর নেই।"

খুশি একবার পুকুরটার দিকে তাকায়। ঘন কাঁঠালের জঙ্গলের পাশে দীর্ঘ শিরিষ গাছের ছায়া বুকে নিয়ে টলমল করছে জল। এককোণে নীল শালুকের ওপর ফড়িং উড়ছে। খুশি বললে, "আমায় একটা কাপড় দিন। ছেলেবেলায় যখন দেশে ছিলাম, তখন খুব সাঁতার কাটতাম। দেখি ভুলে গেছি কিনা।"

অমিয় এতক্ষণ চুপ করেছিল। কফি হাউসে, গড়ের মাঠের নিস্তব্ধতায়, পার্ক স্ট্রীটের আলোয় সে যেন আর এক খুশিকে দেখেছে। এ খুশিকে তার অপরিচিত লাগে। মনে হয়, অনেক কিছুই জানে না সে খুশির সম্বন্ধে, বোধহয় জানার প্রয়োজনও মনে করে নি। অনুযোগের স্বরে বলে, "তোমার দেশ কোথায় বল নি তো আগে।"

"বলি নি বুঝি? ফরিদপুর।"—মাথা দোলায় খুশি।

অনিল মাস্টারও স্বীকার করলে, খুশি সাঁতার জানে। এমনভাবে কোমরে কাপড় জড়িয়ে গা ঢেলে সাঁতার দিলে, শালুক তুলে মাথায় দিলে, হাত উঁচু করে মাঝপুকুরে ডুব দিয়ে কাদা তুলে দেখালে, শেষে এমন সহজভাবে সমস্ত গায়ের জল ঝরাতে ঝরাতে উঠে এল সে, যে এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে অমিয়র কাছে তার প্রতিটি ভঙ্গি যেন চড় মারতে লাগল। প্রথম থেকেই তার মনে হয়েছিল, এ অঞ্চলে আসাটা তার ঠিক হয় নি। গাড়ি ড্রাইভ করে খুশিকে পাশে নিয়ে অনায়াসে ডায়মণ্ডহারবারে যেতে পারত, ঝাউগাছের নীচে পাশাপাশি বসে ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে খেতে পারত, বেতের টুপি পরে স্ন্যাপ নিতে পারা যেত দুজনের। পরে সে ছবি তার টেবিলে সাজিয়ে রাখতে পারত সে।

খুশির কাছেও কথাটা মনে হয়েছিল, ক্যানিং-এর ট্রেনে চলমান জগতের যে ছোঁওয়া খুশির মনকে স্পর্শ করেছিল, সেটা কেন অমিয়কে আকর্ষণ করতে পারল না, বরং বিরূপ করে তুলল, তা ভেবে অবাক হল সে। গাঁয়ের জগতের সঙ্গে অমিয়র দূরত্ব মোটেই তাকে পীড়া দেয় না। কিন্তু এই ভেবে সে ক্ষুব্ধ হচ্ছিল, যে সব জিনিস স্পষ্ট, সহজ তা থেকে অমিয় কেন আনন্দ পায় না! দুপুরে মাটিতে মাদুর পেতে অনিলের বৌ-এর পাশে শুয়ে তার মনে পড়ল অমিয়র সেই চিঠিটা, যা কয়েক দিন আগে অসম্ভব সুন্দর মনে হয়েছিল। অমিয় সেই চিঠিটায় নিজেকে এক দাবানলে দগ্ধ বৃহৎ অরণ্যের সঙ্গে তুলনা করেছিল, কিন্তু কিছুটা অস্পষ্টভাবে হলেও খুশির কাছে এ কথাটা ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, অমিয়র এই প্রকাণ্ড জীবনতৃষ্ণার হয়তো সবটুকুই সত্যি নয়, কিংবা সত্যি হলেও মনগড়া।

দুপুরে শীতলপাটির আরামে ঠাণ্ডা দাওয়ায় তার দু-চোখ জুড়ে ঘুম আসছিল। ঘুমোবার আগে, সে অবাক হয়, কখন সে নিজের অজ্ঞাতে অমিয়র সঙ্গে অনিলের তুলনা করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। নিজেকে সে বারবার বোঝাতে চাইল, তারা দু-জগতের মানুষ; কিন্তু কি কারণে এই প্রচুর কাঠখোট্টা অনিল মাস্টারের কথাবার্তা তার মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছিল। একবার সে পাশে শোওয়া আধঘুমন্ত রমাকে জিজ্ঞেস করেই বসল, "আচ্ছা আপনারা কি ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন?"

আধঘুমন্ত অবস্থাতেও রমা হেসে ওঠে। ছোট ছেলেটাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে, আর এক হাত খুশির গলায় দিয়ে বলে, "আমাদের কি ভালবেসে বিয়ে হয়, আপনাদের মত? আমরা আগে বিয়ে করি, তারপর ভালবাসি।" ঘরের মধ্যে অকাতরে ঘুমোতে থাকে তিনটি প্রাণী—খুশি, রমা আর রমার ছোট ছেলেটা।

প্রায় তিনটে বেজে যায় খাওয়া শেষ হতে। বাইরে দাওয়ায় অনেক দিনের পুরনো

পাতাছেঁড়া সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' পড়তে পড়তে অমিয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাঠ থেকে গোরুগুলো ডাকতে ডাকতে গাঁয়ে এসে ঢোকে। অমিয়র ঘুম ভেঙে যায়। অনিল মাস্টারের বাড়িতে ঢুকতেই বিরাট গোবরের গাদার পাশ থেকে ধোঁয়া উঠছে। রমা উনুনে আগুন দিয়েছে। ধড়মড় করে উঠে বসে অমিয় ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা। তাড়াতাড়ি খুশিকে স্টেশনের দিকে যাবার জন্যে তৈরি হতে বলছিল। কিন্তু খুশি নিজেই চোখ মুছতে মুছতে হাজির হয় তার সামনে। বলে, "অনিলবাবু বলছিলেন, আজ রাত্তিরটা থেকে কাল ভোরের ট্রেনে যেতে।" অমিয়র উত্তর দেবার আগেই সে ভেতরে চলে যায়।

সন্ধ্যে হলেই অনিল মাস্টার খুশি ও অমিয়কে সঙ্গে নিয়ে বাঁধের দিকে বেড়াতে যায়। বাঁধের এদিকটায় দু-তিন বছর কোন সংস্কার না হওয়ায়, অনেক জায়গায় মাটি ফেটে হাঁ হয়ে আছে। বিকেলের আলোয় ম্লান আকাশের নীচে মাতলার জল অনেক প্রশান্ত মনে হয়। মনে হয় না, এ এক রাক্ষুসে নদী। জলের কোণ দিয়ে জেলেদের বড় বড় বজরা লোনা জলের মাছ, ভেটকি-চিংড়ি তোলবার জন্যে অপেক্ষা করছে, মাঝরাতে নদীর ভেতর গিয়ে জাল ফেলবে।

অনিল মাতলার জল যেখানে চিকচিক করছে বাঁধের ঠিক বাইরেই, সেই জায়গার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, "কী রাক্ষুসে নদী। জানেন, সারারাত জেগে জলের শব্দ শোনে এখানকার চাষী।"

"আচ্ছা এখানে সব জঙ্গল ছিল?" খুশি জিজ্ঞেস করে।

অনিল তখন তার গল্প শুরু করে। অনেকক্ষণ ধীরে ধীরে বলেও সে গল্প শেষ হয় না। কী ভাবে জঙ্গল কেটে জমির পত্তনি দেওয়া হল। যারা জঙ্গল কাটল তারা কেমন ভাবে চড়া খাজনায় জমি হারিয়ে বনল ভিখিরি, ফের বাঁধ কেটে দিয়ে লোনা জলের বন্যায় ক্ষেত ভাসিয়ে জমিদারেরা কেমন ভাবে গরীব চাষীদের উৎখাত করে আবার জমির পত্তনি দিল নতুন নতুন প্রজাকে; মাতলা, বিদ্যেধরী, পিয়ালী প্রভৃতি এ অঞ্চলের নদীগুলো কেন মজে যাচ্ছে, কেন হোগলার বন লকলক করছে দশ বছর আগেকার ফলন্ত ধানক্ষেতে—সুন্দরবন অঞ্চলের সেই কাহিনী খুশি অবাক হয়ে শোনে অনিলের মুখ থেকে।

পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে, সে যখন অমিয়র সঙ্গে যেতে সম্মত হয়েছিল, তখন কি সে জানত, যাত্রার ফল এমন হবে! সে ভেবেছিল, অমিয়র জীবনে একটা সন্ধ্যে হয়ে থাকবে, এই মাত্র।

পরদিন খুব ভোরের ট্রেনে যখন তারা কলকাতা রওনা হল, তখন অমিয়কে যেমন

বিমর্ষ মনে হচ্ছিল, খুশিকে তেমনি দেখাচ্ছিল অসম্ভব তাজা, যেন ভোরবেলায় বেলফুলের ঝাড়।

পাশে বসা অমিয়র উষ্ণ নিশ্বাস, তার স্বপ্নময় মেঘমেদুর চাউনি কিছুই যেন স্পর্শ করতে পারে না খুশিকে।

হোস্টেলে ফেরার পরই অমিয়র আর একখানা উচ্চাঙ্গের চিঠি পেল খুশি, তাতে সে লিখেছে, খুশিকে সে সম্পূর্ণ জানে না, খুশি তার কাছে এক রহস্যই হয়ে আছে ইত্যাদি। এবারে চিঠিটা ছিঁড়বার প্রয়োজন মনে করে নি খুশি। তবে টেবিলে অসাবধানে রাখা চিঠি হাওয়ায় উড়ে মেঝেতে পড়ায় পরদিন সকালে জমাদারনী ঝাঁট দিয়ে ফেলে দেয়।

কয়েক দিন চুপচাপ। হোস্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হঠাৎ চিঠি পেলেন, খুশি বাড়ি ফিরে যাবে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বর্ষিয়সী স্ত্রীলোক। খুশির মাত্র তিন মাস হোস্টেলে থাকায় মন্তব্য করলেন, "কেনই বা আসা, কেনই বা যাওয়া।"

বাড়িতে পা দিয়েই, খুশি দেখলে দিলীপ বসে আছে। খুশির সঙ্গে কয়েক দিন দেখা না হওয়ায়, সে অনুযোগ করে। খুশি সেদিকে কান দেয় না। কথার ফাঁকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, "বিলেত যাচ্ছ কবে দিলীপ?"

দিলীপ অবাক হল প্রথমে, তার পরে বিলেত গিয়ে কোথায় উঠবে, ইওরোপে কোথায় কোথায় বেড়াবে, তার একটা রঙচঙে তালিকা দিতে শুরু করে দেয়। খুশি তাকে আবার থামিয়ে বলে, "চল একটা সিনেমা দেখে আসি।"

"কোথায়?"

"যে কোন একটা কোথাও—"

চৌরঙ্গীতে বাস পৌঁছবার আগেই খুশির মুখচোখ অন্যরকম লাগছিল। সে যেন কী একটা বলতে চায়, কিন্তু চারপাশের লোকজনের জন্যে বলতে পারছে না।

বাস থেকে নেমে ঘাসের ওপর হাঁটতে হাঁটতে আস্তে আস্তে খুশি বললে "থাক না, আজ সিনেমা।" তারপর বেশ ঠাট্টার সুরে বলে ওঠে, "তুমি যখন বিলেত যাবে দিলীপ, তখন আমায় সঙ্গে নেবে না?"

দিলীপ দাঁড়িয়ে পড়ে। তার মুখে চোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে। তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না খুশির মুখ থেকে কথাটা বেরিয়েছে।

"তুমি কি সত্যিই বলছ, তুমি আমার সঙ্গে বিলেত যাবে?" উত্তেজনায় তার গলা কেঁপে উঠল।

খুশি শান্ত গলায় জবাব দেয়, "কেন যাব না?"

"তার মানে, তার মানে……" দিলীপ কথাটা কি ভাবে শেষ করে উঠবে, বুঝতে পারে না।

খুশি বলে, "বিয়ের কথা বলছ তো দিলীপ? আমার তো কোনও আপত্তি নেই। তবে আমি ভেবেছি তোমার বাবার মত-টতের ব্যাপার আছে হয়তো। হয়তো বা তোমার পক্ষে……খুশি যেন ইচ্ছে করেই কথাটা শেষ করে না।

দিলীপ এবার উত্তেজনায় সত্যিই কথা হারিয়ে ফেলে। অসংলগ্নভাবে বলে উঠল "আমার পক্ষে? কী বলছ খুশি? আমি তো বরাবর……বাবার মত আবার কি! কোনও মত-টত নেই ওঁর এ ব্যাপারে। আমি ভাবতাম……"

খুশি এবার হেসে ফেলে, শান্ত গলায় বলে, "তোমার মত থাকলে, চল না দিলীপ আজই ব্যাপারটা সেরে ফেলি!"

"আজই"—দিলীপ যেন আকাশ থেকে পড়ল।

"কিসের জন্যে ভাবছ? বল না, এখনই একগণ্ডা সাক্ষী জোগাড় করে দিচ্ছি। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি থাকে, তবে আলাদা কথা।"

"না না আপত্তি কি?" দিলীপ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। তারপর কি একটা বলবার জন্যে ইতস্তত করে।

খুশি বলে, "বড্ড তাড়াতাড়ি না?" তারপর নিজের কাছেই যেন সে জবাব দেয়, "আজ নয় কাল, বিয়ে তো করতাম।"

সে রাত্তিরে না হলেও কয়েক দিন পর খুশি আর দিলীপ বেশ সেজে-গুজে সুধাংশু-বাবু ও তাঁর স্ত্রীকে এক সাথে গড় হয়ে প্রণাম করলে।

আবার গোড়া থেকে

ষোল

হাশেম বলেছিল বিশেষ করে একটা বিষয় ভেবে দেখতে। সেটা হল পার্টিতে আসার ব্যাপার।

হাশেম বলেছিল, "এটা যেন একবারও আমরা না ভাবি আমরা কোনও অভাবিত ব্যাপার করছি; অথবা কারো পাল্লায় পড়ে কিছু করছি। কম বয়সে এদেশের বুদ্ধিমান ছেলেরা কিছু না কিছু রাজনীতি করে।"

"মেয়েদের প্রেমে-পড়া ছেলেদের চেয়েও সংখ্যার দিক থেকে দেশের প্রেমে-পড়া ছেলেদের সংখ্যা অনেক বেশি। কিন্তু আবার দেখা যায়, দেশের প্রেমে-পড়া ছেলেরাই সবচেয়ে সিনিক হয়ে পড়েছে উত্তর জীবনে, সবচাইতে জীবন সম্বন্ধে উদাসীন ও বীতশ্রদ্ধ হয়েছে তারাই। এভাবে রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পরবর্তী জীবনে পস্তাচ্ছে, এ-ধরনের চরিত্র রাস্তাঘাটে হরদম চোখে পড়বে। তার চেয়ে নিত্য তুই ব্যাঙ্কে বড় চাকরি কর, বিয়ে করে বৌকে ভালবাসতে চেষ্টা কর, কেয়ারি করে ফুলের বাগান বানা, বিলেত যা—তার একটা চরিত্র আছে। কিন্তু একটা মাঝামাঝি অসামাজিক জীব হয়ে বাঁচিস নে। সেটা বড্ড বিচ্ছিরি ধরনের বাঁচা।"

তা ছাড়া পার্টিতে এলেই তোর সমস্যা চুকেবুকে যাবে, পার্টির হাতে তোর যত ভাবনা ছেড়ে দিয়ে তুই মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াবি, জীবন তোর যাকে বলে গানের মত হয়ে উঠবে, এগুলো কবিতায় পড়তে ভালো লাগে, কিন্তু জীবন বোধ হয় আরও জটিল, আরও ফ্যাসিনেটিং। যেখানেই তুই যাস না কেন, সারা জীবন যেখানেই থাক না কেন, যদি সত্যিই বাঁচতে চাস তোকে ফাইট করতে হবে। নইলে আলাদা কথা।"

"তুই বাইরে থেকে যাদের ভাবছিস দেবতা, তারা অনেকেই ঠিক আমাদের মত, বেশ সাধারণ—সাধারণ ভুলভ্রান্তি, দুর্বলতা সব আছে। এর সঙ্গে সঙ্গে অনেক মর্মান্তিক ব্যাপারও আছে। যেমন মনে কর, তোর সততা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে।"

"আমার ব্যাপারটা তুই জিজ্ঞেস করবি জানি। আমি কখনও ভাবি নি কিছু ত্যাগ করছি। খুব একটা কিছু ছেড়ে ছুড়ে এসেছি এ ধরনের ভাবতে সত্যি হাসি পায়। হতে পারতাম চাচার মত—ব্যবসা ফেঁদেছেন; এম-এল-এ হয়েছেন বছর তিনেক হল। কিংবা আমার এক আত্মীয় ফিরোজের মত যে পাঁচ-ছটা ক্লাবের

মেম্বার, ঐ ধরনের কিছু একটা হতাম—এই তো!”

“গাঁয়ে যখন ছিলাম, তখন খালের ধারে আট বছরের যে মেয়েটা ডাবের খোলা নিয়ে খেলত, তাকে দেখে ঠিক বলে দিতে পারতাম, কোন ঘরে সে জন্মেছে, মেয়ে হবার সময় তার মায়ের অসুখ হয়েছে কিনা। লক্ষ্মীপুজোর দিন চাঁদ উঠলে, মাঠ পার হয়ে সিন্নি খেতে যেতাম এক মাসির বাড়ি। ছুটির দিন দুপুরে জলে পা ডুবিয়ে বুড়ো মাঝির সঙ্গে গল্প জমাতাম। এর একটা মানে ছিল, এক ধরনের আনন্দও ছিল। তারপর কলকাতা, কলেজ, চাকরি। চিনি না কাউকে। খুব ঘাবড়ে গেলাম। এমন বিচ্ছিরি ভাবা যায় না। রোজ সন্ধ্যেয় চাচার সঙ্গে ঘোড়ার টিপ নিয়ে আলাপ, আর মিঞা—মিঞা আমার এক আত্মীয়—এসেই শুরু করত মেয়েমানুষের গল্প। তারপর এল অন্যভাবে চিন্তা করা, একটু একটু করে ভালোলাগা। তবে কি জানিস, এ বিষয়ে মেক্যানিক্যাল না হওয়াই ভালো। এখানে কিছুই তৈরি করা নয়। খুব কষ্ট করে পেতে হয়। সেইজন্যে তোকে ভাবতে বলি।”

হাশেমের কথাগুলো নিত্য যে ভাবে নি, তা নয়, বরং অনেক রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেলে, ঘুম আসে নি কথাগুলো মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে। কিন্তু হাশেম মারা যাবার পর থেকেই, তার কাছে ব্যাপারটা আর একটু অন্য ধরনের মনে হতে লাগল। তার মনে হল, হাশেম তাকে হয়তে সত্যি কথার সবটুকু বলে নি।

সংশয় তো সকলের মধ্যেই আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, সংশয়কে জয় করা। হাশেম নিজে যে সংশয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে জিতেছে, সেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তার বন্ধুকে কি সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করেনি সে? আর এ সংশয়ের পাবই বা কোথায়? এ নিয়ে যতই নাড়াচাড়া করা যায়, ততই আগুনে ঘিয়ের ছিটের মত তা সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। মানুষের মঙ্গল করার ইচ্ছে বা স্বপ্নের বোঝা কতদিন একলা ঘাড়ে করে বওয়া যায়? নিত্যর মনে হল, তা সম্ভব নয়।

রাজনীতির জগতে আসবার প্রথম দিন যে ছেলেটি নিত্যকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিল, সে হল সুনীল সেন। তার কথাবার্তার মধ্যে এমন একটা চোখা ধারাল ভাব ছিল, যা নিত্যর মনে বেশ একটা ধাক্কা দিল। সুনীলের কথাগুলো তার বলার অনেকক্ষণ পর নিত্য যদি বিচার করত, তবে সে সম্বন্ধে কী ভাবত বলা মুশকিল। তবে সুনীলের কথায় চমকে এমন একটা দীপ্তি ঝলকে উঠত, যার আকর্ষণ দুর্নিবার মনে হত অনেকেরই। প্রথম দিনই তাদের একজন সহকর্মী ছাত্র আগামী পরীক্ষার কথা তোলায় খুব ঠাণ্ডা স্বাভাবিক গলায় সুনীল বলেছিল,—“বিপ্লবের পর আমরা পড়ব।”

মাস দুয়েক পরের কথা। কলকাতায় ছাত্ররা ভিয়েৎনাম-দিবস পালন করার জন্যে তৈরি হল। সেটা ছিল উনিশ শো সাতচল্লিশের প্রথম দিক। শীত একেবারে শহর থেকে যায় নি। একটু বেলা বাড়তেই নিত্য যখন কলেজ স্ট্রীটে এসে হাজির হল, তখন কুয়াশা সবেমাত্র কেটেছে।

"আপনারা কি দেখিয়াছেন হিন্দু সতী-সাধ্বীদের—তাঁহাদের সিঁথিতে সিঁদুর। আপনারা কি ইংরাজের সতীসাধ্বীদের দেখিয়াছেন? তাঁহাদের মাথায় লাল পাগড়ি।" নিত্যগোপালের মনে পড়ল অনেক কাল আগে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নায়ক কাগজে এদেশীয় পুলিস প্রসঙ্গে মন্তব্য। তারপর পাঁচকড়ি মরেছেন। যাঁরা ইংরেজের পুলিসকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছিলেন, তাঁরা অনেকেই পরলোকে। কিন্তু ইংরেজের পুলিস যেন ইংরেজ কবি টেনিসনের 'তটিনী' কবিতার মত। রাজারাজড়ার উত্থান-পতন তাকে স্পর্শ করে না।

সেদিন সকাল নটা থেকেই, ইউনিভার্সিটিকে মনে হচ্ছিল একটা দুর্গ। স্টীল হেলমেট মাথায় দিয়ে প্রায় শ-খানেক গুর্খা রাইফেল হাতে তিন-তিন সারিতে ডাবল মার্চ করে বেড়াচ্ছে। রাস্তার ওপারেই পুলিস-ভর্তি আমেরিকানদের ব্যবহৃত ওয়েপন-ক্যারিয়ার, তিনখানা প্রিজন্-ভ্যান, দুটো আর-ডবলিউ-এ-সি অ্যাম্বুলেন্স। এছাড়া লাল পাগড়ি ভর্তি চার-পাঁচটা লরি। অফিসাররা ফুটপাথের কোণে চেয়ার পেতে চা খাচ্ছেন। পরবর্তী কালে ব্যবহৃত রেডিও-ভ্যান তখনও চালু হয় নি। কাজেই লালবাজার থেকে মোটর সাইকেল ওপরওয়ালাদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে যাতায়াত করছিল ঘন ঘন।

প্রায় যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা। দোকানপাট সব আগে থেকেই বন্ধ। রাস্তাঘাট খাঁ খাঁ করছে, জানালা ফাঁক করে চলন্ত বাস থেকে উদ্গ্রীব জনতা এক-একবার গলা বাড়িয়ে দেখে নিচ্ছে ব্যাপারটা। প্রাইভেট কার ঘুরে যাচ্ছে অন্য রাস্তা দিয়ে। এক প্রচণ্ড চেঁচামেচির শব্দ আসছিল ইউনিভার্সিটির ভেতর থেকে।

"ভিয়েৎনামে ফরাসীরা গুলি চালিয়ে কয়েকটা লোককে মেরে ফেলেছে। বুঝলাম খুব খারাপ হয়েছে, কিন্তু তাতে তোমার আমার কী বাবা! কোথায় ভিয়েৎনাম, আর কোথায় কলকাতা!" একজন ছাত্র বলছিল। কালো ফ্রেমের চশমা পরা, পাতলা গড়নের যে ছেলেটি গতবার ইকনমিক্স সেমিনারে 'ক্যাপিটালিজম্ ক্যান লিভ উইথ এ নিউ ওরিয়েণ্টেশন অফ ন্যাশালিজম' নামে প্রবন্ধটা পড়েছিল, সে হঠাৎ নিত্যকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, "আমাদের বামপন্থী বন্ধুদের কি কোনও সেন্স অফ হিউমার নেই?" ইকনমিক্স হলের বাইরে দেওয়ালটা পোস্টারে পোস্টারে

ল্যাল হয়ে আছে। আঁকা বাঁকা হরফে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত লেখা—
"ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের হত্যার জবাব দাও" "দুনিয়ার ছাত্র-ঐক্য জিন্দাবাদ।"
ভীষণ ভীড়, গোলমাল, হট্টগোল—"আপনার বাপের সম্পত্তি ইউনিভার্সিটি?
কনুই দিয়ে ঠেলছেন কেন?" "একশোবার ঠেলব আলবত ঠেলব।"
ধর্মঘট হবে কি হবে না, এই নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে যে বচসা চলছিল, অদ্ভুতভাবে সে ঝগড়ার নিষ্পত্তি হয়ে গেল। কাছাকাছি ইস্কুলের ছেলেরা স্ট্রাইক করে ঠিক এই সময় দলে দলে হুড়হুড় করে ঘরে এসে ঢুকল। তাদের বেশির ভাগের বয়স দশ থেকে চোদ্দর ভেতরে। একদল তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে ইউনিভার্সিটি বিলডিঙের দোতলা তেতলায় উঠে সরু সরু গলায় চিৎকার করতে লাগল, "বেরিয়ে আসুন, বেরিয়ে আসুন, পুলিস জুলুম চলবে না।" ভিড়ের মধ্যেও সুনীলকে দেখে চিনতে পারা যাচ্ছিল। চশমার ভেতর থেকে চোখ জ্বলছে। সরু থুতনিটা শান দেওয়া ক্ষুরের মত ঝক ঝক করছে, আর দুটো চোখের মণি সর্বদা নেচে বেড়াচ্ছে হলের ছেলেমেয়েদের মুখের ওপর।
নিত্যরও অন্যরকম লাগছিল। তাই সুনীল যখন কাছে এসে ধীর গলায় বললে তাকে ক্লাস লেকচার দিতে, তখন সেও খুব অবাক হল না। চৌকির ওপর যেখানে চেয়ার-টেবিল সেই জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল নিত্য। তার লক্ষ্যে এল না যে, কেউ কেউ তার দিকে একবার তাকিয়েই নিজেদের মধ্যে গল্প করতে লেগেছে কিংবা কেউ তার দিকে উদাসীনভাবে তাকিয়ে আছে। সে প্রায় একটা গল্প আরম্ভ করলে—
"বন্ধুগণ, আপনাদের একজন আমায় বললেন, বামপন্থীদের মধ্যে কি সেন্স অফ হিউমার একেবারে নেই? আমার কি মনে হয় জানেন? আমার মনে হয়, আমরা সকলেই খুব চালাক হয়ে গেছি। কিন্তু আসলে দরকার জ্ঞানী হওয়ার।"
ক্লাসের মধ্যে একটা গুঞ্জন পড়ে গেল! একজন চেঁচিয়ে বললে, "এটা কি ফিলজফির ক্লাস না কি?" সুনীল পেছন থেকে চাপা গলায় বললে, "ও সব কথা এখানে বলবেন না। বলুন, কেন আমরা আজ রাস্তায় বেরুব?"
নিত্য মাথা নাড়াল অন্যমনস্কভাবে। সে যেন খুব বহুদূরের একটা স্বপ্ন দেখছে। ধীরে ধীরে বললে, "কেন আমরা আজ রাস্তায় বেরুব? তার কারণ আমরা যেখানেই থাকি না কেন, যদি আমরা সত্যি বাঁচতে চাই, তবে আমাদের ফাইট করতেই হবে। যদি আমরা লাইব্রেরির গুহার মধ্যেও থাকি আর রাস্তা দিয়ে মিলিটারি ট্রাক যায়, তবে তার ছায়া বই-এর পাতায় পড়তে বাধ্য।"
বলাই বাহুল্য, এ ধরনের কথাবার্তা কী অসম্ভব এবং বেকায়দাজনক। তবুও সুখের

বিষয় ছাত্রদের সেই জমায়েত নিত্যর কথায় খুব ধৈর্য হারায় নি। আর এক নিমেষে স্থনীল অবস্থাটা সামলে নিল, কোনও দিক থেকে টিটকিরি পড়বার আগেই সে নিত্যর পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে উঁচু গলায় বলতে শুরু করলে—

"বন্ধুগণ, আজ কেন আমরা রাস্তায় বেরুব ? আজকে আমরা রাস্তায় বেরুব তার কারণ এই যে, বর্বর ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েৎনামের ভাইবোনদের ওপর গুলি চালিয়েছে। কলকাতায় বসে আমাদের তার জবাব দিতে হবে, কারণ ব্রিটিশ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ এক এবং অভিন্ন। এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আই-এন-এর রশিদ আলি দিবসে, শত শত নরনারীকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। আজ সমস্ত এশিয়ায় আমরা প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদকে বলব, সাইগন কিংবা কলকাতা যেখানেই তুমি থাক না কেন, তোমাকে আমরা তাড়াবই…"

স্থনীলের বক্তৃতার শেষ দিকে হল প্রায় খালি হয়ে যেতে লাগল। নীচে ছেলে-মেয়েরা জমা হওয়ার পরেও একটা গোলমালের স্থষ্টি হয়েছিল। বিভিন্ন বামপন্থী দলের মধ্যে হাতাহাতি লাগবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু এবারেও স্থনীল সামলে দিল। ভিড় ঠেলে সামনের ছেলেটার হাত থেকে মাইকটা প্রায় কেড়ে নিয়ে, গম্ভীর আওয়াজে ঘোষণা করলে, "বন্ধুগণ, এইমাত্র ছাত্রদের এক মিছিল পুলিস কলুটোলার মোড়ে আটকে দিয়েছে। এর জবাব কি আপনারা ঘরের মধ্যে বসে দেবেন ?"

এই ঘোষণার পর সমস্ত ভিড়ের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল। মাইকের সামনে ছেলেদের প্রত্যেকের মুখের খাঁজগুলো শক্ত হয়ে যায়। প্রচণ্ড স্লোগান দিতে দিতে ইউনিভার্সিটির গেটের দিকে চলতে শুরু করে মিছিল। বেলা এগারোটার রোদ্দুর কলেজ স্কোয়ারের জলে চিকচিক করছে। খুব পরিষ্কার আর নির্জন দেখাচ্ছিল কলেজ স্ট্রীট।

মিছিলের মাথা নামল। সবার আগে স্থনীল। একটা ছাইরঙের জহরকোট, লম্বা দোহারা গড়ন ; তলোয়ারের মত জ্বলছে।

কয়েকজনের পরেই নিত্য। তাকে শান্ত দেখায়। নিত্যর আনন্দ হচ্ছিল, কারণ সে আজ বক্তৃতা দিয়েছে, আর তার মনে হল বিশেষ করে এতদিন পর সে হাশেমের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ইউনিভার্সিটির গেট থেকে ছাত্রদের মিছিল রাস্তায় পড়ে ফাইল করবার সাথে সাথেই লাঠিচার্জ শুরু হয়। আর প্রত্যেকবারই যেমন ডিরেকশন থাকে, ("সাবধান, কখনও ওভারহয়েলমড্‌ হয়ে পড়ো না"), সেই ডিরেকশন মত বেশ প্রফুল্ল মনেই

লাঠি চালায় পুলিস। আচমকা লাঠির চোটে একটা পচা কাপড়ের মত ফরফর করে ছিঁড়ে যায় মিছিলটা। হুড়মুড়িয়ে কতকগুলো মেয়ে খাতাপত্তর নিয়ে খোলা হাইড্রেন্টের ওপর আছড়ে পড়ে। সামনের চাপটা তবুও ভাঙে না দেখে, সার্জেন্ট আর অফিসাররা এগিয়ে যায় সেদিকে। মাথা ফাটার পরও স্থনীল সেন দাঁড়িয়েছিল। তার কাঁধ বেয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। খুব লম্বা দেখাচ্ছে স্থনীলকে, যেন একটা তাল গাছ ঝড়ে দুলছে। দ্বিতীয় চার্জ-এ সে পড়ল। হঠাৎ কোথা থেকে বেলুন ফাটার মত ফটফট আওয়াজ হয় আর দমবন্ধ করা কেমন একটা গন্ধ সমস্ত কলেজ স্ট্রীটে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। "গ্যাস"···"টিয়ার গ্যাস"···"জল"···"জল···" পোঁ-পোঁ—সর-র-র···। লাল লম্বা টিয়ার গ্যাসের শেল মাথায় ওপর থেকে পড়তে থাকে। পুরু ধোঁয়ার ভেতর চোখ রগড়াতে রগড়াতে দৌড়োদৌড়ি করতে থাকে ছেলেমেয়েরা। কনফার্মড হন নি এমনি একজন বাঙালি সার্জেন্ট তাঁর ওপরওলাকে সামনে দেখে একখানা স্থন্দর জাম্প মারলো—রাস্তায় গড়িয়ে পড়া একটা ছেলের ওপর। ইট পড়তে থাকে। বেশির ভাগ লক্ষ্যভ্রষ্ট ইটে অবশ্য রাস্তাই লাল হয়।

পুলিসের বড় অফিসার টহল দিচ্ছিলেন। ইটের ঝড় সেদিকে আসতে আরম্ভ করে। একটা ওয়েপন্-ক্যারিয়ারের পাশে এসে দাঁড়াতেই হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল একটা বারো-তেরো বছরের ছেলে, একলা সিনেট হলের সিঁড়ির মাথার ওপর দাঁড়িয়ে—হাতে একটা থান ইট। চায়ের কাপটা নামিয়ে তিনি রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছে সেদিকে আঙুল দেখিয়ে অর্ডার দিলেন, "শুট!" চারটে গুর্খা পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ফাইল করে দাঁড়ায়, তারপর থ্রি-নট-থ্রি রাইফেলের ক্লেজ রেঞ্জে ফায়ার শুরু করে। ছেলেটা যখন গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছিল সিঁড়ি দিয়ে তখনও চলতে থাকে গুলি।

এদিকে কলুটোলা থেকে একটা মিছিলের আওয়াজ আসে। পুলিসের একটা মস্ত বড় দল অর্ধবৃত্তাকারে রাস্তার মোড় ঘিরে দাঁড়ায়। সমস্ত রাস্তা জুড়ে মিছিলটা আসে লাফাতে লাফাতে। এক হাতে খাতা আর এক হাতে মস্ত বড় কাঠের এল মাথার ওপর তুলে মুহূর্তের মধ্যে এসে পড়ে ছেলের দল। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেরই ছেলেরা বোধ হয়।

গুর্খা পুলিশ পুতুলের মত সার দিয়ে দাড়ায়। সমস্ত মুখই প্রায় একরকম—শুধু একটু বেশি লাল দেখাচ্ছে মুখগুলো। আর সে মুখে যেন চোখ নেই, কোন ভঙ্গি নেই। রবারের মূর্তির মত হেলমেটের তলায় রাইফেল হাতে নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে থাকে।

আবার ধোঁয়া, হুড়োহুড়ি, তারপর সমস্ত অস্পষ্ট গোলমালের ওপর কানে তালা লাগিয়ে গুলির আওয়াজ। বাতাসে শুধু টিয়ার গ্যাসের গন্ধ। রাইফেল গর্জাতে থাকে। নিত্য কোমরে লাঠির গুঁতো খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। চোট অবশ্য খুব লাগে নি। স্ট্রেচারে করে যখন তাকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হল, তখন সে ভাঙা ভাঙা গলায় কি একটা অস্পষ্ট সুর ভাঁজছে।

জ্বর এল হাসপাতালে। একের পর এক—তিনটে রাত আগুনের মত কেটে যায় কোথায়, কোন দিক দিয়ে। কারা এসে দেখা করে, হাসপাতালে ভাই-এর হাত ধরে সত্যগোপাল ভেঙে পড়েন, এসব কিছুই খেয়াল নেই তার।

তিন দিন পর যখন সে চোখ খুলল, তখন চারদিক ঝলমল করছে সকালের আলোয়। বোধ হয় নটা বাজে। বারান্দা দিয়ে চোখে পড়ে একটা রাধাচুড়োর গাছ, তার মাথাটা জ্বলছে হলদে ফুলে।

নিত্য সেদিকে তাকিয়েছিল। এমন সময় খুট খুট করে কাছে জুতোর হিলের শব্দ আসে। বেশ একটা ফুটফুটে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্স, হেড-ড্রেসটা তার কচিমুখে বড্ড বেখাপ্পা লাগছিল। এসেই সে একটু মুচকি হেসে নিত্যর দিকে চেয়ে বলে, "ও! মিস্টার ইউ আর এ পোয়েট! ইউ টকড পোয়েট্রি থ্রি নাইটস!"

এবার বেশ বে-কায়দা মনে হয় নিত্যর। প্রত্যুত্তরে একটু হেসে পাশ ফিরে শুতেই চমকে যায় সে। পাশের বেডেই মান্তা—পুষ্পদির ছেলে। পুষ্পদির আর এক নাম নয়ন। হরেনের মারফত কয়েক মাস হল আলাপ হয়েছে পুষ্পদির সঙ্গে—চেতলায় বাড়ি। নিত্য অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তুই এখানে?"

"দেখলাম রাস্তায় আপনারা পুলিস পেটাচ্ছেন। আমিও নামলাম। এমন একটা ঝেড়েছে পায়ে—" অশ্রাব্য খিস্তি করলে মান্তা।

নিত্য বললে, "তোদের বাড়ি যখন যাই, তখন যে বড় পালিয়ে যাস! কাছে আসিস না।"

কোঁকড়া কালো চুল, বছর ষোল-সতেরো বয়স হবে, মান্তা তার মাথার চুল ঝাঁকিয়ে বলে, "তুমি হরেনের সাথে যাও, চাঁদা আদায় করো, ওসবের মধ্যে আমি নেই। আমি আর্টিস্ট, গানবাজনা করি।" তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, "তুমি একবার মাকে বলো না, তুমি বললেই হবে।"

"আমাকে আবার কি বলতে হবে?'

"সব জোগাড় করে রেখেছি নিত্যদা, বম্বে যাবার জন্যে; তুমি মাকে একবার বলো। ফিল্মে না গেলে আমার হবে না। দুটো গান কম্পোজ করেছি। একদিন সকাল

সকাল এস না, বাবা যখন বাইরে থাকবেন।"

নিত্য পাশ ফিরে শুলো। তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে মাস্তা বলল, "আমি বলে রাখছি, যদি বম্বে না যেতে দেয় তবে—"

"তবে কি করবি?"

"পালাব"—মাস্তা জবাব দেয়।

সতের

মাস্তার বাবা গুরুচরণ ঘোষ হরেনের দূর সম্পর্কের মেসো। চেতলায় বাড়ি। আলিপুর কোর্টে ওকালতি করেন।

মানুষটা বেঁটে খাটো। তার ওপর বেশ চিমড়েপড়া শরীর। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবার মত চেহারা। বছর পঞ্চাশ বয়স। চোখে পড়ার মধ্যে এক জোড়া চোখ, যা কোথাও একদিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না—সব সময় এদিক-ওদিক করছে। পশার ভালোই। শোনা যায় পাড়ায় কিছু তেজারতি কারবারও আছে। বিড়ি খান এবং একটা তেলচিটে লালরঙের রঙ-ওঠা লুঙ্গি আর পিঠের কাছটায় ছেঁড়া জালিকাটা গেঞ্জি পরে বৈঠকখানায় মক্কেলদের সঙ্গে দেখা করেন। কেউ যদি সাজ পোশাকের দিকে নজর দিতে বলে, তবে এক ঢালা জবাব দেন, "চেনা বামুনের পৈতে লাগে না।"

পুষ্পদি ঠিক উল্টো না হলেও, অনেক আলাদা। বয়সের তুলনায় বেশ থলথলে। পঁয়ত্রিশ পার হলেও বাইরে অচেনা লোকের সামনে কথা বলতে গিয়ে এখনও কাপড় খসে পড়ে মাথা থেকে। পাশের বাড়ির মেয়েরা দল বেঁধে কালিঘাটে স্নান করবার জন্যে তাঁকে পীড়া-পীড়ি করে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছে। পুষ্পদি একটুক্ষণ আলাপ হবার পরই ছোটবেলায় যখন তাঁরা বিক্রমপুরে থাকতেন, তার গল্প ফেঁদে বসেন। বলেন, "মাগো, এ নালাতে কে স্নান করবে? হাঁসাড়ায় আমাদের নদীর ঘাটে কী পরিষ্কার জল, একেবারে তল দেখা যায়।"

তাঁদের ছেলে মাস্তা কিন্তু কারও মত হল না—না বাপের মত, না মায়ের মত। সাত বছর বয়সে যখন মাস্তা দেশলাই-এর বাক্স দিয়ে একটা ইঞ্জিন বানিয়েছিল,

তখন গুরুচরণবাবু ভেবেছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার হবে ছেলে। কিন্তু ক্লাস নাইনে উঠেই স্কুলের ল্যাবরেটরিতে নতুন কেনা ব্যারোমিটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ঝেড়ে দিয়ে সবাইকে বিস্মিত করলে মান্তা। আরও বিস্মিত হল সকলে, যখন সে পাড়ায় গানের ক্লাব বানাল, এখানে সেখানে গান করে রাত-বেরাতে ফিরতে শুরু করলে। তারপর সত্যিই এক কাণ্ড বাধায় মান্তা। তিন-চারখানা বাড়ি পেরিয়ে এক ক্লাস এইটে-পড়া বছর ষোলর এক মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়ে গেল। তাড়াতাড়া চিঠি লেখা শুরু হল। খালসা পার্কে ঠিক চারটের সময় একটা নির্জন বেঞ্চিতে দুজনে রোজ দেখা করত! তারপর একদিন পুলিস সাহেব খাকি হাফপ্যাণ্টের পাশে আঁটা রিভলবারটা মান্তার চোখের সামনে নাচিয়ে বললেন, "তোমাকে শুট করব, যদি এ রাস্তায় পা বাড়াও।" মান্তা তারপর পুষ্পদির মায়ের দেওয়া একছড়া তিন ভরি সোনার হার নিয়ে সোজা বম্বে। সেখানে জেটি থেকে এক সাকরেদের সঙ্গে আলাপ করে তিন টিন ঘি সরিয়েছিল বলে জেলে যেতে হল। শেষে গুরুচরণবাবু শ-তিনেক টাকা টি-এম-ও করে দেবার পর মান্তা ফিরে এল, আগের চেয়ে বেশ একটু মোটা হয়ে। ভিয়েৎনাম দিবসের ধকলটা কাটতে প্রায় মাস দুয়েকের ওপর লেগে গেল। সপ্তাহে দু-দিন করে হাজিরা দিতে হত। এমনি চলল বেশ কিছুদিন। একদিন সকাল সকাল নিত্য বাড়ি ফিরে দেখে, হরেন এসে লিখে রেখেছে, মান্তা আবার তিন দিন হল পালিয়েছে। পুষ্পদি অস্থির হয়ে পড়েছেন। সে যেন একবার দেখা করতে যায়। নিত্য যখন চেতলায় এসে পৌঁছল, তখন বিকেলের আলো একেবারে যায় নি। ছোট্ট অনেককালের একতলা বাড়ি। বাড়ি ভাড়া দেবার জন্যে দু-ভাগে ভাগ করা। ভেতরের দিকে উঠোনে বাগান, এখনও খাটা পায়খানা যায় নি। পায়খানার পাশে একটা মস্ত কাঁঠাল গাছের ছায়ায় আরও অন্ধকার লাগছিল সামনের বারান্দাটা। নিত্যর মনে হল, ঘরখানা থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে। দু-বার জোরে জোরে কেশে উঠল সে। চোখ মুছতে মুছতে পুষ্পদি উঠে এলেন।

"আপনার জ্বর হয়েছে নাকি পুষ্পদি ?" অবাক হয়ে নিত্য জিজ্ঞেস করলে। একেবারে অন্যরকম লাগছিল পুষ্পদিকে। টানা টানা চোখ ক্লান্তিতে প্রায় আধবোজা। চুলগুলো জট পাকিয়ে ঘোমটার বাইরে কানের পাশে জড়িয়ে গেছে। মুখটা শুকিয়ে গিয়ে ছোট দেখাচ্ছে। দরজার কোণ ধরে দাঁড়িয়ে পুষ্পদি বললেন, "এস।"

ঘর দুখানা একেবারে মাপা। লম্বায় সাত হাত, চওড়ায় ছ-হাত। বাড়িওলার ছেলে একটা এয়ারগান দিয়ে মেঝের ওপর পাখি মেরেছিল। তার ফলে সারা মেঝেটার বুকে সাদা সাদা ক্ষতের মত গর্ত হয়ে আছে। লেপ-কাঁথা রাখবার

জন্যে দু-তিনখানা তক্তা দিয়ে তৈরি একটা কাঠের দোলনা মাথার ওপর থেকে এক বিঘত উঁচুতে ঝুলছে। একটা আলনার প্রথম তাকে মান্তার একখানা ধুতি গোঁজ হয়ে আছে। দ্বিতীয় তাকে কয়েকটা কলার মোচড়ানো শার্ট। একপাটি সবুজ রঙের উলের মোজা এই গরমের দিনে আলনার শেষ তাকটার শোভা বর্ধন করছে। পুষ্পদির শাশুড়ি নাক টিপে আহ্নিক করছিলেন ঘরের এক কোনায়। নিত্যকে নিয়ে পাশের ঘরে এলেন পুষ্পদি। ঘরের একমাত্র জানালাটা টানাটানি করে খুলে একটা পাখা নিয়ে এলেন হাতে করে।

"বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতেই আছে কোথাও নিশ্চয়ই—" নিত্য ঘরে বসেই সান্ত্বনার সুরে বলতে আরম্ভ করলে। পুষ্পদি উত্তর দেন না, ক্লান্তভাবে চেয়ে থাকেন খোলা জানালার দিকে।

নিত্য অবাক হল পুষ্পদির এরকম মর্মাহত ভাব লক্ষ্য করে। মান্তা তো একবারই পালায় নি, অনেক কীর্তিই তো সে করেছে। আবার সে পুষ্পদিকে সান্ত্বনা দেয়, "মান্তা যে-সে ছেলে নয়, ও ঠিক চালিয়ে নেবে। ওর জন্যে ভাবনা কি ?"

পুষ্পদি নিত্যর কথায় শুধু 'হু' দিয়ে একটু সাড়া দেবার চেষ্টা করেন। খোলা জানালা দিয়ে হাওয়ার সাথে সাথে জলের ছিটে আসে। বিকেল থেকে যে মেঘ জমেছিল আকাশে এখন বোধ হয় তা ভাঙতে শুরু করল। নিত্য উঠে গিয়ে জানালা বন্ধ করতে যাচ্ছিল। পুষ্পদি বললেন, "থাক না" তারপর বাইরে গিয়ে একটা লণ্ঠন নিয়ে এলেন।

নিত্য মান্তার কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। পুষ্পদির কথায় তার সম্বিত ফিরে এল। "মাঝে মাঝে মনে হয়, একটা চ্যালা কাঠ দিয়ে নিজের মাথায় বাড়ি দি। সব ঝঞ্ঝাট চুকে যায়"—কান্নার পর গলার আওয়াজ যেরকম বসা বসা হয়, সে রকম লাগে পুষ্পদির গলা।

"ওরকম ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, পুষ্পদি ? এদিক সেদিক কোথাও আছে মান্তা"—নিত্য আবার বলে।

সমস্ত মুখখানা এবার ব্যথায় কুঁচকে গেল পুষ্পদির। বললেন, "তার কথা সে ভাবুক গে। ওরকম ছেলে থেকেও কী, না থেকেও কী।"

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পুষ্পদি বললেন, "পাঁচ দিন থেকে জ্বরে পড়ে আছি নিত্য—একফোঁটা ওষুধ নেই, এতটুকু পথ্যি নেই। এখনও জ্বর আছে গায়ে। বিশ্বাস না হয় দেখ"—পুষ্পদি একখানা হাত বাড়িয়ে দেন। নিত্য অবাক হয়, হাত পুড়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বলে, "আপনি শুয়ে থাকুন পুষ্পদি।"

"শুয়ে থাকব?"—এবার গলার স্বর বিকৃত শোনাল পুষ্পদির। বললেন, "শুয়ে পড়লে গিলতে দেবে কে? এতগুলো টাকা রোজগার করে, অথচ কী অদ্ভুত লোকটা। মরতে বলেছিলাম, একটা লোক রাখতে একটা দিন অন্তত। জান, জানালায় তার কোট ঝোলান থাকে। আমাকে ধারে কাছেও ঘেঁষতে দেয় না, পাছে আমি চুরি করি। মান্তাটাকে এক পয়সা দেয়? কেন বখে যাবে না! একটা পয়সা কখনও হাত খরচ দেয় না ছেলেটাকে। পাড়ার যত গুণ্ডা আর মাতালগুলোর সাথে মিশছে, ভাঙ খায়, বিড়ি টানে, অন্যের পয়সায় এটা-সেটা চলে।" তাড় তাড়ি উত্তেজনায় কথা বলে হাঁপাতে থাকেন পুষ্পদি। আঁচল দিয়ে ঠোঁট আর চিবুক মোছেন বারবার।

বাইরে বৃষ্টি ধরে এসেছে। জানালার ঠিক নীচেই পিচ-ঢালা রাস্তায় এবড়ো খেবড়ো গর্তগুলো হলুদ ঘোলাটে জলে ভরে গেছে। ভারী বোঝা ভর্তি একখানা মোষের গাড়ি মন্থর গতিতে চলে গেল। মোষগুলোর পিঠ চকচক করছে গ্যাসপোস্টের আলোয়। একটা মশা এসে লণ্ঠনের ওপর উড়তে লাগল পোঁ পোঁ করে। নিত্য একটা চাপড় মারে। মশা মরল না, উড়তে উড়তে বেরিয়ে গেল।

"আমার বিয়ে হল তেরো বছর বয়সে। তখন কি ছাই জানতাম বিয়ে মানেটা কি! বড় হয়ে ভাবতাম, বিয়ে কেন করে লোকে? কেন তার আগেই মরে যায় না!"

নিত্য একথায় কী উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে বললে, "আপনি আজ শুয়ে পড়ুন, জ্বর গায়ে কথা বলবেন না।"

পুষ্পদি নিত্যর কথা শুনতে পেলেন না। বললেন, "শ্বশুর বাড়িতে এসে জানতে পারলাম, আমি কালো, আমার স্বভাব-চরিত্র খারাপ। সে সব কথা যাক। বাইশ বছর হল বিয়ে হয়েছে আমার। এত বড় ছেলের মা হয়েছি এখনও যদি কোনও পুরুষ-মানুষ ওঁর অবর্তমানে বাড়িতে এসে পড়ে তাহলেই আমি হয়ে যাব খারাপ মেয়ে লোক। এতগুলো বছর কি মিছিমিছি ছাইয়ে ঘি ঢাললাম?" তারপর দম নিয়ে কিছুটা আত্মস্থ হয়ে নিজের মনে আস্তে আস্তে বলেন, "আর পাঁচুগোপাল তো ডাক্তার মানুষ। একদেশে বাড়ি, আমার চেয়ে অনেক ছোট। আমার অসুখ শুনে নিজেই ছুটে এসেছিল। তাতেই এত!"

পুষ্পদি সত্যই সেদিন কেঁদেছিলেন, মান্তার জন্যে নয়, তাঁর নিজের কথা ভেবে। সারা রাত সারা দিন এই ভেবে তোলপাড় হয়েছেন যে এ সংসারে কি এতটুকু দাবি নেই তাঁর স্ত্রী বলে, মা বলে—নেহাত একটা মানুষ বলে? ব্যাপারটা যে এরকম দাঁড়াতে পারে ধারণাই ছিল না তাঁর। মান্তা সাত দিন হল অদৃশ্য। পাঁচ দিন

আগে জর আসে তার। তিন-চার দিন হেঁসেল ঠেলে পরশু দিন সকালে জ্বরের ঘোরে আতুরে গিয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। গুরুচরণের মা খুব ভোরে গঙ্গাস্নান করে ঘরে এসে বললেন, "ও মা বউ এর ঢঙ দেখে বাঁচি না। এত বেলা পর্যন্ত চিত হয়ে শুয়ে? দুটি ভাতই না হয় বাছা চড়িয়ে দাও। না খাইয়ে স্বামীকে আপিসে না পাঠালে কি শান্তি হবে না?" তারপর ঠেলে-ঠুলে সাড়াশব্দ না পেয়ে বকবক করতে করতে নিজেই হবিষ্যি ঘরে আরও দু-মুঠো চাল ছেড়ে দিলেন ছেলের জন্যে। দুপুরে জ্বর বাড়ল, জ্বরের ঘোরে ভুল বকতে আরম্ভ করলেন পুষ্পদি। পাশের বাড়ির ছোট ছেলে নাড়ুটা আর তাকিয়ে থাকতে পারল না। চোখ ফেটে তার জল আসছিল। ছুটো গলি ছেড়ে সামনের রাস্তার মোড়ে জুপিটার ফার্মেসীতে দৌড়ে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে নাড়ু বললে, "মাসীমা পাগল হয়ে গেছে, পাঁচুদা।" পাঁচুগোপাল তরুণ ডাক্তার। পাড়ার খাতির থাকায় ফার্মেসীতে বসার সুযোগটুকু পেয়েছে মাত্র। হাতে রুগীও তেমন নেই। পাঁচুগোপাল তখনই তার ব্যাগটা সাইকেলের ক্যারিয়ারে বেঁধে নাড়ুকে রডে তুলে গুরুচরণের বাড়ি হাজির। টেন সি-সি কুইনিন ইনজেকশন দিয়ে পাঁচুগোপাল চলে গেল, একডোজ মিকশ্চার আর একটা পুরিয়ার প্রেসক্রিপশন লিখে।

গুরুচরণবাবু নটা নাগাদ বাড়ি ফিরলেন। পুষ্পদি তখনও বেহুঁশ।

গুরুচরণের মা বললেন, "কেউ নেই ঘরে, এক ছোকরা নাড়ী টিপছে। সে আবার বিনি পয়সার ডাক্তার।"

গুরুচরণ আগুন হয়ে যান "কে, কোন ছোকরা?"

"ঐ যে পাঁচু, বৌ-এর গাঁ-সম্পর্কে ভাই না কে!"

গুরুচরণ মার কথায় জবাব দেন না। রাগে থমথম করতে থাকে তাঁর মুখ। মা এসে ভাত বেড়ে দিলে ভাতের থালা সুদ্ধ উঠোনে ফেলে দেন। তারপর এক গেলাস জল গড়িয়ে খেয়ে শুয়ে পড়েন। সারা রাত্তির বিছানায় শুয়ে ছটফট করেন গুরুচরণ। সকালে জ্ঞান হয় পুষ্পদির, জ্বরও বিশেষ নেই। শুধু মাথার মধ্যে কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব ঠেকে। গুরুচরণ অনেকক্ষণ কানের কাছে কি বলে যাচ্ছেন, তা তিনি বুঝতে পারেন না। তারপর যখন ঘরের এক কোনায় সাজানো একদাগ খাওয়া মিকশ্চারের শিশিটা মেঝেতে আছড়ে ভেঙে ফেলেন গুরুচরণ, তখন মাথা তুলে কষ্ট করে তাকান পুষ্পদি।

গুরুচরণকে উদভ্রান্তের মত লাগছিল। পুষ্পদির কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে তিনি বলেছিলেন, "পাঁচুগোপাল গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছে আর জ্বর সেরে গেছে? লজ্জা

করে না, এত বড় ছেলের মা, ধাড়ী মাগী কোথাকার…।" কথার কোনও মাত্রাজ্ঞানই ছিল না গুরুচরণের। তারপর অবশ্য ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে ভেবে নিজেই এক শিশি নতুন মিকশ্চার কিনে নিয়ে এলেন, কোর্টে যাবার আগে। কিন্তু তারপর থেকেই কাঁদছিলেন পুষ্পদি। মাস্তার কথা একবারও তাঁর মনে হয় নি। নিত্যকে বলবার সময় পুষ্পদির চোখে জল এল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে জানালার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমরা যে অতলে সেই অতলেই আছি নিত্য। মাঝখানে থেকে কতকগুলো ছেলে গুলি খেয়ে মরছে।"

পুষ্পদির কাছ থেকে ফিরে হাঁটতে হাঁটতে যখন কালিঘাটে কাঠের পুলটার ওপর উঠল নিত্য, তখন বেশ রাত হয়েছে। বৃষ্টির পর জ্যোৎস্নায় কালিঘাটের গঙ্গা অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। পুলের নীচের কাদা পর্যন্ত চকচক করছে চাঁদের আলোয়। পাশের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা চিতাগুলো থেকে ধোঁয়া উঠছে। তবে বাতাসে জলের পরিমাণ বেশি থাকায় খুব ওপরে উঠতে পারছে না, নীচে কুণ্ডলী পাকিয়ে জমাট বেঁধে আছে। সেদিকে তাকিয়ে নিত্যর মনে পড়ল পুষ্পদির কথা, "তখন কি ছাই জানতাম, বিয়ে করার মানে কি? বড় হয়ে ভাবতাম কেন বিয়ে করার আগে মানুষ মরে যায় না!" নিত্য জোরে জোরে হাঁটতে থাকে। সামনে একটা কর্পোরেশনের স্কুল। লম্বা হলুদ রঙের দোতলা বাড়ি। ভেতর দিয়ে গেলে শর্টকাট হয় তাই, অন্যদিনের মত আজকেও নিত্য স্কুলের বারান্দায় ঢুকে পড়ল।

ঢুকেই কিন্তু অবাক হয় নিত্য। নীচে ক্লাস টু, থ্রি, ফোর গুলোয় আলো জ্বলছে এত রাত্তিরেও। মাঝখানের বারান্দাটা দিয়ে যাচ্ছিল সে। দু-পাশের ঘরে কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে—ফ্ল্যাশ খেলা হচ্ছে। একটা পাথরের বাটিতে মনে হল, সিদ্ধি ঘোঁটা হচ্ছে। "কে, কে যায় ওখান দিয়ে?"—ভেতর থেকে গলার আওয়াজ এল।

নিত্য দাঁড়িয়ে পড়ে। তার মনে পড়ল, দাঙ্গার পর থেকেই এরকম কতগুলো দল পাড়ায় পাড়ায় ঘাঁটি করে আছে, ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্কও মাঝে মাঝে লুঠ করে শোনা যায়। দরজার পাশ থেকে হঠাৎ দুটো ছেলে বেরিয়ে এল। দুজনেরই কোঁকড়া চুল বাহার করে আঁচড়ানো, গায়ে পাঞ্জাবী, মুখ থেকে ভক ভক করে গন্ধ আসছে। একজন জিজ্ঞেস করলে, "কী চাই!"

হঠাৎ চট করে নিত্যর মনে হল, মাস্তা হয়তো এরকম কোনও দলের পাল্লায় পড়েছে। অন্তত এরকম দলের সঙ্গে আজকাল ঘুরছিল, শুনেছে। "আমি মাস্তাকে খুঁজতে এসেছি।" নিত্য বলে।

"মাস্তা? সেটা আবার কে?"

নিত্য চেষ্টা করে মান্তার ভালো নাম মনে করতে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে "আমি পৃথ্বীশকে খুঁজতে এসেছি। আমি তার দাদা।" ছেলে দুটো তাকে ভেতরে নিয়ে গেল। ভেতরে যারা বসেছিল তারা সন্দেহ ও বিরক্তিতে তাকায় নিত্যর দিকে। ছেলে দুটো আবার তাকে পাশের ঘরে নিয়ে আসে।

পাশের ঘরেও একই ব্যাপার। র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বসে ফ্ল্যাশ খেলা হচ্ছে একটা কেরোসিনের ডিবের চারধারে, পাশে ছড়ানো মুড়ি, পেঁয়াজ। দু-তিনটে লেমো-নেডের ছাপমারা বোতল থেকে চড়া মদের গন্ধ আসছিল। নিত্য বেরিয়ে আসছে এমন সময় একটা ঢেঙা মত লোক বলে ওঠে, "ও পৃথ্বীশ? সেই কালো রোগা মত কোঁকড়া চুল, গানটান করে?"

লোকটা বাইরে এসে নিত্যর কানের কাছে মুখ নীচু করে বলল, "আসুন আমার সাথে। ছেলেটা স্যার একেবারে কাঁচা, মালসুদ্ধু ধরা পড়ত। এখন আবার শালার দাদ হয়েছে।"

অন্ধকারে রাস্তার ধারে একটা ছোট শিব মন্দিরের। সামনে নিয়ে এল লোকটা। বহু পুরনো এ অঞ্চলের মন্দির। সকালে বুড়ী আর বিধবাদের ভিড় হয়। সন্ধ্যের পর খাঁ খাঁ করে। দুজনে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল। দরজা ভেজানো। একটু ঠেলে লোকটি ডাক দিল, "পৃথ্বীশ পৃথ্বীশ!" ভেতর থেকে সাড়া এল না।

এবারে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ফেলল লোকটা। অন্ধকারে ঠিক দরজার পাশেই কী একটা কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। ভেতরে পচা বেলপাতার গন্ধ। দু-তিনটে ফোকর দিয়ে একটু একটু হাওয়া আসছে। লোকটা টর্চ মারে। কাপড় থেকে একটা মাথা বেরুতেই চমকে যায় নিত্য।

"মান্তা" মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরুল তার। দুই গালে ঠোঁটের নীচে দগদগে বিশ্রী ঘা হয়েছে মান্তার। মান্তা বললে, "ঘুমোতে পারছি না দাদা দু-দিন থেকে। এমন দাদ হয়েছে সারা শরীরে। একটা মলম আছে মার আলমারির ওপরে। নিয়ে আসবে দাদা?"

"দাদ হয়েছে তোর? এটা কি দাদ?"—রাগে দুঃখে গলা বন্ধ হয়ে আসছিল নিত্যর। মান্তা অসহায়ভাবে তাকায়। পেছন থেকে লোকটা ঘোড়ার মত আওয়াজ করে হেসে উঠল।

"তুই বাড়িতে আয়, এখানে পড়ে আছিস কেন?" নিত্যর কথায় একটা আতঙ্কের ভাব দেখা দিল মান্তার চোখে। নিত্য দৃঢ় গলায় বললে, "কাল সকালে এসে নিয়ে যাব তোকে।"

ফিরবার জন্যে পা বাড়িয়ে ছিল সে। পেছন থেকে মাস্তা ডাকল, "চার আনা পয়সা হবে দাদা? কাল থেকে খাই নি কিছু।" পকেট হাতড়ে একটা আধুলি বার করে দেয় নিত্য। তারপর ভারী পায়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

আঠার

পরদিনও সকালটা ছিল মেঘলা। বিকেলে আকাশ ঘন করে মেঘ হয়ে আছে। একটু একটু হাওয়া দিচ্ছে। দেশপ্রিয় পার্কে একটা বিরাট ভিড় দেখে নিত্য নেমে পড়ল ট্রাম থেকে।

প্রচুর স্থানীয় ভদ্রলোকদের সমাবেশ হয়েছে। অন্য দিনের মত ফুটবল খেলা আজ আর হয় নি। পাশের টেনিস ক্লাব থেকে খেলোয়াড়রা পর্যন্ত র‍্যাকেট হাতে করে ভিড়ের মধ্যে মিশেছে। কাছে এগুতেই কানে এল, মাইকে বক্তার গলার আওয়াজ—

"আমরা যারা সারা জীবন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম চালিয়ে এসেছি, যারা সত্যের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছি, তাদের সামনে—সারা দেশের সামনে এক মহা দুর্দিন উপস্থিত।" তারপর উঁচু পর্দায় উত্তেজিত স্বরে বক্তা প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু কথা হল, এই মহাদুর্দিনে কি আমরা পিছিয়ে যাব? আমাদের বাংলার তরুণেরা যারা ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছেন, তাঁরা কি নীরব থাকবেন? আমাদের সেই ক্ষুদিরামের দেশকে, সেই নেতাজীর দেশকে ধ্বংস হতে দেব না, কিছুতেই না……"

বক্তার আবেগকম্পিত গলায় ঘন ঘন হাততালি পড়ে। নিত্য চিনতে পারে বক্তাকে। ভদ্রলোক হাসির বিয়েতে এসে তাঁর গাড়ি কত পেট্রোল খায়, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গল্প করেছিলেন—রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট জজ দীনেশ মুখার্জী। ডায়াসের ওপরে আরও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক।

দীনেশবাবু উৎসাহিত হয়ে আবার বলতে শুরু করলেন। তিনি যেন শ্রোতাদের মনের ভেতরে যে প্রশ্নটা লুকিয়েছিল, তা আগে থেকেই আঁচ করেছেন, "আপনারা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন—আপনারাই একদিন দেশ জুড়ে আন্দোলন করেছিলেন বাংলা-বিভাগের বিরুদ্ধে, আজকে আপনারাই এর পক্ষে? এটা সত্যিই সঙ্গত প্রশ্ন,

আর তার সোজাসুজি জবাব হল—হ্যাঁ, আমরাই যারা একদা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি, তারাই আজ বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষে সম্মতি দিচ্ছি। একটা ইংরেজি প্রবাদ মনে আসছে এখানে, হাতের কাছে একটা পাখির দাম, ঝোপের মধ্যে আছে এমন একঝাঁক পাখির চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের অবস্থাও তাই। আমাদের কি বুক ভেঙে যাচ্ছে না? নিদারুণ দুঃখে কি আমরা মুহ্যমান হয়ে পড়ছি না স্বহস্তে নিজের অঙ্গ ছেদন করার ব্যবস্থা করছি বলে? কিন্তু এই হল একমাত্র বিবেচনার পথ, দুরদর্শিতার পথ। এ অবস্থায় আমাদের কোনও কোনও বন্ধু কেবলমাত্র আবেগের বশবর্তী হয়ে বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধতা করেছেন। আমি বলব, তাঁরা নিজেদের অজ্ঞানে সমস্ত হিন্দুদের ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছেন। আর কেউ কেউ জ্ঞানতঃ দেশবিভাগের বিরোধিতা করছে। স্পষ্ট করে বলছি, তারা হল দেশের শত্রু। তারা সমস্ত বাংলা দেশকে মুসলমানের হাতে ফিরিয়ে দিতে চায়। তারা আবার বর্বর মোগল সাম্রাজ্য ফিরিয়ে আনতে চায়।

সেই চরম ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে হলে, জাতির সেই শোচনীয় মৃত্যু এড়াবার একমাত্র সমাধান—বঙ্গবিভাগ।"

সবাই কান খাড়া করে বক্তৃতা শোনে। মাঝে মাঝে কেউ কেউ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। একটা বিরাট নিষ্ঠুর ভবিতব্যের সামনে মানুষ যেমন অসহায় হয়ে পড়ে, তেমনই দুর্বল আর বিমূঢ় হয়ে যায় সকলে। দীনেশবাবু বলেন, "আপনাদের কাছে বেশিক্ষণ বক্তৃতা করে আপনাদের মূল্যবান সময় আমরা নষ্ট করতে চাই না। শুধু শেষবারের মত আপনাদের কাছে অনুরোধ, মাত্র হৃদয়ের আবেগ দিয়েই দেশের অবস্থা আজ বিচার করবেন না। দুরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার বশবর্তী হয়ে, আজ দেশের সুধীসমাজ দেশ-বিভাগের যে প্রস্তাব তুলেছেন, অত্যন্ত মর্মান্তিক হলেও, সেটাই বাস্তব রাস্তা। মনে রাখবেন আপনাদের মা-বোনের সম্মান নির্ভর করছে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ওপর।"

কেমন একটা থমথমে ভাবের মধ্যে দিয়ে মিটিং ভেঙে গেল। পার্কের ভেতরে বাইরে জটলা চলতে থাকে কিছুক্ষণ, পূর্ব দিকে একটা লাল রঙের তিনতলা বাড়ির ঠিক ওপরে বিকেল থেকে যে মেঘটা জমে ছিল, সেটা বিস্তৃত হয়ে পার্কের ওপরে সারা আকাশখানা কালো করে দেয়। একফোঁটা দুফোঁটা বৃষ্টি পড়লেও ঠিক জোরে নামে না। শুধু হাওয়া বইতে থাকে এলোমেলো ভাবে। বৃষ্টি আসছে দেখে ডিমওয়ালা, চিনেবাদামওয়ালা গেটের সামনে তাদের সাজসরঞ্জাম গোটাতে আরম্ভ করে দিল। নিত্য থমকে দাঁড়ায়। ভিখিরিটা অন্ধ—বছর চল্লিশ বয়স হবে, কিন্তু শুকিয়ে

একদম বেঁকে গেছে মেরুদণ্ড, চুলগুলো তেল না পড়ায় ধুলো মেখে আরও জট পাকিয়েছে কপালের ওপর, হাওয়ায় আরো এলোমেলো লাগছে চুল। ঢাকনার মত একটা বাদ্যযন্ত্র, একহাতে বাজাচ্ছে আর গাইছে—

"থাকত যদি টাট্টু ঘোড়া
তোর ক্ষুদি কি পড়তো ধরা মাগো
এক চাবুকে চলে যেতাম
গয়া কিংবা কাশী।
একবার বিদায় দাও মা আ—আ.................."

তাল দেবার সময় তার মাথাটা একেবারে লুটোচ্ছিল রাস্তার ধুলোয়। বৃষ্টি নামল অঝোরে, কিছুক্ষণ পরেই। সেবার কলকাতা ভাগ হয়েছিল, মুসলমান-কলকাতা আর হিন্দু-কলকাতায়। কিন্তু সমান ভাবেই বৃষ্টি নামল। বালিগঞ্জের গেটওয়ালা বাড়িতে আর রাজাবাজারের বস্তিতে, খিদিরপুরে, শেয়ালদায়, বেলেঘাটায়, বৌবাজারে, টালিগঞ্জে আর কলাবাগানে—বৃষ্টি নামল সমস্ত কলকাতায়।

কয়েক দিনের পরের ঘটনা। বৃষ্টিতে ধোওয়া কলকাতার ওপর সকাল যেন হেসে উঠেছে। রোদ বেশ জোরাল, আকাশ নীল, অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে। সারা শহর ঝিমোচ্ছে মিঠে রোদ্দুরে।

চৌধুরী সেদিন বিকেল গড়াতে না গড়াতে কোথা থেকে একটা ভাঙা ঝরঝরে জীপ নিয়ে একেবারে সোজা দোরগড়ায় উঠে এলেন। কতক্ষণ ড্রাইভারের সীটে বসে পিঁ পিঁ করে হর্ন দিয়ে বাড়ির ভেতর থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে হৈ চৈ বাধিয়ে দিলেন। তারপর সিঁড়িতে উঠে বহুদিনের অভ্যেসের মত হাসি হাসি করে কয়েকবার ডেকেই চুপ করে যান হঠাৎ।

গুজারাম বাটনা বাটছিল। অকস্মাৎ চৌধুরী সাহেবের এরকম উত্তেজনায় সে অবাক হল, তারপর হলুদ-মাখা হাত গামছায় মুছতে মুছতে দু-চোখে কৌতূহল নিয়ে বেরিয়ে এল বারান্দায়।

চৌধুরীর মুখে চোখে খুশি উপচে পড়ছে—যেন অন্য মানুষ। চপ্পল থেকে সাদা জীনের পেণ্টালুন অনেকখানি উঁচু হয়ে ওঠায় তাঁর নীল শিরা ওঠা ফর্সা পায়ের গোছ বেরিয়ে আছে, হাওয়ায় চুল মুখের ওপরে এসে পড়েছে। গুজারাম বের হতেই, তার বাটনা মাখা হাতখানা ধরে টান দিয়ে বলে উঠলেন, "আও মেরা সাথ।" গুজারামকে পাশের সীটে বসিয়ে তাঁর ঝরঝরে জীপের শব্দে পাড়া তোলপাড় করে বেরিয়ে গেলেন চৌধুরী।

জীপের ছাদে আটকানো ছেঁড়া ক্যানভাসের ভেতর দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছিল। সাদা সাদা মেঘ, সারি সারি সৈন্যের মত শরৎকালের আকাশে কুচকাওয়াজ করে বেড়াচ্ছে। রাস্তায় অসংখ্য লোক, ফ্ল্যাগ, চিৎকার—"হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই ভুলো মাত ভুলো মাত।" বিহ্বল বিস্মিত গুজ্জারাম নিজের অজান্তেই চিৎকার করে উঠল, "ই কেয়া সাব, ই কেয়া বন গিয়া!"

চৌধুরী ব্রেক কষলেন। একটা মস্ত বড় তোরণ করা হচ্ছে দেবদারু পাতা দিয়ে। আর ঠিক রাস্তার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ছেলেরা বাস ট্রাম থামিয়ে কোলাকুলি করছে। চারদিকে এই বিরাট আনন্দের উত্তেজনা যে সত্যগোপালকেও স্পর্শ করেছিল, তা গাড়ির স্পিডোমিটার দেখেই টের পাওয়া যাচ্ছিল। প্রায় মাতালের মত চালাচ্ছিলেন গাড়ি, আর যেখান দিয়েই তাদের গাড়ি গেল, রাজাবাজার, মানিকতলা, বৌবাজার, শ্যামবাজার, কলাবাগান,—সব জায়গায় সেই একই তাজ্জব ব্যাপার, সেই কোলাকুলি, স্লোগান আর ফ্ল্যাগের সারি। সত্যগোপাল অবাক হয়ে ভাবছিলেন, এত ফ্ল্যাগ রাতারাতি কোথা থেকে জোগাড় করলে লোকে।

হাসি আর সুবোধ কয়েক দিনের জন্যে ছুটিতে রাঁচী থেকে কলকাতায় এসেছে। সুবোধের বাবার নাকি অসুখ। চৌধুরী সোজা মানিকতলা থেকে তাদের জীপে তুলে নিলেন, বাড়িতে অসুখ বলে কোনও ওজর আপত্তি শুনলেন না। গাড়ি যখন চিৎপুরের মুসলিম অঞ্চলে ঢুকল, তখন সেখানে স্টিরাপ পাম্প দিয়ে আতর গোলা জলে আগন্তুকদের মুখ, চোখ, ধুতি, শাড়ি ভেজানো হচ্ছে। গুজ্জারাম বসেছে ঠিক চৌধুরীর পাশে। একতাড়া গোলাপের পাপড়ি তার শুকনো মুখ আর উস্কোখুস্কো চুলের ওপরে এসে পড়ে। বুক ভরে ওঠে আতরের গন্ধে। গুজ্জারামকে ভয়ানক উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। চৌধুরীর ডান হাতখানা চেপে ধরে বিহ্বলভাবে সে বলল, "কেতনা দেখেগা সাব, সব দেখলিয়া। আভি মর যায়েগা।" সীটের ওপর শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে বিড়বিড় করে সে নিজের মনে বকতে আরম্ভ করে।

হাসি হঠাৎ চেঁচিয়ে বললে, "কাবাব খাব দাদা, আমজাদিয়ায় চল।" চৌধুরী গাড়ি ঘোরালেন। চৌরঙ্গীতে এসে অবশ্য অনেকক্ষণ আটকে থাকতে হল। সমস্ত শহর রাস্তায় নেমে এসেছে। বুড়ী, ছুঁড়ী কেউ বাদ নেই। অগণিত লরির ওপর অসংখ্য ছেলে মেয়ে, কেউ স্লোগান দিচ্ছে, কেউ গান করছে। ট্রামে-বাসে অসংখ্য মানুষের ভিড়, প্রায় বাদুড় ঝোলা হয়ে ঝুলছে। টিকিট দেবার কারো বালাই নেই আজ। কণ্ডাক্টররাও ভিড়ের মধ্যে বসে হাততালি দিচ্ছে। সুবোধ গুনে গুনে দেখাল, একটা অস্টিন গাড়ির ওপর প্রায় উনিশ-কুড়িজন লোক। মাডগার্ড

বনেট কোথাও বাদ নেই। একটা বুড়ো তো সামনের ইঞ্জিনের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে চিৎকার করছে, "হিন্দু-মুসলিম এক হো।"

মেট্রো সিনেমার ঠিক নীচে কতকগুলো মাঝবয়সী ভদ্রলোক একটা মস্ত বড় বেলুন নিয়ে লোফালুফি করছেন। এক ধরনের ব্যাজ পাওয়া যাচ্ছে, তার একদিকে তেরঙ্গা আর একদিকে চাঁদ-তারা। হাসি একটা ব্যাজ কিনে জামায় আটকায়।

কাবাব খাওয়ার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চৌধুরী বললেন, "মারভেলাস্!" গুজারাম গোস না খেয়ে সরবৎ খেল।

সত্যি এমন দিনটি আর আসে নি কলকাতায়। জাতীয় উৎসব বলতে যে দুটি প্রাত্যহিক উৎসব লেগে থাকে শহরে, অর্থাৎ ফুটবল খেলার গ্যালারিতে ভিড় করা ও সিনেমা লাইনে কিউ দেওয়া, এ দুটি বাদ দিলে দুর্গোৎসবে লরির ওপর নাচা, হোলির দিন মেয়েদের গায়ে রং লাগাবার চেষ্টা করা, অথবা পঁচিশে বৈশাখ ইত্যাদি দিনে গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে মহিলাকণ্ঠের দাঁত চেপে "হে নূতন দেখা দিক আরবার" শোনা—এ সব ছাপিয়েই সে দিনটা এসেছিল।

দেশ বলে যে একটা জিনিস থাকতে পারে, আর তার জন্যে সবাই মিলে রাস্তায় নেমে আনন্দ করা যায়, এ কথাটা যেন আঁচ করতে পারছিল লোকে। ডানকার্কের মত মস্ত বড় দুঃখের রাত্রে একটা মস্তবড় স্থায়ী ভ্রাতৃত্ব হয়তো এদেশে আসে নি, কিন্তু একটা দিনের জন্যেও অন্তত একটা বিরাট আনন্দময় ভ্রাতৃত্বের আবির্ভাব হয়েছিল। আর, এ আনন্দের পেছনে দেশভাগের মস্ত বড় যন্ত্রণা কলকাতাবাসী তখনকার মত ভুলে গিয়েছিল।

এ আনন্দের লক্ষ্য কোথায়, কিভাবে একে অম্লান রাখা যায়, এত কথা কেউ ভাবে নি তখন। পরদিন একটি দৈনিক পত্রিকা লিখেছিলেন, "নাখোদা মসজিদে হিন্দু রমণীরা উঠিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া, শেষ পর্যন্ত কি করিবেন,—বুঝিতে না পারিয়া হাওয়া খাইতে লাগিলেন।" ১৫ই অগস্টের সন্ধ্যেটা আলোর মালা আর কোলাহলে এমনি একটা হাওয়া খাওয়ার রাত হয়ে রইল, এদেশের লোকের মনে।

উনিশ

কড়া ঠাণ্ডা পড়েছে। ডিসেম্বরের প্রথমে যে এত শীত পড়বে কলকাতায় ভাবতে আশ্চর্য লাগে। রাস্তার পাশে সতীশের চায়ের দোকানে পাশ কেটে যেটুকু রোদ্দুর এ বাড়ির চৌকাঠ আর সিঁড়িতে এসে পড়েছিল, তারই মধ্যে কোনও রকমে গুড়িসুড়ি মেরে বসেছিলেন পুষ্পদির স্বামী গুরুচরণ আর মুখের ভেতর থেকে অদ্ভুত এক আওয়াজের সাথে সাথে কুয়াশার কুণ্ডলী বার করছিলেন।

চোয়াল-বসে-যাওয়া মুখের ভেতর থেকে চোখ দুটো গুরুচরণের স্বতন্ত্র। ভুরুতে পাক ধরেছে, মাথার চুলগুলো রোঁয়ার মত এদিক সেদিক নিজেদের ইচ্ছে মত লেগে আছে। কিন্তু চোখ দুটো গুরুচরণের সত্যিই আলাদা। ভয়ানক তরুণ মনে হয়, খালি চোখ জোড়া দেখলে।

সতীশের দোকান এখনও খোলে নি। নইলে দু-গেলাস চা, আর কালকের তৈরি বাসি আলুর চপ এতক্ষণে খেয়ে আরাম পেতেন। সামনে কুয়াশায় ভেতর দিয়ে কান ঢেকে হিন্দুস্থানী মুটিয়া আর খালের মাঝিগুলো চলেছে। একটু সরু চিকণ লম্বা বাঁশ নিয়ে কোমরটাকে যথাসম্ভব দুলিয়ে দুলিয়ে দুটো লোক সামনের রাস্তার বাঁক ঘুরল। প্রথমে আস্তে আস্তে তালা খোলার শব্দ, তারপর হড়াৎ করে দরজা খোলার আওয়াজে সজাগ হয়ে উঠলেন গুরুচরণ।

দোকান খুলছে সতীশ। এত শীতেও তার বিশাল খোলা বুকখানার ওপর এক টুকরো নিমা। গুরুচরণ লক্ষ্য করছিলেন, কেমন করে সতীশ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কয়লার ছাই ঝাড়ছে, এমন সময় মান্তা এসে সোজা গড় হয়ে প্রণাম করলে বাপকে।

"এই সাত সকালে এমন ন্যাকামো কেন বাবা? কী মতলব বলে ফেলত?" কথাটা বলেই মান্তার দিকে তাকিয়ে তার সাজপোশাক দেখে চমকে যান গুরুচরণ। একটা ছাই রঙের ফ্ল্যানেলের পেণ্টালুনের ওপর খয়েরী রঙের চেক চেক গরম কোট। জুতোটাকে হাফসোল দেওয়ার পর পালিশ করা হয়েছে। বেশ পাউডারের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে ঘাড়ের পাশ থেকে। মুখের দাগও মিলিয়ে গেছে মান্তার। অল্প একটু হেসে বাবাকে বললে মান্তা, "বম্বে যাচ্ছি বাবা।"

গুরুচরণ সত্যিই আকাশ থেকে পড়লেন। আর মান্তা সেই ভাবখানা লক্ষ্য করে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে মনে মনে হাসলে। মিনিট খানেক যাওয়ার পর গুরুচরণ বললেন, "তুমি চুলোয় যাও, জাহান্নমে যাও, তবে চুরি ডাকাতি করে জেলে গেলে এক

পয়সাও পাবে না বাছাধন বলে দিলাম ।" হঠাৎ রাগের মধ্যেই কৌতূহলী হয়ে পড়লেন গুরুচরণ। তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে মান্তার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "কে জুটিয়ে দিলে ?"

"শঙ্করদা"—মান্তা একটা ছোট্ট জবাব দিলে।

গুরুচরণের চোখ বিস্ফারিত হল। তাঁদেরই গাঁয়ের ছেলে শঙ্কর ; কাউকে রাত-বেরাতে পৌঁছতে হলে, আত্মীয়বন্ধুহীন মড়া পোড়াতে হলে শঙ্কর ছিল অদ্বিতীয়। কলকাতায় এখন নাচ শিখে, দিনে তিনটে নাচের টিউশনি করে। এতদিন আপিসে কলম পিষে, রাত্তিরবেলায় নির্বিবাদে ছোট ছেলেটার বায়াল সামলাত। ফিলমে যাওয়ার কথা শুনলে নাচের আদর্শ, নীতি-দুর্নীতি নিয়ে কত কথা বলে এসেছে ! "শঙ্করও গেল শেষ পর্যন্ত ফিলমে ?"—বেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাসের মত কথাটা বলে গুরুচরণ চুপ করে গেলেন।

মান্তা বলে, "শঙ্করদা সেরকম আর নেই, বাবা। প্রমোদবাবু বলে এক ভদ্রলোক শঙ্করদার বন্ধু, বম্বে থেকে এসেছিলেন, তিনি কি বলেছেন জানো শঙ্করদাকে ? তিনি বলেছেন, বৌ-এর গায়ে কাপড় দিতে পার না, আবার বড় বড় কথা বলছ ?"

বম্বে যাবার কথা হতে না হতেই বাপের কাছে মান্তার মুখচোরা ভাবটা কেটে গেছে। বেশ মুরুব্বির চালে বললে, "ওসব সেন্টিমেণ্ট এখন প্রমোদবাবুর পাল্লায়······"

"তুই থাম রাস্কেল"—গুরুচরণবাবু খিঁচিয়ে ওঠায় মান্তার নবলব্ধ জ্ঞানের কথায় বাধা পড়ে।

ঘরের ভেতরে গিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা বেডিং আর একটা নতুন মাঝারী ধরনের স্যুটকেশ নিয়ে (আগাম কিছু টাকা কোম্পানী ধার দিয়েছে) পুষ্পদির দিকে জুতোর খটখট আওয়াজ তুলে এগিয়ে গেল মান্তা। তারপর ঝাঁ করে একটা প্রণাম সেরেই বেরিয়ে পড়ল। সে যখন বেডিংটা বগলে আর এক হাতে স্যুটকেশ ঝুলিয়ে বেশ দৃপ্ত ভঙ্গিতে বেরোল তখন গুরুচরণ একবার ফিরেও তাকালেন না।

তাঁর গাঁয়ের ছেলে শঙ্করের কথা ভেবে উন্মনা হয়ে পড়েছিলেন গুরুচরণ। তিনি নিজে ইস্কুল মাস্টার ছিলেন খুলনার। কয়েক বছর হল ওকালতি ধরেছেন। এর ওপর সামান্য তেজারতি আছে। কিন্তু শঙ্কর যেন এ সবের মধ্যে নেই। অতীতের কথা ভাববার সময় গুরুচরণের ভাঙা গালের ওপর কালচে বর্ণহীন পোড়-খাওয়া চামড়া আর মহাজনদের মত হিসেবী মুখের গড়ন থেকে তাঁর চোখ দুটো হঠাৎ স্বতন্ত্র হয়ে ভেসে উঠল।

গুরুচরণ ভাবছিলেন দেশের কথা, সাতক্ষীরার কথা। ভোলানাথ বাবাজীর আশ্রম

ছিল তাঁদের গাঁয়ে, সেখানে শঙ্কর ছেলেটা পড়ে থাকত, আর দিনরাত্তির তাকে খাটিয়ে নিত সবাই। এই তো তিনি নিজেই দুপুর রাতে কত দূরে দূরে পাঠিয়েছেন ছেলেটাকে। তারপর শঙ্কর কলকাতায় এল, নাচ গান শিখল। কী রাক্ষুসীই না শহর, সবাইকে টেনে নিচ্ছে। কাউকে আর দেশে গাঁয়ে রাখবে না! শঙ্করকেও টেনে নিলে, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে নিজের খুশিমত। আর মান্তাও—

গুরুচরণের ভাবনার সূত্র ছিঁড়ে গেল। রাস্তায় নেমে সোজা সতীশের দোকানে এসে ঢোকেন। কুচো কয়লায় ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে আগুন উঠছে। জল ইতিমধ্যে ফুটতে আরম্ভ করেছে একটা বড ডেকচিতে। সতীশ ডাক দিল, "আসুন মাস্টার মশাই, আসুন।" চায়ের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে কেমন তন্ময় হয়ে পড়েন গুরুচরণ।

তাঁর সবচেয়ে আগে মনে পড়ে গাঁয়ের নদীটার কথা। সবই হয় ইছামতীর ধারে ধারে। আখ হয়, পাট হয়, ধান হয়। একটা জাল ফেলো তো সের দেড়েক পারসে, টেংরা, চিংড়ি। কয়েকটা খেজুর গাছ লাগাও, তারপর পাঁচ মাস রস জ্বাল দাও আর গুড় কর। তাঁদের বাড়ির উঠোনটার পাশ দিয়ে, ডাবগাছের একটা লাইন বলতে গেলে। উঠোনে সুপুরি শুকোতে দেওয়া হয়েছে। পুষ্প নতুন বৌ। কী ডাগর জলজলে চেহারা! চৌকাঠের পাশে হ্যাচ করে বসে সুপুরি কাটছে তো কাটছেই। মা বলছেন, "চরণ তেল নিয়ে যা।" শীতের বারোটায় সময়ও যেন সকাল হয় নি, এমনিভাবে আড়মোড়া দিতে দিতে চৌকির ওপর থেকে কাঠের গরাদের ফাঁকগুলো দিয়ে বাইরে টলটলে দুপুরটার দিকে যেন আজও তাকিয়ে আছেন গুরুচরণ।

খালি গেলাসটা নিয়ে আসতে গিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সতীশ অবাক হয়। গুরুচরণের চোখের কোণটা ভিজে ভিজে লাগছিল।

পুষ্পদির মা দেবরানী ক-দিন হল এসেছেন কাশী থেকে, গুরুচরণের কয়েক দিনের জন্যে মফস্বলে কেস করবার অবর্তমানে। দেখে মনে হয় না, তাঁর পেটে ক্যানসার হয়েছে। গত দু-বছরে একবার ফাল্গুন মাসে ও একবার আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি অবস্থা একরকম যায় যায় হল। কাশী থেকে তাঁর চিঠি এল, "পুষ্প-মা আমি তো চলার পথে। এ পৃথিবীতে কিছুই সুখের নহে। এ কথাটা তোমাকে বারবার বুঝাইয়াও বুঝাইতে পারি নাই। আশা করি, সময় হইলে বুঝিবে। সময় হইলে বুঝিবে, পুত্রপরিবারের জন্য আমরা আমাদের যত সময় ও শক্তি অপচয় করি, তাহার এক কণাও ভগবানের পায়ে নিবেদন করিলে, আমরা মুক্ত হইব।"

পাঁচুগোপালকে নিয়ে গুরুচরণের কদর্য ইঙ্গিত, এবং মাস্তার বম্বেতে অন্তর্ধান, এই ঘটনাগুলো এমন পরপর ঘটল যে, পুষ্পদির মনে হল দেবরানী যা বলেন, বোধ হয় তাই সত্যি। প্রতিদিন ধরে যে ঘরের জন্যে এত স্বপ্ন দেখেছেন, এত বুক বেঁধে সংসারের সমস্ত দৈন্যের বিরুদ্ধে লড়ে এসেছেন, তা সবই মিথ্যে। দেবরানীর কথাই ঠিক। এই পৃথিবীতে কিছুই সুখের নয়, শুধু সুখ পাওয়ার জন্যে আকুলিবিকুলি চেষ্টা। তাঁর মনের যখন ঠিক এই অবস্থা,তখন দেবরানীর আগমনে পুষ্পদির মনে হল, মার সাথে সাথে তিনিও হবেন কাশীবাসী।

গুরুচরণ সাধারণত কলকাতায় থাকেন। কেসের বাজার ভয়ানক মন্দা। দালালদের ঘুষ দিয়ে আর মক্কেলদের জন্যে তাঁর সামনের বৈঠকখানায় নগদ একশো টাকা দামের একখানা ফ্যান লাগিয়েও বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারছিলেন না তিনি। তাই এবার দিন দশ-বারোর জন্যে বসিরহাটের দিকে রওনা দিয়েছেন। গুরুচরণের মাও তাঁর ছেলের পেছন পেছনে ধাওয়া করেছেন। দেবরানী ঠিক করলেন এবার এখান থেকে পুষ্পকে নিয়ে সোজা কাশীতে তুলবেন।

বিকেলবেলা যে ঘরখানায় দেবরানী ও পুষ্পদি বসেছিলেন, তার একদিকে একখানা নড়বড়ে বেঞ্চির ওপরে সারি সারি কয়েকটা টিনের সুটকেশ, একপাশে গাদা করা লেপ আর কাঁথা, পুষ্পদির বিয়ের খাট, রঙ চটে গেলেও এখনও বেশ বাহার আছে। সকালে ঘরখানার এক পাশটা ঝাঁট দিয়ে গুরুচরণকে খেতে দেওয়া হয়। একটা অনেক দিনের ভাঙা ধুলোভরা প্রাইমাস স্টোভের ওপরে হেলান দেওয়া কালীর ছবি, দু-একটা ধূপকাঠি।

ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেবরানী দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "এতটুকু ঘরে কী করে থাকিস পুষ্প? দম বন্ধ হয়ে যায় না?" তারপর নিজের মনেই বলেন, "আমাদের ঘরখানা ঠিক গঙ্গার ওপরেই। নীচ দিয়ে তর তর করে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে।"

পুষ্পদি একেবারে যে কাশীতে যান নি, তা নয়। বছর তিনেক আগে দেবরানীর চাপে পড়ে একবার কাশী যেতে হয়েছিল। কিন্তু অজস্র বিধবা আর ন্যুব্জ বুড়ী, শুধু বাসনকেনা আর ছাইমাখা সন্ন্যাসী দেখা, শুধু রোজ গঙ্গা স্নান করে ইনফ্লুয়েঞ্জা লাগান ছাড়া তিনি কিছুই পান নি বারানসীধামে আঁকড়ে থাকার মত। এখন তাঁর অত্যধিক মানসিক যন্ত্রণায় তিন বছর আগেকার স্মৃতিতে জড়ানো বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের চুড়ো আরও কোনও মহৎ জীবনের ইঙ্গিত কিনা স্পষ্ট মনে না হলেও, অন্তত বর্তমানের পাঁক থেকে রেহাই পাবেন তিনি কাশী গেলে, এটুকু মনে হল তাঁর। দেবরানী একটা তোরঙ্গের ওপর মাথা কাত করে 'ঠাকুরের বাণী' পড়ছিলেন। মাঝে

মাঝে মুগ্ধ হয়ে হাসছিলেন মনে মনে। এক সময় মেয়েকে ডেকে বললেন, "শোন এ জায়গাটা—আমাদের একটি নিশ্বাসও তাঁর অজ্ঞাতসারে পড়বার উপায় নাই। যেদিন যা দরকার সব করিয়ে ঠাকুরটি আমাদের পূর্ণতার দিকে নিয়ে চলেছেন। কোনও চিন্তা নাই। নির্ভয়ে ডেকে চল। মাতৃ অঙ্কস্থিত শিশু কী ভাববে? সে যে চিরনির্ভর।"
"সব তুমি! সব তুমি! বিষয় তুমি, বৈরাগ্য তুমি, তত্ত্বজ্ঞান তুমি, অজ্ঞান তুমি; সাধক তুমি, সাধন তুমি, সাধ্য তুমি। যা বলি যা দেখি যা শুনি সব তুমি সব তুমি সব তুমি। তুমি ভিন্ন আর কিছু নাই। এক তুমি বহুরূপে কর অভিনয়। মাভৈঃ!"
স্বল্পপরিসর ঘরখানায় বিকেলের আলো নিভে আসছিল। পুষ্পদি উঠে আলো জ্বালাতে গেলে দেবরানী বাধা দিয়ে বলেন, "থাক না, এ বেশ লাগছে।" তারপর কি ভেবে বলেন, "অনেক দিন তোর গান শুনিনি পুষ্প। মনে হয় কত যুগ! এখন তো গুরুচরণ নেই, একটা গান কর না। সেই যে বিদ্যাপতির গানটা গাইতিস।"
একদিন মাস্টার রেখে গান শিখেছিলেন পুষ্পদি। একথা ভাবলে এখন তাঁর হাসি পায়। তবু দেবরানীর কথায় উঠে গিয়ে একটা স্টীলের ট্রাঙ্কের ওপর রাখা মাস্তার নতুন স্কেল চেঞ্জিং হারমোনিয়ামটা নামিয়ে আনলেন।
ঘরের যে দরজাটার গোড়ায় সন্ধ্যের অল্প অল্প আলো এসে পড়েছিল, সেই চৌকাঠের পাশে হারমোনিয়ামের ঢাকনাটা খুলে, অনেকক্ষণ এমনি এলোমেলো বাজতে থাকেন পুষ্পদি। দু-বার আস্তে আস্তে কেশে আঁচলের খুঁট দিয়ে থুতনিটা মুছে নিয়ে গান আরম্ভ করেন— "জনম অবধি হাম ও রূপ নেহারনু

নয়ন না তিরপিত ভেল।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু

তবু হিয়া জুড়ল না গেল ॥

প্রথম প্রথম তাঁর গলার স্বর চড়তে গিয়ে কিরকম ভেঙে যাচ্ছিল, কানে লাগছিল বড্ড কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সেটা সয়ে গেল। যা গলা দিয়ে পারছেন না তা যেন মুখের ব্যাকুলতা দিয়ে পুষ্পদি ফুটিয়ে তুলতে চাচ্ছেন। তাঁর আয়ত চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি, আর সকাতর মুখের ওপর বিকেলের নিষ্প্রভ আলোর গাম্ভীর্য। গান শেষ হয়ে যাবার পর সন্ধ্যে আরও ঘন হয়ে এল, বাজারের পাশে মোষের খাটাল থেকে, মোষগুলো অন্ধকারে গাঢ় বিষণ্ণ গলায় ডাকতে শুরু করল। দেবরানী নিজের মনে আবৃত্তি করেন, "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু," সঙ্গে সঙ্গে মাথা দোলাতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে নড়ে চড়ে উঠে বললেন, "আজ রাত্তিরেই জিনিসপত্তর গুছিয়ে রাখ পুষ্প। কাল সন্ধ্যেবেলা ট্রেন। তবু আজই

গুছিয়ে রাখ। নাড়ুকে বলে দিয়েছি একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে আসবে।"
রোগীমানুষ দেবরানী। সন্ধ্যে লাগবার কিছুক্ষণ পরেই সামান্য কিছু মুখে দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েন। সমস্ত বাড়িটা আটটা না লাগতেই ঝিমিয়ে পড়ে। পুষ্পদি একটা অনেক দিনের লেখা মলাট-আলগা গানের খাতা নাড়াচাড়া করছিলেন। এমন সময় দরজার কাছে পায়ের আওয়াজে চমকে ওঠেন। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিত্য।
নিত্যকে সচরাচর মোটেই শ্রান্ত দেখায় না। আজকে বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। ধীরে ধীরে সে বললে, "তোমার এখানে একটা মিটিং করব পুষ্পদি—সামনের সোমবার সন্ধ্যেবেলা তোমার বাড়ির পেছনের উঠোনেই। তুমিও থাকবে।" তারপর কি ভেবে ঘরের কোণটার দিকে এক নজর তাকিয়ে হেসে বললে, "বারান্দায় তোমার পুজোর ঠাকুর সরিও না যেন, তিনিও থাকবেন।"
পুষ্পদি হেসে বলেন, "বসো না নিত্য।"
নিত্য বলে, "তোমার কাশীবাসী মায়ের খবর কী? এবারও কি তিনি ক্যান্সারে মরবেন না?"
নিত্য ঠাট্টা করেছে এর আগেও, মৃত্যুপথযাত্রী দেবরানীর কথাবার্তা আর চিঠিপত্র নিয়ে। পুষ্পদিও যে এতে মনে মনে একেবারে সায় দেন নি, তা নয়। এরকম বৈরাগী সাজা তাঁর মায়ের পক্ষে শোভা পেলেও তাঁর নিজের অন্তত কোনও দিন ভালো লাগবে না, এই ছিল তাঁর ধারণা। কিন্তু আজ তার মুখে ঠাট্টার জবাবে কোনও সাড়াশব্দ না পাওয়ায়, নিত্য অপ্রস্তুত হল। জিজ্ঞেস করলে "কী ব্যাপার?"
"মা পাশের ঘরে শুয়ে আছেন।" কথাটা বলার পর তিনি যেন কি একটা বলব বলব করে থেমে যান হঠাৎ। তারপর বলে বসেন, "মার সাথে আমিও কাশী যাচ্ছি।"
"কাশী যাচ্ছ? কেন?" অকস্মাৎ হাসির ভাবটা মিলিয়ে গেল নিত্যর ঠোঁটের কোণ থেকে। জিজ্ঞাসার তীক্ষ্ণতায় তার চোখ দুটো ঝকমক করে উঠল।
পুষ্পদি ভাবছিলেন, বলবেন, সংসারে মন বসছে না। কিন্তু সেই জ্বলন্ত প্রতীক্ষমান চোখদুটির সামনে মনে হল, তা বড্ড সস্তা শোনাবে। কী যে বললেন কিছু না বুঝতে পেরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "মা বলছেন যেতে।"
"তাই যাবে? মা বলছেন বলেই যেতে হবে?" জিজ্ঞাসার তীব্রতায় কথাগুলো কর্কশ শোনাল। হঠাৎ গলা নামিয়ে নিত্য বললে, "কাশীতে কেন যাচ্ছ? শান্তি পাবে বলে? সুখ পাবে এই জন্যে? তা হলে ঘাটের মড়ারা কোথায় যাবে পুষ্পদি?" ব্যথায় কুঁচকে যায় তার মুখ। চোখ দুটো আবার তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। তারপর বেশ শান্ত গলায় মাথা নাড়িয়ে বলে, "তোমার যাওয়া হবে না।"

পুষ্পদি মুখ তুলে তাকান। একদৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে নিত্য বলে, "তোমার যাওয়া হবে না পুষ্পদি। তোমার যেমন মায়ের দাবি আছে, তেমনি আমাদেরও তো একটা দাবি আছে তোমার ওপর। যেদিন প্রথম তুমি চাঁদা এনে দিলে আমাদের পার্টির কাগজের জন্যে, তখন আমি অবাক হয়েছি। তখন কি জানতাম, তুমি গুল দিয়েছ, ঘুঁটে দিয়েছ সারা দুপুর ছাদে বসে, ঝাঁ ঝাঁ রোদ মাথায় নিয়ে, লুকিয়ে লুকিয়ে খবরের কাগজ বিক্রি করেছ। তোমার এত বড় প্রাণ আর তুমি যাবে কাশীবাসী হতে!" নিত্য উঠে দাঁড়ায়। তারপর যেন তার শেষ কথা জানিয়ে দেয় মাথা নেড়ে, "তোমায় যাওয়া হবে না।"

পুষ্পদি চুপ করে থাকেন।

যাবার সময় নিত্যর গলার আওয়াজ ভেসে এল, "পরশুদিন যদি সময় পাই আসব।"

কুড়ি

ফাল্গুন প্রায় যায় যায়। ইতিমধ্যে কয়েক দিন হল এমন জোর গরম পড়েছে যে, রাস্তায় কোন কোন জায়গায় পিচ গলতে শুরু করেছে। ঘূর্ণি হাওয়া দিচ্ছে আর তার সাথে ড্রেনের পাশে জমা শুকনো ধুলো উড়ছে।

চেতলার বাজারে একটা বটগাছের নীচে আশেপাশের গ্রাম থেকে একপাল বুড়ী ছুঁড়ী আঁচলে সেরখানেক সের দেড়েক করে চাল বিছিয়ে সারা সকাল বসেছিল। এখন বিক্রির শেষে রোদ্দুরের তাতে গাড়য়ে পড়ে আছে এ-ওর গা ঘেঁষে। সতীশের চায়ের দোকানের পাশে দুটো কুকুর এক টুকরো ছায়ায় বসে ঝিমুতে শুরু করেছে। খোলা নর্দমার ময়লাগুলো পর্যন্ত যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে।

পুষ্পদি ঝিম মেরে ঘরের এক কোণে কুঁকড়ে শুয়েছিলেন। যখন তাঁদের বহু পুরনো নিজের-মর্জিতে-চলা দেওয়াল ঘড়িতে টং টং করে তিনটে বাজার শব্দ হল, তখন ধড়মড় করে উঠে বসলেন পুষ্পদি।

ঘরের এক কোণ ভরে দেবরানীর জিনিসপত্র। প্রথম ট্রাঙ্কে ওষুধপত্র কাপড়চোপড় ভর্তি। আরও একটা লম্বা কাঠের তোরঙ্গ, জলের ঘটি, চট দিয়ে মোড়া বেডপ্যান, পিকদানি, দুটো নতুন বালতি, একদিকে একটা ফটো দেওয়াল থেকে খসে মুখ থুবড়ে

পড়ে আছে। পুষ্পদি উঠে ফটোটা তুলে নেন। মাস্তার ফটো। দশ-বারো বছর বয়সের তোলা ছবি। মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল, চোখে মুখে দুরন্ত হাসি। পুষ্পদি ছবিটাকে না টাঙিয়ে দেওয়ালের কোনায় উলটে রাখলেন।

এমন সময় ঘড়ঘড় করে শব্দ করতে করতে একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে দরজার কাছে থামল। দেবরানী নামলেন। সঙ্গে নামাবলী গায়ে এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক। ঘরের মধ্যে ঢুকে চারদিকে এক ঝলক চোখ মেলে বিস্মিত গলায় বললেন, "আশ্চর্য এখনও তোর জিনিষপত্র গোছাস নি। তাড়াতাড়ি নে। আমি গাড়িটাকে পাঁচটায় আসতে বলে দিয়েছি। এক ফাঁকে কালিঘাটে গিয়েছিলাম পুষ্প। নন্তবাবু আমাদের ঠাকুর মশাই, তাঁরই ছেলে ইনি। এত কম বয়সেই এত প্রবীণ লোক মা আমি কাশীতেই দেখি নি।" একটা চাপা গর্বের হাসি দেবরানীর মুখে ছড়িয়ে পড়ল। বললেন "আমি পাঁচ হাজার জপ নিয়েছি এবার। তুইও আমার সঙ্গে করবি। যেমন ছটফটে তুই, প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হবে.........!"

"আমি যাচ্ছি না মা তোমার সাথে।"

"যাচ্ছিস না?" স্তব্ধ আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন দেবরানী।

"কী সব বাজে কথা বলছিস! যাচ্ছিস না মানে?"

পুষ্পদি চুপ করে বসে থাকেন। স্বামী ছেলেকে নিয়ে যে সংসার গড়বার চেষ্টা করে-ছিলেন তা যখন তাসের ঘরের মত ভেঙে গেল, তখন মা-ই তো হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহায্য করতে। কী বললে তিনি কম আঘাত পান, পুষ্পদি তাই ভাবতে থাকেন।

"তুই কাকে ফাঁকি দিচ্ছিস পুষ্প? তুই তো জানিস আমি তোর ভালোর জন্যেই বলছি। এখানে থেকে তুই কি পাবি পুষ্প? কী দিয়েছে তোকে তোর সংসার?" এমন জোর দিয়ে বললেন কথাগুলো দেবরানী যে, পুষ্পদির প্রায় চোখ ফেটে জল আসছিল। আর তার মনের ব্যথাটা যেন আঁচ করেই দেবরানী আবার বলেন, "তা ছাড়া কত ভরা সংসার ছেড়ে মানুষ আসছে এখানে। কী দিতে পারে তোর সংসার, যার জন্যে তুই আঁকড়ে থাকবি এখানে? সেখানে গেলে তোর সব ব্যথা জুড়োবে। ঠিক গঙ্গার ওপরেই বাবা তারকনাথের আশ্রম। এমন সুন্দর ভজন হয় সন্ধ্যাবেলা, মন প্রাণ ভরে যায়।"

পুষ্পদি আগের মতই চুপ করে থাকেন। বাস্তবিক সংসার তাকে কিছুই দেয় নি, শুধু প্রত্যেক দিনের খুঁটিনাটি অপমানের ভেতর দিয়ে নিজেদের জীবনকে আরো ঘেন্না করতে শিখিয়েছে, আর নিজের জীবনের বাইরে যারা সুখী, তাদের শিখিয়েছে হিংসে

করতে। দেবরানী যা সচরাচর বলে থাকেন, তা অস্বীকার করবেন কী বলে। এ সংসার তার কাছে সত্যিই এক বিষকুম্ভ, ওপরে মধু, নীচে হলাহল।

দেবরানীর কথাবার্তায় কোনও ধর্মের ভড়ং ছিল না। পঁয়ষট্টি বছর জীবনের শেষপ্রান্তে এক বৃদ্ধার অকুণ্ঠ ধর্মবিশ্বাসে পুষ্পদি কিছু ব্যতিক্রম দেখলেন না। তার মায়ের আগের রূপ—সেই ঝকঝকে একরাশ গয়না গায়ে দিয়ে, পান খেয়ে লাল শাড়ি পরে পাড়া বেড়িয়ে পরচর্চা করে নিজের ছেলেমেয়ে জামাই-এর সুখদুঃখ তিলকে তাল করে বাঁচার যে যুগ, সে যুগ অনেক পেছনে। দেবরানী তাই আজ কাশীবাসী, বাবা তারকনাথের শিষ্যা। কিন্তু পুষ্পদি নিজে? পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়ষট্টি বছরের ব্যবধান যে অনেক দূর। কী করে মাকে বোঝাবেন যে, একবার তিনি বাঁচবার চেষ্টা করবেন অন্তত। সংসার তো তাঁকে কিছুই দেয় নি, কিন্তু দরকার হলে—দরকার হলে তাঁর স্বামীকে বাদ দিয়ে, তাঁর ছেলের স্মৃতিকে ভুলে গিয়ে একবার অন্তত বাঁচবার চেষ্টা করবেন পুষ্পদি।

দেবরানীকে কিভাবে কথাটা বোঝাবেন ভেবে না পেয়ে পুষ্পদি মাথা নীচু করে কাঁদতে থাকেন।

দেবরানী কাছে এসে মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। অনেক কাল আগে যে ভাবে ডাকতেন ঠিক সেইভাবে মাথার পেছন দিকের চুলগুলো নাড়তে নাড়তে ডাকলেন "পাগলী মা আমার।"

পুষ্পদি মাথা ঝাঁকালেন। তারপর কান্না-বিকৃত গলায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "আমি যাব না, আমি যাব না, তুমি চলে যাও মা।"

দেবরানীর মুখের এবার পরিবর্তন হল। এতক্ষণ ব্যথা ও বৈরাগ্যের যে তন্ময় ভাবখানি তার সমস্ত মুখ ব্যাপ্ত করেছিল তা কেটে গিয়ে ক্রমশ তাঁর মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। মুখের খাঁজগুলিতে বিদ্রূপের রেখা ফুটে উঠল। রোল্ডগোল্ডের চশমার ভেতর থেকে নিস্পৃহ চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমাকে এমন মা ভেবো না যে, আবার ডাকব। এই আমি শেষবারের মত বলছি, চলে আয়।"

পুষ্পদি চুপ করে থাকেন।

"বেশ আমি একলাই যাব। এরপর যদি শুনি তুই ফুটপাথে শুকিয়ে মরেছিস তবুও একবার দেখতে আসব না। এটা বেশ মনে থাকে যেন।"

ক্রোধে এবং মেয়ের প্রতি বিতৃষ্ণায় সম্পূর্ণ অন্য ধরনের দেখতে লাগছিল দেবরানীকে। মনেই হয় না যে, এই দেবরানী কাল রাত্তিরে সন্ধ্যের ঘন অন্ধকারে মেয়ের গান শুনতে শুনতে আবৃত্তি করছিলেন, "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু তবু হিয়া জুড়ন

না গেল।"

যতক্ষণ পর্যন্ত গাড়ি এসে না পৌছল, ততক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকলেন দেবরানী। যাবার আগে পুষ্পদি সাধাসাধি করলেন কিছু মুখে দিয়ে যেতে। কিন্তু দেবরানী কর্ণপাত করলেন না। একটি কথাও মেয়ের সাথে না বলে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। ঘোড়ার গাড়িটার গায়ে লেখা সেকেণ্ড ক্লাস। কিন্তু ঘোড়াটা যেমন বেঁটে, তেমনি রোগা জিরজিরে। দেবরানীর জিনিসের চাপে সমস্ত গাড়িটা মচমচ করে উঠল। গাড়োয়ানটির গায়ে ডিসপোজাল থেকে কেনা খাকি মিলিটারি শার্ট। তার প্রথম চাবুকে গাড়ি সামনে না গিয়ে পেছনে হটতে আরম্ভ করল।

গাড়োয়ান এবার মুখ থেকে একটা দীর্ঘ উদ্দীপনামূলক শব্দ বার করলে—ছোঃ ছোঃ ছোঃ……। সপাং করে দ্বিতীয় চাবুকটা পড়ার সাথে সাথেই দেবরানী আর তার মালপত্তরসুদ্ধ গাড়িটা মন্থর গতিতে সামনের রাস্তা দিয়ে গড়াতে গড়াতে বেরিয়ে গেল। সতীশের দোকানের করোগেটেড টিনের ছায়ায় লাল-সাদায় মেশানো যে কুকুরটা এতক্ষণ রোদ্দুরের তেজে ধুঁকছিল সে সামনে এসে একবার বিদায়ী গাড়িটা আর একবার দরজার গোড়ার চৌকাঠ ধরে চেয়ে থাকা পুষ্পদির পানে তাকিয়ে তারস্বরে ডাকতে শুরু করলে, "ভৌঃ ভৌঃ ভৌঃ ভৌঃ।"

সন্ধ্যেবেলা নিত্য চেতলার বাড়িতে গিয়ে অবাক।

চৌকাঠের ওপর একটি লোক উবু হয়ে বসেছিল। পায়ের আওয়াজে সে মুখ তোলে। তার মুখ জুড়ে এমন প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা আর বিরক্তি যে, ভদ্রলোককে চিনেও চিনতে পারে না নিত্য।

গুরুচরণ অন্যদিন নিত্যকে সম্বোধন না করলেও একেবারে চোখ ফিরিয়ে নিতেন না। আর খুন জখম দাঙ্গার কেসে মক্কেলদের নিয়ে বাইরের বৈঠকখানায় এতই ব্যস্ত থাকেন ভদ্রলোক যে নিত্যর অস্তিত্ব তাঁর সবসময় চোখে পড়ত না। আজ নিত্যর পায়ের আওয়াজ পেয়েই গলা খাঁকারি দিয়ে বলে উঠলেন, "কোন নাগর এসেছ বাবা?"

"পুষ্পদি আছেন?"

"কে, কে বলছ?"—ভদ্রলোক মুখ ভেঙচে চিৎকার করে ওঠেন। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, "পুষ্পদি? দিদি আবার কবে থেকে হল হে? নাম ধরেই ডাক না। উটুকু বাদ কেন?"

নিত্য ফিরে যাবে কিনা ভাবছিল, এমন সময় ভদ্রলোক আবার বলে উঠলেন, "যাবে

কেন বাবা! এসেছ গাঁটের পয়সা খরচ করে, যাও না ভেতরে। একেবারে মালা গেঁথে বসে আছে তোমার জন্যে।"

নিত্য উঠে এল বারান্দায়। গুরুচরণ চৌকাঠ ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। তারপর লুঙ্গিটা হাঁটুর ওপর তুলে কাউকে শোনাবার জন্যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে শুরু করেন "কত ঢলাঢলি, একবার পুলিশ আসুক, টেরটি পাবেন।"

"পুষ্পদি," নিত্য দোরগোড়া থেকে ডাকল। পুষ্পদি বেরিয়ে আসতেই নিত্য চমকে যায়। তার চেহারা এমন পালটে গেছে, স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি নিত্য। যেন একটা মস্ত ঝড় বয়ে গেছে আর ঝড়ের পরেই নেমেছে এক প্রশান্তি। আগেকার সেই ঝলমলে ভাবটা একেবারে নেই। বেশ রোগা দেখায় তাঁকে। মাথায় কাপড নেই, বেশ টান করে অবিবাহিত মেয়েদের মত করে ঘাড়ের ওপর দিয়ে কাপড় ফেরানো। আগে দাঁড়াতেন দরজার কোণ ধরে। এখন সমস্ত দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাই অন্য রকম।

"দরজাটা ভেজিয়ে দাও। বড্ড গোলমাল আসছে," ভারী, শান্ত গলা পুষ্পদির। নিত্য আঁচ করতে পারে একটা ব্যাপার হয়েছে। এমন একটা কিছু বড় রকমের ঘটে গেছে, যেটার প্রসঙ্গ এড়িয়ে চললেও ঠিক এসে যাবে। কিছুক্ষণ বসে থেকে যার কোন কালেই কোন মানে হয় না সেই প্রশ্নটাই করলে শেষ পর্যন্ত, "কেমন আছ?"

"এখান থেকে চলে যাচ্ছি।"

"কাশী?"

"না। আপাতত কালিঘাটে এক ভাইয়ের বাড়ি। প্রথমটা খুব ছি ছি করবে লোকে, তা করুক। আমি গেলেই নিশ্চয় ভাইটি রান্নার লোক ছাড়িয়ে দেবে। কিন্তু আর পারা যায় না। নিজেকে আর ফাঁকি দেব না এভাবে।" বাইরে গুরুচরণের চিৎকার শোনা যায়। কোন এক অদৃশ্য শ্রোতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সে কি যেন বলছে। পুষ্পদি দরজার দিকে এক নজর তাকিয়ে একটা ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। দু-হাতের মুঠো চোখের দিকে মেলে দিয়ে বললেন, "আমি তাকে বলেছি যদি অসুস্থ হও তোমায় দেখব। কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকতে পারব না। না, না, থাকা আর সম্ভব না।"

খোলা চুলগুলো আরও ছড়িয়ে দেন পিঠের ওপর পুষ্পদি। অনেক চুল পড়ে গেছে। কিন্তু কানের দু-পাশ দিয়ে কোঁকড়া চুলের বাহার এখনো মরে নি।

হঠাৎ বলে ওঠেন পুষ্পদি "আমি জানি তুই আমায় মিটিং করতে বলবি, মিছিল করতে বলবি।"

"তা আমি বলতে যাব কেন ?"

"না ঠিক হয়তো বলিস না কিন্তু এটা যেন তোর মনের ইচ্ছে। তবে আমার কাছে তো সেটাও কাশী যাওয়ার মত। সেও তো এক ধরনের ফাঁকি দেওয়া নিজেকে। আমিও বাঁচতে চাই নিত্য। কিন্তু ঠিক নিজের মত করে। এত সহজে হেরে যেতে রাজী নই।" আঁচল দিয়ে মুখ মুছে পুষ্পদি চুপ করেন।

নিত্য বললে "তোমার সেই নিজের মত বাঁচাটা কি ?"

পুষ্পদি ছেলেমানুষের মত নিত্যর পাশে বসে পড়েন। নিত্যর হাতটা নিজের হাতে টেনে নিয়ে বলেন, "তা বলব কেন ?"

নিত্য বললে, "সাংঘাতিক মেয়েমানুষ তুমি। এ সময়েও তোমার হাসি আসে।"

"কেন আসবে না ? এতদিন খালি কেঁদেছি, খালি কেঁদেছি। এখন কাঁদলেই চোখ জ্বলে। আর বুকের ভেতর এমন বিচ্ছিরি লাগে। কাল সারা দিন ধরেই খিটিমিটি লেগে আছে। মাঝ রাতে বৃষ্টি এল। মনে হল মান্তা শুয়ে আছে পাশে। জেগে দেখি কেউ নেই। মনে হল আবার নতুন করে আমার কেউ নেই। কিন্তু কান্না এল না। নিত্য জানিস আমি গান শিখব ?"

"গান ?"

"হ্যাঁ। একেবারে নতুন করে সরগম থেকে।"

বাড়ি ফেরার পর কতকগুলো কথা নিত্যর মনে পাক খেতে থাকে। গত কয়েক মাস অবিরাম মিটিং ও মিছিলের ভেতর যে কথাটা চাপা পড়ে গিয়েছিল সেটা আবার মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে। সে তো চায় মানুষের আরো গভীরতর যোগসূত্র আবিষ্কার করতে। সে তো সব সময় এই চারপাশের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলোকে একটা প্রকাণ্ড মালায় গাঁথতে উৎসুক, কিন্তু কাজে সে কতদূর এগিয়েছে ? মিটিং-মিছিল এগুলো তো কোন আলাদা ঘটনা নয়, এ তো সেই মানুষের কাছে বার বার ফিরে ফিরে আসারই এক রূপ। কিন্তু এই ঘটনাগুলো কেন আলগা হয়ে থাকে, কেন সে সমস্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোকে গাঁথতে পারে না একটা মালার মত ?

আবার যখনই সে জোর করে কেবল নিজের মনের মত করে একটা ঘটনার সঙ্গে আর একটা ঘটনা জুড়ে দেয় তখন নিজের কাছেই ধরা পড়ে যায়। মনে হয় মনগড়া। পুষ্পদি-কে সে তো জোর করে জুড়ে দিতে পারল না আর একটা ঘটনার সঙ্গে যেটা তার কাছে প্রিয়। অথচ পুষ্পদি তাতে তো ছোট হয়ে গেল না, ভেঙে পড়ল না। যেন নিজের জোরেই সে নিজেকে মেলে ধরল। আর মানুষ যেখানেই নিজেকে

মেলে ধরছে সেখানেই সে এত আকর্ষণীয়, এত উজ্জ্বল যে নিত্যর মনে হয় সেদিকে ছুটে যাওয়া ছাড়া অন্য পথ নেই।

আরও কারো কারো মত নিত্যগোপাল শুধু আগামীকেই তার জীবনে প্রাধান্য দিতে পারছে না। আগামী তা যতই সুন্দর ও সার্থক হোক না, সেখানে মানুষের প্রতি অপমান যতরকম ভাবেই বিতাড়িত হোক না কেন সে তার চারপাশের ভাঙা শুকনো— কখনো কখনো উজ্জ্বল আবার কখনো নিভন্ত—এই পথ হাতড়ানো জীবনকে অস্বীকার করবে কোন মুখে? কোন মুখে সে বলবে আমি যা দেখছি তা নেই, আমি যা ভাবছি তাই আছে।

সঙ্গে সঙ্গে নিত্যগোপালের একটা কথা বেশ প্রাসঙ্গিকভাবেই মনে পড়ে। সেই অনেক কাল আগেকার কর্ম ও ফলের প্রশ্ন নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সূত্রে তার মাঝে মাঝে মনে হয়। তার সহকর্মী সুনীল সেন ভারতবর্ষের সমাজ বিপ্লবের দিন সন তারিখ ঠিক করতে শুরু করে দিয়েছে। শুধু সুনীল কেন আরো কারো কারো মনে সমাজ বিপ্লবটা এমন চমৎকার উপসংহার হিসেবে খাড়া হয়েছে যে বর্তমান জীবনের যন্ত্রণাময় পরিচ্ছেদগুলো মনে হচ্ছে বড্ড বেশী আর অসম্ভব। তার ফলেই যে সমস্যাটা নিত্যকে তার কৈশোর থেকে যৌবন পর্যন্ত প্রেরণা দিয়ে গিয়েছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের গভীরতর সম্বন্ধ আবিষ্কারের সেই সমস্যা তার বন্ধুবান্ধবদের কারো কারো কাছে মনে হয় থিয়োরি কিংবা এমন এক ধরনের একান্ত নিজস্ব পাগলামি যার সঙ্গে সমাজের আর সমস্ত লোকের খাওয়া-পরা-চলা-ফেরার কোন সম্পর্ক নেই। নিত্য কিছুতেই মানতে পারলে না তার প্রত্যাশা অস্বাভাবিক, তার চিন্তাধারা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে।

তা ছাড়া সাধারণ মানুষের জীবন তো একটা চাঁদিনী-প্রান্তর নয়। সে প্রান্তরে পোড়া মাটি, কাঠ, পাথর, ঘাস, ফুল সবই আছে। নিত্যর সব সময় একটা ভয়। সেটা হল মিথ্যের। সে যা ভাবছে তা যদি ভিত্তিহীন হয় তাই ভেবে সে অস্থির হয়ে পড়ে। সম্প্রতি তার অস্থিরতার আর একটা কারণও তাই। সাধারণ মানুষের জীবনের কাছ থেকে দূরে থেকে তাদের সম্বন্ধে নানা ধরনের চিন্তা করা এ যেন একটা প্রচণ্ড সত্যের অপমান বলে মনে হতে থাকে। মনে হতে থাকে সে একটা মনগড়া জগতের বাসিন্দা।

নিত্যগোপাল ভাবলে, আমার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে।

"আমি তো কিচ্ছু চাই নি"

একুশ

এম-এর রেজাল্ট বেরিয়েছে ক-দিন হল। অনিমেষ বলে একটি ছেলে প্রথম হয়েছে ফার্স্ট ক্লাসে। আর একজন কে দ্বিতীয়। অমিয় প্রায় তৃতীয়তে নেমে এসেছে। প্রথম দুটি ছেলের ভেতর একটি ফরেন সার্ভিসে ভালো পরীক্ষা দিয়েছে। যুগপৎ এরকম সাফল্যে ভালো ছেলেদের মধ্যে থেকে অমিয়র নামটা ঠিক চাপা পড়ে না গেলেও বেশ কম শোনা যাচ্ছিল।

অমিয়র প্রথমে খুব আফসোস হয়েছিল। জীবনে কিছুই করবার কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই তার। কাজেই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়াটা তার পক্ষে দরকার ছিল। অন্তত গুণমুগ্ধ আত্মীয় বন্ধুদের এবং বিকেলে 'সাউথ হলের' আড্ডায় এটুকু বোঝাতে পারত সে, অন্তর পড়াশোনার ক্ষেত্রে সিরিয়াস ছিল জীবনে:

ইউনিভার্সিটি পার হয়ে একটা কথাই সর্বক্ষণ নাড়া দিয়েছে তার মনে। তেইশ-চব্বিশ বছর কোনও রকমে কাটিয়ে দেওয়া গিয়েছে। এখন কী করবে? সেই পুনরাবৃত্তি? সেই চাকরি করতে গিয়ে প্যান্টের সামনে বোতাম আছে কিনা, জুতোয় কালি আছে কিনা, গালে দাড়ি আছে কিনা, তদারক করতে হবে রোজ সকালে উঠে। তারপর চাকরি পেয়ে কিছুটা ইনক্রিমেন্ট হবার পরই মা বলবেন, তাঁর বড্ড একলা লাগছে। তারপর নির্ঘাত বিয়ে, সে যেভাবেই হোক। সিভিল ম্যারেজ কিংবা শালগ্রাম শিলা নিয়ে। বিয়ের পর রোজ রাত্তিরে গলা ভারী করে মিথ্যে কথা বলবে বৌকে। বছর না ঘুরতেই বাচ্চাকে মাখাবার জন্যে অলিভ অয়েল আর পেটের গণ্ডগোলের জন্যে ওয়াটারবেরি কম্পাউণ্ড কিনে আনবে। স্যুট বানাবে নতুন নতুন। তারপর পেটে থাক পড়বে, চুল পাতলা হবে। মারা যাবার আগে নিশ্চয়ই বালিগঞ্জ বেড়ে বেড়ে ঢাকুরিয়া থেকে দশ মাইল এগিয়ে যাবে। তার শেষ প্রান্তে একখানা তিনতলা বাড়ি করে নীচের তলা ভাড়া দিয়ে শেষে ভাড়াটের সাথে একদিন হৈ-চৈ করে ব্লাড প্রেসারের স্ট্রোকে মারা যাবে।

অমিয়র মনে হচ্ছিল, তার জীবনের কোনও পাতাই আর অলিখিত নেই। মনের মধ্যে একটু নাড়াচাড়া দিলেই এক, দুই, তিন, চার করে শেষ পাতাটাও তার জানা হয়ে যায়। আর মনে হয়, এ রাস্তা এমন এক দুর্নিবার নিয়তির মত যে, হাঁ করে গিলতে আসছে তাকে। কোনও পথ নেই পালাবার।

শীতের সকালে এক রোববার গোলদিঘির কোনায় এক বেঞ্চিতে বসে, একটি সবুজ

রঙের র‍্যাপার দিয়ে কান থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত মুড়ে উবু হয়ে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক রোদ পোয়াচ্ছিলেন। অমিয় ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। পাশে ঝপ করে বসে পড়েই বলে, "বড্ড শীত পড়েছে দাদু না ?"

বিরক্ত হন ভদ্রলোক। ঘাড়ের ওপর থেকে আলোয়ান নামিয়ে তাকান। দেখেন, এক-জোড়া বড় বড় চোখ তাঁর মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। শ্লেষ্মা নামাবার জন্যে গলা খাঁকারি দিয়ে রুক্ষভাবে বলে ওঠেন, "কী চান আপনি ?"

অমিয় ঘাবড়ায় না। মনে হল বৃদ্ধের মুখের খাঁজ সত্যিই তাকে মোহিত করেছে। রাস্তার কুকুরের রোঁয়া-ওঠা লেজের মত কয়েকটা চুল মাথার আশেপাশে, কানের এদিক সেদিক থেকে ঝুলছে, নইলে প্রায় টাক। চোখজোড়া ঢুকে গিয়েছে গভীর কোটরে। মোটা সুতোর মত অজস্র রেখা সমস্ত কপাল ছেয়ে আছে।

অমিয়র মনে হল, ভদ্রলোক বোধ হয় গত সাত দিন দাড়ি কামান নি। কিন্তু দাড়ির খোঁটাগুলো এত মোলায়েম আর কুঁচকানো চামড়ায় ভেতর এমনভাবে ঢুকে গিয়েছে যে, মাকুন্দ বলে ভ্রম হয়।

অমিয় হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, "আপনার বয়স কত দাদু ?"

এরকম বেয়াড়া প্রশ্নে অবাক হলেও ভদ্রলোক নিজের অজান্তেই বলে ফেলেন "বিরাশী।" বৃদ্ধের ফোকলা দাঁতের পাশেই অস্বাভাবিক লাল মাড়ি দিয়ে নাল গড়িয়ে পড়ল, কথা বলবার সময়।

র‍্যাপার দিয়ে মুখ মুছে ভদ্রলোক একবার কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন অমিয়র দিকে। তাকাবার সময় প্রায় ঠিকরে বেরিয়ে আসে তাঁর চোখের মণি। তারপর একটু পাশ ফিরে যেখানে কালো তক্তার ওপর থেকে ছেলেরা ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে জলে, সেদিক পানে তাকিয়ে দু-পাটি মাড়ি দিয়ে চিবানোর মত মুখভঙ্গি করতে থাকেন। যেন সমস্ত অতীতের জাবর কাটছেন।

কলেজ স্ট্রীটের মাথার ওপর শীতের আকাশটা সম্পূর্ণ আলো হয়ে ওঠে নি। দূরে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের দিকটা থেকে সবে-ওঠা সূর্যের ফালি ফালি রোদ সিনেট হলের মাথার ওপর দিকগুলো রাঙিয়ে দিয়েছে। কতগুলো বৌ কাপড় কাচছে মাথা নীচু করে। এত সকালেই বাচ্চাদের কয়েকটা কালো হাফপ্যান্টে উপুর হয়ে সাবান দিচ্ছে কয়েকজন।

ময়রাদের একজন মোটা গোছের লোক শীত কাটাবার জন্যে আষ্টেপৃষ্ঠে তেল মাখছিল। এখন হুশ করে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মহাবোধি সোসাইটি হলের পাশের বাড়ি থেকে একটি ছেলে তারস্বরে চিৎকার করে পড়ছে, "কলিঙ্গ বিজয়ের

অমানুষিক অত্যাচার দেখিয়া—অমানুষিক অত্যাচার দেখিয়া—রাজা অশোক ব্যথিত হইলেন। কলিঙ্গ বিজয়—কলিঙ্গ বিজয়—"

অমিয় জলের পাশে রেলিং ধরে ভাবছিল, তার মনে পড়ল মহাভারতের যযাতির গল্প। যদি এমন কোনও ক্ষমতা থাকত তার হাতে, যা দিয়ে সে ঐ বেঞ্চির ওপরে উবু হয়ে বসে থাকা বৃদ্ধ বনে যেতে পারত, এড়িয়ে যেতে পারত সামনের এতগুলো বছরের অর্থহীন ডামাডোল। অমিয়র মনে হয়, সত্যি কি কোনও মানে আছে বেঁচে থাকার ?

বাঁচার ইচ্ছে না থাকলেও বাঁচার চেষ্টা করতে হয়। অমিয় পরদিন সকালে তাদের হেড অফ দি ডিপার্টমেন্টের বাড়িতে গেল।

হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট মি. ব্যানার্জীর বাড়ি বালিগঞ্জ প্লেসে। দোতলা হলুদ রঙের বাড়ির সামনে কেয়ারি করে সিজন ফ্লাওয়ারের বীজ বোনা। মাঝে মাঝে কাঠি পোঁতা। শুধু চারার মুখগুলো দেখা যাচ্ছে, আর ঠিক গেটের ওপরই বোগেনভিলার ঝাড় দোল খাচ্ছে হাওয়ায়। অনেকক্ষণ বেল দেবার পর দোতলার ঘরে একপাটি জানালা খুলে গেল। অত্যন্ত কর্কশ কণ্ঠে আওয়াজ আসে "কে ?"

বছর তিরিশ বয়সের রোগামত এক ভদ্রলোকের মুখ বার হয়। সরু পাতলা নাক। এই বয়সেই প্রায় টাক পড়েছে। কপাল আর নাকটাই চোখে পড়ে মুখ দেখলে।

"মিঃ ব্যানার্জী নেই তো। বেরিয়ে গিয়েছেন সকাল বেলায়," বলেই দড়াম করে জানালার পাল্লাটা টেনে দিলেন ভদ্রলোক। অমিয় প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "বাঃ আমি তো ফোন করেছি কাল সন্ধ্যেতে। উনি বললেন, আজ সকালে থাকবেন। আপনি একবার ভালো করে দেখুন। এখনও তো আটটা বাজে নি।"

ভদ্রলোকের কর্কশ গলা আবার বেজে উঠল, "ইউনিভার্সিটির কোনও বোর্ডের মিটিং আছে বোধ হয়। কাকার তো আর নাভিশ্বাস ফেলার সময় থাকে না।"

অমিয় চিনতে পারল। অন্তত ব্যানার্জীর ভাইপোর সম্বন্ধে সে শুনেছে কিছুটা। দু-বার আই-এ ফেল করে সওদাগরী কোনও আপিসে কলম পিষেছেন কয়েক বছর। এখন গত দু-বছর হল মিঃ ব্যানার্জীর প্রাইভেট সেক্রেটারি। অর্থাৎ ইণ্টারমিডিয়েট ও বি-এর খাতায় লাল নীল পেন্সিল দিয়ে নম্বর যোগ দেন। কেউ কেউ বলে, গার্জেনদের কাছ থেকে দু-চার পয়সা পেলে উনত্রিশকে ছত্রিশও করে দেন কখনও কখনও।

ক্ষুন্ন মনে অমিয় ফিরে আসছিল। ব্যানার্জীর সঙ্গে দেখা গেট ছাড়িয়েই। বাজার করে ফিরছেন। চাকরের মাথায় ঝুড়ির ওপর একফালি পাকা কুমড়ো আর পুঁই

ঝুঁটি দেখা যাচ্ছে।

"এই যে কী খবর অমিয়? তোমায় বসায় নি পানু?" কথাটা শেষ না করেই চিৎকার করে ডাকতে আরম্ভ করেন, "পানু পানু, দরজাটা খুলে দিতে পার নি এখনও?" দোতলার জানালা থেকে সাঁৎ করে ভাইপোর মাথাটি সরে যায়।

চাকর এসে কোকোর সঙ্গে পাতলা করে মাখন মাখানো এক স্লাইস পাঁউরুটি দিয়ে গেলে খবরের কাগজ থেকে মুখ তুললেন ব্যানার্জী। প্রশস্ত কপাল, বড় বড় চোখ, কম বয়সে নিশ্চয়ই প্রখর ছিল। এখন কেমন ড্যাবডেবে ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে। পাতলা সুন্দর মুখ, বেশী বয়সেও গাল মোটা হয়ে যায় নি। খালি ঠোঁটের ওপর একটা মাঝারি গোছের আঁচিলে মুখশ্রী কিছুটা ক্ষুণ্ণ। অমিয়র বড্ড চমৎকার লাগত ব্যানার্জীকে, যখন জুলিয়াস সিজার পড়াতে পড়াতে অ্যাণ্টোনিওর স্পিচ আবৃত্তি করতেন তিনি।

"কী করবে এখন ভাবছ?"—মাথাটা কাগজ থেকে তুলে ব্যানার্জী জিজ্ঞেস করেন।

"একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা করতে হবে আর কি!" হাসবার চেষ্টা করলে অমিয়।

কোকোর কাপে চুমুক দিয়ে বললেন ব্যানার্জী, "আমি ভাবছিলাম, তোমায় একটা কথা বলব। বলছিলাম কি, জেনারেল লাইনে তো আর ফিউচার নেই!"

অমিয় চুপ করে থাকল। এই জেনারেল লাইন ও টেকনিক্যাল লাইনের তারতম্য তার বাবা, মা, বাবার বন্ধু, মামা, মামার শালা, বন্ধুর বাবা, পাড়ার দাদা ইত্যাদি লোকের মারফত এতবার শুনেছে যে, নেহাত যন্ত্রের মত মাথা নাড়িয়ে বললে সে, "হ্যাঁ কোনও ফিউচার নেই।"

ব্যানার্জী চেয়ারে নড়ে চড়ে বসে একটু সহজ হয়ে নিলেন। বললেন, "সেদিন গিরিশ সেন এসেছিল। গিরিশ সেন-কে চেন না? আমার ক্লাসমেট। কলেজে আমি ফার্স্ট, ও সেকেণ্ড। এখন একুশশো টাকা মাইনের সরকারি চাকুরে। নট্ এ জোক্!"

রুটির মাখন ব্যানার্জীর ঠিক ঠোঁটের ওপরেই আঁচিলের গায়ে লেগে গেল। দু-তিন-বার বড় বড় চুমুক মেরে কাপটা নিঃশেষ করে, পকেট থেকে রুমাল বার করে ঠোঁট মুছে বললেন, "গত মাসে ওর ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলাম।"

"কী করেন উনি?" আলোচনার গতি যেদিকে মোড় নিচ্ছিল, তাতে অমিয় কি ভাবে তার কথাটা পাড়বে, বুঝে উঠতে পারছিল না। কিছুটা মোসাহেবি উৎসাহ তার গলায় ফুটে ওঠে।

ব্যানার্জী বলেন, "কস্ট্ অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট। আচ্ছা অমিয়, তুমি অ্যাকাউনটেন্সি পড় না কেন? এই তো তোমাদের সাবেজেকটেরই ছেলে পরেশ বোস—চার-পাঁচ বছর

আগে বেরিয়েছে। আমার জামাই বলছিল, সে নাকি এ লাইনে খুব শাইন করেছে।"

অমিয়র মনে পড়ল, আর এক ব্যানার্জীকে। গত বছরেই এই সময়ে তাঁর সংগীতময় গলার আওয়াজ এখনও তার কানে ভেসে আসছে। সেই জুলিয়াস সিজারের সীন—যেন রোমের প্রান্তরে হাজার হাজার নগরবাসীর সামনে ব্যানার্জী দাঁড়িয়ে আছেন—"Friends, Romans, countrymen, lend me your ears, I come to bury Caesar, not to praise him…"

কিংবা ব্যানার্জীর সেই চোখ মনে পড়ছিল, আঠারো নম্বর ঘরে অ্যাণ্টনি ক্লিওপেট্রার শেষ সীনে ব্যথায় উন্মাদের মত যে চোখ বেঞ্চে বেঞ্চে ছেলেমেয়েদের সামনে নেচে বেড়িয়েছে, সেই অদ্ভুত আশ্চর্য গলা, হ্যামলেটের সলিলোকি আবৃত্তি করবার সময় বুকের ভেতর এমন হ্যাঁচকা টান মেরেছে, যা শত কাজেও অমিয় ভুলতে পারে নি। অমিয়র এতগুলো বছরের কলেজের জীবন মনে হল স্রেফ ভুতুড়ে। যেন তা ফরফর করে সামনের কাগজটার মত উড়ছে।

অমিয় ভাবল, এখন বোধ হয় ব্যানার্জী বলবেন, বিজনেস করতে। বলবেন বোধ হয়, তাঁর ভাইপো কেমন রেফ্রিজারেটারের ব্যবসা ফেঁদেছে।

ব্যানার্জী আঁচ করতে পারেন অমিয়র বিমনা ভাবের কারণ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ে, এই ধরনের কত ছেলে শেক্‌সপীয়ার-মিলটনের জগতের বাইরে হঠাৎ এসে পড়ে যখন পরম নির্ভয়তায় তাঁর দিকে হাত বাড়িয়েছে, তখন কী দারুণ আশ্চর্য হয়েছে তাঁর কথাবার্তা শুনে। ব্যানার্জী ভাবছিলেন, তিনিও তো এরকম ছিলেন প্রথম জীবনে, যখন তিনি প্রোফেসর হয়ে এলেন। তারপর থেকে কি করে প্রতি দিন প্রতি মাসের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে তিনি নিজেকে বদলে নিয়েছেন, সে তো একটা ইতিহাস। অবশ্য তিনি কোনদিন চাকরি পার্মানেণ্ট করবার জন্যে কোনও পরিবারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ম করে পিংপং খেলেন নি, কিংবা তাঁদের মধুপুরের বাড়িতে আম নিয়ে যান নি, একজামিনারশিপ পাবার জন্যে। কিন্তু তিনিও তো জোচ্চুরি করেছেন, মিথ্যে কথা বলেছেন, কান ভাঙিয়েছেন নিজের সুবিধের জন্যে। হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে আপাদমস্তক অমিয়কে একনজর দেখে নিলেন ব্যানার্জী। বড় বড় একজোড়া জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি বোধ হয় প্রোফেসর হতে চাও?"

ঝট্‌ করে কথাটা যেন চ্যালেঞ্জের মত ছুঁড়ে মারেন ব্যানার্জী অমিয়র মুখের ওপর। তারপর সামনের দিকে মুখ বাড়িয়ে অন্তরঙ্গতার সুরে বলেন, "বিশ বছর আমি

চাকরি করছি। সেদিন আর এখন নেই,—এই লাইনে কোন আইডিয়ালিজমই নেই। তা ছাড়া দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমাদের আর ক-দিন! ইংরেজি বড় জোর দশ বছর, তার চেয়ে...”

অমিয় মনে মনে কথাটা পূরণ করে দিল “তার চেয়ে বিজনেস করো না।”

ব্যানার্জীও তাই বললেন, “আমার এক ছোট ভাই অ্যাডভোকেট। গত দু-তিন বছর হল ম্যাঙ্গানিজ নিয়ে এমন একটা সুন্দর বিজনেস শুরু করেছে, চমৎকার লাইন.........”

বাড়ি ফিরে অমিয় দেখল, বাবা-মার একই সঙ্গে দুখানা চিঠি। বুড়ো বুড়ী রাঁচী যাবার জন্যে বড্ড চেঁচামেচি লাগিয়ে দিয়েছে। তাই ভালো। একটু হাওয়া লাগুক। অমিয় ঠিক করল, কয়েক দিনের জন্যে অন্তত তার বন্ধুবান্ধবদের আড্ডা ছেড়ে বাইরে ঘুরে আসবে।

বাইশ

যুদ্ধের সময় রাঁচী শহর যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মিত্রপক্ষের এক মস্ত ঘাঁটি ছিল, যুদ্ধ শেষ হবার পরও তা বোঝা যায়।

বোঝা যায়, শহরের আশেপাশে শিখ রেজিমেণ্টের ছাউনি দেখে, রাস্তার ধারে ধারে হলুদ রঙের কাঠের সাইনবোর্ডে কালো কালো হরফে লেখা রাস্তা-নির্দেশের সংকেতে, বাজারের প্রায় সমস্ত স্টলে আমেরিকান আর্মি এডিসানের বই-এর ছড়াছড়িতে।

বাজারের ভেতর কয়েক জায়গায় বিলিতি মদের দোকান খোলা হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হবার বছর দুই পর এখন সেগুলোর অবস্থা মন্দা, বাইরে হিন্দী গানের রেকর্ড চালিয়েও খদ্দের জোগাড় হয় না। ডুরাণ্ডার ঝাড় দিয়ে ঘেরা সাহেবদের ছোট ছোট বাংলোগুলো এখন বেশীর ভাগই পাঞ্জাবী মেজর কিংবা মাদ্রাজী কোনও আর্মি অফিসারের আওতায়। স্টেশনের ধারেই কতগুলো পরিষ্কার ঝটঝটে হোটেল। গ্র্যাণ্ড হোটেল বলে যে হোটেলের নাম শুনেই সম্ভ্রম জাগে, সেটা অবশ্য প্রথম স্তরের নয়। প্রথম স্তরের হোটেল বি-এন্-আর-এ সাহেবদের আমলে টেনিস খেলা লেগেই থাকত। এখন অবশ্য জর্জেট সিল্কের শাড়িকে খুব সাপটে সুপটে সামলে

টেনিস খেলতে দেখা যায় জনৈক তরুণী অফিসার-গৃহিণীকে খাকি হাফপ্যাণ্ট পরা যুদ্ধে ফাঁপা কোনও কনট্রাকটরের সঙ্গে।

রেল-লাইনের গায়েই অনন্তপুরে সুবোধ যে বাড়িটা ভাড়া নিল, তার সবসুদ্ধ পাঁচখানা ঘর। বেশ ঝকঝকে পরিষ্কার একতলা বাড়ি। গেটের ওপরই একটা মস্ত শিরিষ গাছ সকাল বিকেল হাওয়ায় দোল খায়। ভাড়া এক বন্ধুর মারফত ঠিক হয়েছে মাসে পঁয়ষট্টি।

বাড়ির পাশেই বিস্তৃত মাঠ আর তার পেছন দিকে সেক্রেটারিয়েট বিলডিং। গরমে বিহারের হেডকোয়ার্টার রাঁচীতে আসে বলে সারি সারি সরকারি কর্মচারীদের কোয়ার্টার তৈরি হচ্ছে। তিনখানা ঘর, একখানি বারান্দা আর উঠোন। কিছুদূর পর পর একটা করে কুয়ো।

মাঠের অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ কতকগুলো বাড়ি। তাদের সবশেষের বাড়িটার দরজায় অ্যালসেশিয়ান কুকুর বাঁধা। সাইকেলের রডে ফুলকপি ঝুলিয়ে হাফপ্যাণ্ট পরা এক সৌখিন প্রৌঢ় ভদ্রলোক রোজ সকালেই বাড়িটায় ঢোকেন। কয়েক দিনের মধ্যেই রাস্তাঘাটে চলতে গিয়ে হাসিদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়ে গেল। হাসির এখানে এসে প্রথম ক-দিন যে কি ফুর্তি তা বলা মুশকিল। প্রথমত ইলেকট্রিক লাইটসুদ্ধ এই ছিমছাম বাড়িখানা কী করে এত কম টাকায় পাওয়া গেল, তা ভেবেই তার আশ্চর্য লেগেছিল। সুবোধ অবশ্য প্রথম দিক থেকেই খিঁচড়িয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটায়। খুব আন্তরিক ভাবে বলতে গেলে, তার মোটেই ইচ্ছে ছিল না, হাসিকে নিয়ে আসার।

বিয়ের আগে আপিস করে যখন সত্যগোপালের বাড়ি যেত সুবোধ, তখন হাসিকে মনে হত অন্য রকম। হাসি ছিল একখানা অজানা বই, যার মলাট পর্যন্ত খোলা হয় নি, প্রত্যেক পাতায় পাতায় লুকিয়ে আছে বিস্ময়। আর এখন এক-মাসের মধ্যেই তার মনে হচ্ছিল যে, আর পড়ার কিছুই নেই। হাসির ভেতর যা আছে, তা প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে তার।

হাসি কিন্তু খুব বদলায় নি। তার সেই অগোছাল মনের ভাব, সব ব্যাপারেই আশ্চর্য হওয়া, সব সময় নিজেকে ছিমছাম করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা, এ সবই তার বজায় আছে। সত্যি কথা বলতে কি, আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে হাসি বাইরের লোকের চোখে। এক তিল মাংস লাগে নি বিয়ের পর, অথচ গলার কণ্ঠার হাড়ের ওপর একটা পাতলা চামড়ার আবরণ পড়েছে আর চাউনির মধ্যে কৌতূহল বেড়ে গেছে। ব্যাপারগুলো সুবোধের ঠিক নজরে আসে না। তার মনে হয়েছে হাসিকে তাদের

কলকাতার বাড়িতে রেখে দিয়ে এখানে এসে কোনও মাঝারি হোটেলে মাসিক একটা মোটা খরচ দিয়েও অনেক স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারত। এত ঝঞ্ঝাট পোহাতে হত না।

ভালবেসে বিয়ে করার চার-পাঁচ মাস পর থেকেই খিটিমিটি লাগিয়েছে সুবোধ টাকার প্রসঙ্গ তুলে। সোজাসুজি কিছু বলে নি, তবে সত্যগোপাল যে বেশ অল্পের ওপর দিয়েই সেরেছেন, এটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানাতে ছাড়ে নি। বলেছে, এ সব ব্যাপারে সে অনেক লিবার‍্যাল, কিন্তু আজকালকার দিনে তার দাম কী! তার কোনও বন্ধু যে বিয়ের টাকাতে কলকাতায় জমি কিনেছে, আর বিয়ের পণ যে স্বামী স্ত্রী দুজনেরই মঙ্গলের জন্যে, সিকিউরিটির পক্ষে দরকারী, তা বেশ খোলাখুলিই জানিয়েছে সে। হাসি কান দেয় নি। সুবোধের বাড়িটা মানিকতলায়। অনেক দিনের পুরনো আমলের বনেদী ভারী ভারী রঙ-ওঠা আলমারি, বাজুর ওপর চিত্র বিচিত্র করা পায়া উঁচু মেহগনির খাট আর তার দুই জায়ের বিপুল আয়তন দেখে হাঁপ ধরে গিয়েছিল হাসির।

সুবোধের বড ভাই-এর বৌ কনকদির বয়স চৌত্রিশের ওপর নয়। মেজ অমিয়াদি তিরিশের নীচে তো বটেই কিন্তু দুজনেই এ বয়সে প্রায় কুমড়ো। বিয়ের দু-দিন পর সুবোধ একটু কিন্তু কিন্তু করে সলজ্জভাবে হেসে বলেছিল, "বৌদিরা সেকেলে, কিন্তু খুব ভালো লোক। ওদের সঙ্গে একটু মিশো টিশো।"

হাসি তারপর থেকে অমিয়াদির যে ছেলেটা চার বছর বয়সেও হাঁটতে শেখে নি তাকে রোদে বসিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে অলিভ অয়েল মাখিয়েছে। জায়েদের দিন দুই পর থেকেই আপন দিদির মত তুমি সম্বোধন করেছে। কনকদি যখন তাঁর মনের সন্দেহ প্রকাশ্যেই বলে ফেলেছেন, "তুমি মেয়ে আবার বিদুষী, তোমার সাথে আমাদের সাথ!" তখন কনকদির প্রায় গলা জড়িয়ে হেসে গড়িয়েছে। তাস খেলার অভ্যাস দেখতে না পারলেও দুপুর আড়াইটের সময় ভাত খেয়ে উঠে যখন পাড়ার অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে তার জায়েরা তাসে বসেছে, তখন সেও মনপ্রাণ এক করেও খেলবার চেষ্টা করেছে। হেরে গিয়ে ধিক্কার দিয়েছে নিজের অযোগ্যতাকে।

মাস তিন-চার মন্দ লাগে নি। অন্তত খারাপ ব্যবহার পায় নি সে কারো কাছ থেকে। তাই ভালো লেগেছিল বোধ হয় একথাটাও বলা একেবারে ভুল হবে না। হাসি নিজেই প্রায় ভুলে গিয়েছিল, সে কখনও বাড়িতে মাস্টার রেখে গান শিখেছে; ফরাসী বিপ্লবের তাৎপর্য কি তা কখনও পড়েছে ইতিহাসের অনার্স ক্লাসে। তারপর হঠাৎ সুবোধ রাঁচীতে বদলি হবে হবে শোনার পর থেকেই তার সমস্ত মানিকতলার

বাড়িখানা ফাঁকা ঠেকেছে। মনে হয়েছে কতদিন গান করে নি। নিজের মনে চুপচাপ থাকতে পারে নি। হাসির এত উৎসাহ দেখে সুবোধও শেষ পর্যন্ত রাঁচীতে ঘরভাড়া নেবে ঠিক করেছিল।

এক সন্ধ্যাবেলা হাসি সুবোধ এল মাঠের উল্টো দিকে ডা. দত্তর বাড়ি বেড়াতে। বারান্দায় বাঁধা অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা আগন্তুক দেখেই চেঁচাতে শুরু করায় একজন ফর্সাপানা টাকওয়ালা ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। হাসি সুবোধকে দেখে এগিয়ে অভ্যর্থনা করেন, "আসুন আসুন।"

সাধারণত উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে ড্রয়িংরুম সাজাবার যা প্রথা তার এখানেও ব্যতিক্রম হয় নি। দুটো বড় বড় কৌচ, তার একটাতে বসেই সুবোধ বুঝলে, স্প্রিং-এর বারোটা বেজে গিয়েছে। দুটো পিতলের টবে পাম গাছ, কিন্তু বেশীর ভাগ পাতা এত হলদে ও ধুলো ভরা যে, তা দিয়ে ঘর সাজাবার চেষ্টা বৃথা। একটা কাঁচের আলমারির ভেতর থাকে থাকে কৃষ্ণনগরের পুতুলের অনুকরণে কিছু পুতুল, লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, বেশীর ভাগেরই কারো হাত ভাঙা, কারো পা ভাঙা। আর কয়েকটা স্প্রিং-কাটা জাপানী মোটর গাড়ি।

ডা. দত্ত ঘরের এককোণে তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই যে, এঁরাই উঠেছেন মাঠের ওপাশের বাড়িটায়।" সুবোধের দিকে তাকিয়ে একবার হেসে বললেন, "নতুন বিয়ে করে এসেছেন বোধ হয়।"

মিসেস দত্তকে দেখায় তাঁর স্বামীর দিদির মত। পাতলা একহারা চেহারা, ছুঁচোলো মুখ, চোখে চশমা। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে এলোমেলো সাদা চুলের গুচ্ছি চশমার ওপর নেমে এসেছে। চোখ দুটি বেশ তীক্ষ্ণ।

সুবোধ হেসে বসলে, "আপনি তো অনেক খবরই রাখেন দেখছি। নতুন বিয়ে করেছি, এটাও জেনে ফেলেছেন। অবশ্য ঠিক নতুন না, প্রায় বছরখানেক হয়ে গেল।"

ডা. দত্ত একবার হাসির দিকে আর একবার সুবোধের দিকে তাকিয়ে বললেন, "জানব না? আপনারা সকালে যে ডিমের ডালনা আর ফুলকপির তরকারি রেঁধেছেন, তাও বলতে পারি হলফ করে। আমাদের মেডসার্ভেণ্টের সঙ্গে আপনাদের বাড়ির ছোঁড়াটার খুব ভাব কিনা।"

"রাঁচীতে যে রকম ঠাণ্ডা ভেবেছিলাম, সেরকম কিছু নয়," আবহাওয়ার কথা উঠতেই সুবোধ বললে।

"ঠাণ্ডা না কী বলছেন? রাঁচী তো আর দার্জিলিং না!" ক্ষুব্ধ মনে হল ডা. দত্তকে। বললেন, "রাঁচী? রাঁচীর মত আইডিয়্যাল ক্লাইমেট হোল ইণ্ডিয়ায় কোথাও

পাবেন না। ক-দিন থাকুন, তা হলেই বুঝবেন। একদিন বিষ্টি পড়ে নি, তাই একটু গরম। একবার বিষ্টি পড়লে হু-হু করে ঠাণ্ডা পড়বে।”

ডা. দত্ত পাইপ ধরালেন। হাসির সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল বড়দার কথা। তার বিয়ের পর চৌধুরীর ঘন ঘন চিঠি পেয়েছে। কিন্তু মাস দুই তিন হল, নেহাত ভালো আছি, এথানে খুব গরম পড়েছে—এ ধরনের দায়সারা গোছের চিঠি দু-একটা করে পাওয়া ছাড়া আর কোনও খবর পায় নি।

ঘরের ভেতর কড়া তামাকের গন্ধ ভুরভুর করছিল, চাঁদ উঠেছে বাইরে। কুকুরটা হঠাৎ চেঁচাতে শুরু করল। ডাক্তার সাহেব শরীরটা চেয়ার থেকে অর্ধেক উঠিয়ে চিৎকার করে বললেন, “জ্যাক জ্যাক স্টপ দ্যাট।”

হাসির সামনে ফটোফ্রেমে বাঁধা ছবিখানির দিকে ঝুঁকে পড়ে মিসেস দত্তকে বললেন, “এটা বুঝি আপনার মেয়ের ছবি ?”

মিসেস দত্ত হাসলেন। হাসির সাথে সাথে তাঁর কঠিন মুখে হঠাৎ একটা কোমলতার ঢেউ খেলে গেল। অনেক আলাপী আর আপনার মনে হল তাঁকে। বললেন, “হাঁ, লক্ষ্ণৌ-এ থাকে। আমার জামাই ওখানকার ইঞ্জিনিয়ার। একেবারে পশ্চিমের লোক। একবার খালি বিয়ের সময় কলকাতায় এসেছিল। আগাগোড়াই পশ্চিমে মানুষ ওরা।”

হাসি অবাক হল এমন মিষ্টি গলার আওয়াজে। বেসুরো শরীর আর সুরেলা গলা নতুন লাগল তার কাছে। তা ছাড়া ডাক্তার সাহেবের স্ত্রীর বলার ভঙ্গিও ভালো। হাসি ভাবছিল, হয়তো ভবি-দির মত তিনিও বলবেন, ইউ-পির লাটসাহেব কবে তাঁর জামাই-এর বাড়ি এসেছিল, কিংবা লক্ষ্ণৌ-এ তাঁর মেয়ে শাওয়ার বাথ-এ চান করে কিনা।

সুবোধ হঠাৎ আফসোসের সুরে বললে, “পশ্চিমের লোকেরা কি আর এখন বাঙালী-দের তেমন খাতির করে ?”

মিসেস দত্ত ভুরু তুলে সুবোধের দিকে তাকালেন, তারপর তীক্ষ্ণ গলায় বলেন, “খাতির করে মানে ?”

সুবোধ কথাটা ঘুরিয়ে নিলে, “না মানে, আগে যে রকম ভাবসাব ছিল, সে রকম তো আর……”

“সে রকম তো আর চিরকাল থাকতে পারে না !” সুবোধের কথা শেষ না হতেই জোরাল কঠিন গলায় মিসেস দত্ত বলে উঠলেন। বিদ্রূপ করে বললেন, “ভাব-সাব মানেই তো খাতির করা ? না ? তা খাতির করবে কেন ? ইংরেজ এসেছিল

আপনাদের জায়গায় আগে। তাই ইংরেজিটা একটু তাড়াতাড়ি শিখেছেন, এই তো? তা ছাড়া কী করেছেন গুমোর করার মত? বাইরে গিয়ে তো একটা কালী-বাড়ি তৈরি করেন, নইলে বৎসরান্তে যে সব লোকেরা সাহিত্য বোঝে না, তাদের দিয়ে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন করান। এ ছাড়া কী করেছেন বলুন তো?"

মিসেস দত্তের এরকম অবাঙালী উষ্মায় সুবোধ প্রকাশ্যেই আহত হল। রাগ চাপবার জন্যে অকারণে সে বেশী হাসতে আরম্ভ করেছে। হাসির কিন্তু আনন্দ হল অন্য কারণে। চেহারা দেখে ডাক্তার সাহেবের বৌকে মনে হয়, তিনি যেন কথাতে ঘাড় নেড়েই যাবেন। এমন ভাবে এর ব্যতিক্রম হবে আর এত স্পষ্ট করে তিনি তাঁর কথা বলতে পারেন ভেবে হাসি আকৃষ্ট হল তাঁর প্রতি।

পাইপটা টেবিলে রেখে দিয়ে ডা. দত্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "আমার স্ত্রী ভয়ানক বাঙালী বিরোধী। আর ভীষণ তর্ক করেন। আপনি যদি বাঁ দিকে যেতে চান, তবে উনি ঠিক ডান দিকে যাবেন।"

মিসেস দত্ত হেসে ফেলেন। একটা দাঁত পড়ে যাওয়ায় তাঁর হাসি আরও সহজ ও ছেলেমানুষি দেখায়। চশমাটা কানের পাশে ভালো করে আঁটতে আঁটতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে সহজ গলায় বলেন, "আচ্ছা তুমিই বল তো আমি চটে গিয়েছিলাম না কি?"

ডাক্তার সাহেব পাইপ মুখে দিয়ে গম্ভীর গলায় বলেন, "তোমার নিশ্চয় মাথা ধরেছে। দেখ গিয়ে সারিডনের শিশিটা আলমারির মাথায় তুলে রেখেছি। প্রথম দিনই অতিথিদের সঙ্গে এরকম তর্ক—উঃ, ভারী অন্যায়!" ডাক্তার সাহেব ঘাড় নাড়াতে থাকেন।

সুবোধ ও হাসি এবার দুজনেই হেসে ফেলল। চা খাওয়ার পর বেশ জমে ওঠে সবাই। সুবোধ চটেছে লক্ষ্য করে ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী সর্বক্ষণ তার সঙ্গে ঠাট্টা জুড়ে দেন। বেরিয়ে আসবার মুখে দেওয়ালের দিকে তাকিয়েই থমকে দাঁড়ায় সুবোধ। হাসিও থেমে যায়।

লম্বা লম্বা চুল, এক জোড়া স্বপ্নময় চোখ। একটি কমবয়সী ছেলের ছবি।

ডাক্তার দত্ত বলে ওঠেন, "চেনেন না কি আমার ছেলেকে? অমিয়। এবার এম. এ. দিয়েছে।"

"চিনব না, কতদিন একসাথে আড্ডা দিয়েছি"—সুবোধ জবাব দেয়। "কলেজে?"

"না আমি কলেজে সিনিয়র ছিলাম। আলাপ হয়েছে কলেজের বাইরে। এই

খেলার মাঠে, এখানে সেখানে। অমিয় কি এখানে আসছে ?"
ডাক্তার দত্ত জবাব দেন, "না বোধ হয়। ওর এখানে এসে মন টেঁকে না। তিন-চার বছর আগে এখানে এসেছিল একবার। চারদিন থেকেই পালিয়ে গিয়েছিল। শেষ চিঠিতে লিখেছে, আসবে কি না ঠিক বুঝতে পারছে না।"
মাঠের পাশ দিয়ে রাস্তা। হাসি যে কথাটা বলবে না ভাবছিল, রাস্তায় পা দিয়েই তা বলে ফেলে, "বেশ সুন্দর লোক ওঁরা না ?"
সুবোধ হাসল। হাসি নজর করে দেখছে, কয়েক মাস থেকেই সুবোধ কী রকম অন্যভাবে হাসে। হাসবার সময় ঠোঁটের রেখা নাকের কাছে এসে কুঁচকে যায়। সুবোধ হেসে বললে,—"তোমার তো সব তাতেই ভালো লাগে।" বিদ্রূপ করলে কিনা, বোঝা গেল না।
হাসি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, "অমিয়কে চিনতে নাকি সুবোধ ?"
"কেন ?"
"না, এমনি বলছিলাম।"
কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটে দুজনে। তারপর সুবোধ বলে, "অমিয়কে সবাই ভালো বলে খুব মিশুকে ছেলে। আর অনেক জিনিস বেশ জানে বোঝে, তবে……।"
"তবে কী ?"
সুবোধ জবাব দিল, "যা হয়ে থাকে এ বয়সে ! একটু বোহেমিয়ান টাইপ।"
ফুটফুটে চাঁদনী। বড় বড় ঝাউ গাছের তলা দিয়ে চওড়া পিচের রাস্তা। আকাশ ঢালা জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে। হাসির মনে হল পোকামাকড়ও দেখা যায় এ আলোয়।
কেন জানি ঘুরে ফিরে চৌধুরীর কথা বড্ড বেশী মনে পড়ছিল। অনেক দিন চিঠি পায় নি। গলার কাছটায় কী রকম করে উঠল। হাসি আস্তে আস্তে ডাক দেয় "সুবোধ।"
সুবোধ জানত মাঝে মাঝে হাসির এরকম হয়। তখন তাকে একটু ভালভাবে সামলানো দরকার। সে দাঁড়িয়ে পড়ে হাসির এক হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল।
জ্যোৎস্নায় সুবোধের মুখ স্পষ্টভাবে দেখা যায় না কিন্তু তার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসির মনে হল সে দেখছে তার আগেকার দিনগুলোকে। সেই গঙ্গার ঘাট থেকে সুবোধকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফেরা, ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে, আর সুবোধ অন্ধকারে নির্জন করিডোরে দাঁড়িয়ে হাসছে তার দিকে তাকিয়ে।

অনেক কাল আগের কথা সেই কালিদাসের কাল যেন হারিয়ে গেছে কোথায় !
সুবোধ চমকে ওঠে হাসির দীর্ঘনিশ্বাসে। সে আগেকার নাম ধরে ডাকে, "কী হয়েছে হাসু ?"
"নাঃ, কিচ্ছু না। তুলি কালকে আমার গান শুনবে সুবোধ ? কতদিন গান গাই না।"
"কাল আমি ঠিক সকাল সকাল ফিরব হাসু"—সুবোধ তাড়াতাড়ি বললে। তারপর যেমনভাবে মা তার অস্থির ছেলেকে সান্ত্বনা দেয়, তেমনি ভাবে হাসির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সুবোধ বলে, "মন খারাপ লাগছে, না ? চল একদিন আমরা জোনা ফল্‌স্-এ ঘুরে আসি।"
হাসি কিন্তু শান্ত হয়ে এসেছে। বোধ হয় কথা ঘোরাবার জন্যে বলে, "উঃ,কত রাত হয়ে যাচ্ছে ! ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, চল।"
যখন তারা রেল লাইন পার হয়ে মাঠে পড়ল, তখন বড্ড মিঠে হাওয়া দিচ্ছে। দূরে রাস্তার এককোণে বড় বড় গাছের ডালপালা দোল খাচ্ছে হাওয়ায়। আশেপাশের গ্রাম থেকে নাচের বাজনা ভেসে আসছে। ডাক্তার সাহেবের কুকুর ডাকছিল, অনেক দূর থেকে।

তেইশ

ক-দিন হল হাসির গানে পেয়েছে। দুপুর বেলা ছুটি ছিল, সুবোধ ঘুমিয়ে উঠে মুখচোখ ভারী করে গলা ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, "তোমার কী হয়েছে বল তো ?"
"কী আবার হবে ?" অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নাড়িয়ে বলে হাসি। তারপর জানালার ধারে গরাদে হাত দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা খোলা ট্রাকের ওপর একরাশ কুলি-কামিন হল্লা করতে করতে বেরিয়ে যায়। ধুলোর ঝড়ের ভেতর থেকেও একটা টকটকে লাল রঙের র‍্যাপার উড়তে থাকে অনেকক্ষণ।
কী হল কী !—সুবোধ হঠাৎ মাথা তুলে হাসির দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বলে। তারপর বালিশটা বগলের নীচে ফেলে উপুড় হয়ে শুয়ে ক্রশওয়ার্ড পাজ্‌ল করতে থাকে।
হাসি জবাব দেয় না। নিজের মনে গুনগুন করতে করতে বাইরে বেরিয়ে যায়।

বারান্দার পাশেই রাস্তার ওপরে ডাস্টবিন। তবে কলকাতার মত অপরিষ্কার নয়। কয়েকটা ছেলে মেয়ে ছাই ঝেড়ে ঝেড়ে কয়লা তুলছিল। হাসি কাছে গিয়ে আলাপ করতে বসে। জিজ্ঞেস করে, "কী করছিস রে তোরা ?"

বছর তেরোর একটি মেয়ে আর তার আট-ন বছরের ভাইটির কালো হাফপ্যাণ্টের ঠিক পাছার ওপরে মস্ত বড তালি, লালসুতো দিয়ে একবার সেলাই করার চেষ্টা হয়েছিল। এগিয়ে এসে সে-ই হাসিকে জবাব দেয় "কাম করতা হ্যায়।"

এরকম ভয়ানক ভাব দেখে হাসির মজা লাগে। ছেলেটি নির্বিবাদে এগিয়ে এসে বলে, "দো-আনা পয়সা হ্যায় ?" বড় মেয়েটা একমনে কয়লা বাছে। লম্বা লম্বা চুলের বিনুনী টিকটিক করছে মাথায়। যত্নে রাখা হলে রেশমের সঙ্গে উপমা দেওয়া যেত। এখন অবশ্য ধুলো আর ছাই লেগে চুল বলেই মনে হয় না, কালিমাখা কতকগুলো নারকোলের দড়ি যেন। হাসি একছুটে ঘরের ভেতর যায়। ক্রশওয়ার্ড করতে করতে সুবোধ আবার ঘুমিয়ে পড়েছে—বারান্দা থেকে রোদ পড়েছে গলায়। আস্তে আস্তে ড্রয়ার টেনে পয়সা বার করবার সময় সুবোধের দিকে তাকিয়েই হাসি আবার মিলিয়ে যায়।

সে ভেবেছিল দু-আনিটা দেওয়ার পর অন্তত ভাব জমাতে পারবে ছেলেটার সঙ্গে। কিন্তু হাসির দিকে একবারও না তাকিয়ে দু-হাতের দশটা আঙুলই ছাই-এর গাদার ভিতর ভরে দিয়ে পোড়া কয়লা টেনে বার করতে থাকে সে।

একদম ছোট ছেলেটার বয়স বছর তিনেক হবে। এতক্ষণ সে একটা খালি টুকরি নিয়ে খেলা করছিল। এবার ষাঁড় যেমন বালির গাদা গুঁতোয়, তেমনি মাথা দিয়ে হঠাৎ ছাই গুঁতোতে থাকে। হাসি উঠে গিয়ে ছেলেটা তুলে ধরে। পিঠে কয়েক ঘা চড় মেরে ছাই ঝাড়বার পরই ছেলেটা ঘুরে দাঁড়ায়। মাথার চুল কামানো, গাল ফেটে রক্ত বেরচ্ছে শীতে। আর স্বাস্থ্য ? গ্যাক্সো বেবিদেরও লজ্জা দেয়।

একটা বড় গোছের টুকরি পোড়া কয়লায় ভর্তি হলে মেয়েটা উঠে দাঁড়ায়। বয়সের তুলনায় আরও ঢেঙা দেখায়। গোল মুখ, তবে বেশ কঠিন মুখের আদল।

আশ্চর্য চোখ দুটি, উজ্জ্বল, সপ্রতিভ। যেন কোনও কথা জিজ্ঞেস করলে কিছুতেই ঘাবড়াবে না। মেয়েটা কাঁখে টুকরি নিয়ে ডান হাত দিয়ে বাচ্চা ছেলেটার হাত ধরে, তারপর তিনজনেই রেল-লাইনের দিকে চলে যায়।

আগের দিন ছিল পূর্ণিমা। সন্ধ্যে হতেই রেল-লাইনের ওপর চাঁদ ওঠে। আর সেদিকে মুখ করে জানলার ধারে বসে হাসি গান গায়—

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না,
ভালবাসায় ভোলাব ;
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলবো না গো,
গান দিয়ে দ্বার খোলাব ।......

অনেক কষ্ট করে সুবোধকে বসিয়েছে গান শোনাতে। তার আগে উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে যেতে একটা ছুঁচলো পাথরের কোনায় হোঁচট খেয়ে প্রায় কড়ে আঙুলের নখের চারা তুলে ফেলেছিল। তবু ছোঁড়া চাকর বৈজনাথকে শেষবারের মত তালিম দিয়ে এসেছে, "ডাক্তার সাহেব আর তাঁর বৌ আসবেন। কড়াইশুঁটি সেদ্ধ আছে ওপরের তাকে, চায়ের সাথে ঘুগ্‌নি করে দিবি, ভুলিস না।"

সুবোধের অবশ্য চিরকালই গান শোনাটা বোরিং লাগে। আজকেও হাসির যথেষ্ট উৎসাহ সত্বেও তার কোনও ব্যতিক্রম হয় নি। হাসি যাতে দেখতে না পায়, সেইভাবে মাথাটা আড়াল করে সেফ্‌টিপিনের আগা দিয়ে কান খুঁটছিল। বিয়ের আগে অবশ্য হাসির গান শুনেছে সে। তবে সে কথা আলাদা। বিয়ে করবার জন্যে কত রকম বোকামি না করেছে, ভাবতে এখন হাসি লাগে তার।

অন্যদিনের চেয়ে আজ অনেক ভালো গায় হাসি। ভেবেছিল এতদিন মানিকতলায় মেজগিন্নীর ছেলেটাকে অলিভ ওয়েল মাখিয়ে মাখিয়ে বুঝি গলা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ গাইবার পরই বেশ সহজ হয়ে আসে গলার কাজগুলো। প্রত্যেক-বারের মতই গানের শেষ দুটো লাইনে এসে হাসি নিজেকে একেবারে ভুলে যায়। একটা ছবি মনে পড়ে। প্রায় বছর চারেক আগে, একবার কলেজ থেকে শান্তি-নিকেতনে গিয়েছিল। চৈত্রের শেষ। কে একটা অচেনা মেয়ে একথোলো আমের মুকুল মাথায় দিয়ে গেয়েছিল গানটা।

সুবোধ কানের ময়লাগুলো ইলাসট্রেটেড উইকলির এক কোণে মুছে ফেলে 'বিজনেস করেসপণ্ডেন্স' পড়ছিল। বারো ভল্যুমে আমেরিকা থেকে প্রকাশিত বইগুলো এখন প্রায় প্রত্যেক ফার্মেই দেখতে পাওয়া যায়। পাওনা অনেক দিনের বাকি, অথচ পার্টি খুব রেসপেকটেবল, তখন তাকে না চটিয়ে কি ভাবে চিঠি দেবে টাকা আদায়ের জন্যে, যে পার্টি একেবারে উদাসীন, তাকে কি করে বিঁধতে হবে মোক্ষম উপায়ে, কখন খুব কড়া কথা মোলায়েম করে গুছিয়ে লিখতে হবে,—এগুলো পড়তে পড়তে সুবোধ ভাবছিল, কলেজের বছরগুলোয় যদি গ্ল্যাডস্টোনের ফরেন পলিসি কিংবা শেলির কবিতা—এই ধরনের বুজরুকি না পড়ে, ইংরেজি চিঠি লেখায় হাত পাকাত, তা হলে কি আর এমন জায়গায় তার পোস্টিং হত। হলই বা রাঁচী। কলকাতার তুলনায়

তো ধাপধাড়া গোবিন্দপুর। সুবোধ একটা চিঠি মন দিয়ে পড়ছিল। আমেরিকান এক মা তাঁর ছেলে বেবিশোতে ফার্স্ট হলে কি ভাবে এক মিল্ক-ফুড কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর ছেলের ফটো ছাপাবার দরদস্তুর করছেন, তাই নিয়ে লেখা।
বাইরে রেলের লাইন চকচক করছে চাঁদের আলোয়। হাওয়ায় দুলছে গাছ। হাসি সেইদিকে তাকিয়ে কী এক আবেগে গান গেয়ে চলে।

এমন সুন্দর আকাশ অনেক দিন হয় নি। দেখে দেখে কিছুতেই সাধ মেটে না হাসির। বৈজনাথের সঙ্গে আরও বেশী করে সেদিন গল্প করে। পাশে মাদ্রাজী এক পরিবারের সাথে আলাপ হয়েছে। সেখানে গিয়ে ক্যারম খেলে। খুব ভালো করে রান্না করবার ইচ্ছে হয়, ভালো না হলে মন খুঁত খুঁত করে।
সোমবার সুবোধকে আপিসে পাঠিয়ে দিয়ে হাসি দূরে মাউন্ট হোটেলের মাথার ওপর পেঁজা তুলোর মত মেঘের সারির দিকে তাকিয়ে ভাবছিল। এমন সময় একটা সাইকেল-রিক্সা দাঁড়ায় ডাক্তার সাহেবের বাড়ির সামনে। তাতে খালি স্যুটকেস আর বেডিং। সাইকেল থামার কিছুক্ষণ পরই সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী পরে একটি অল্প-বয়সী তরুণ বাড়িতে ঢুকল। অমিয় নাকি?
হাসি ঠিকই ভেবেছিল। সুবোধ ফিরতেই তাড়া লাগাল, অনেক দিন ডাক্তার দত্তর বাড়ি যাওয়া হয় নি। সুবোধের হজমের গণ্ডগোল হচ্ছিল। বললে, "তুমিই যাও না।" হাসি প্রত্যেক দিনের চেয়ে বেশী সাজল কিনা বলা মুশকিল, তবে অনেকক্ষণ ধরে আয়নায় মুখ দেখল যাবার আগে।
হাসি যখন এল, তখন ডাক্তার সাহেব বলছিলেন, "রাঁচীর মত ক্লাইমেট ইণ্ডিয়াতে আর আছে? আমার কথা না হয় নাই মানলে, কিন্তু এখানে ডাক্তার চ্যাটার্জি আছেন," তারপর হাসিকে আসতে দেখে বললেন, "এই যে এঁরা এসেছেন কিছু দিন হল, কই সামান্য পেটের একটু-আধটু ট্রাবল ছাড়া কিছু হয়েছে এঁদের বলুন দিখে?"
অমিয়র চোখ তার দিকে পড়াতে হাসি লজ্জা পেল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না, না, আমরা বেশ ভালোই আছি।"
ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বললেন, "সত্যর সঙ্গে দেখা করেছিলে অমিয়?"
"হ্যাঁ দেখা করেছিলাম, তবে কিছু হবে না।"—অমিয় একটা উদাসীন জবাব দেয়।
ডাক্তার দত্ত বলেন, "কেন সত্যর সঙ্গে তো সাহেবী ফার্ম-টার্মের অনেক জানাশোনা আছে। তুই ভালো করে বলেছিলি তো অমিয়?"

অমিয় জবাব দেয়, "ভালো করে? হ্যাঁ, ভালো করেই বলেছি। তবে অনেক ধরাধরির ব্যাপার। অতখানি বোধ হয় আমার জন্যে করা ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়।"

হাসি লক্ষ্য করলে, অমিয়র শান্ত নিস্পৃহভাবে কথা বলার ধরন। কেমন একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ তার কথা বলার ভঙ্গির ভেতর লুকিয়ে আছে। ডাক্তার দত্ত তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "ওসব কথা পরে হবে, ট্রেনে তো ঘুম হয় নি। এখন ভালো করে গরম জলে চান করে খেয়ে-দেয়ে একটা ঘুম দিয়ে নাও।"

অমিয়র মাও বললেন, "তুই বাবা মুখ-হাত-পা ধুয়ে নে।" হঠাৎ হাসির দিকে চোখ পড়ায় বলে উঠলেন, "ও, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই নি। এ হল সুবোধের বৌ। সুবোধ হচ্ছে······।"

অমিয় ধীরে ধীরে মাথা তোলে। সে যেন এতক্ষণে হাসিকে দেখল। বেশ একটা বিস্ময় ফুটে ওঠে মুখে চোখে। একটা ছোট নমস্কার করে অমিয় বলে, "সুবোধ? কোন সুবোধ?"

হাসি হঠাৎ একটুখানি উৎসাহের মুখে বলে ওঠে, "সুবোধ আপনার কথা আমায় অনেক বলেছে।"

অমিয় যেন এইবার আপাদমস্তক হাসিকে ভালো করে দেখে। হাসি কেমন অপ্রস্তুতে পড়ে যায়। উৎসাহ বেশী দেখিয়ে ফেলেছে বলে একটু জড়সড় হয়ে পড়ে। মিসেস দত্ত সুবোধের পরিচয় দেন অমিয়কে।

হাসি বলে, "চললাম মাসীমা। আপনি এখন আপনার ছেলের সেবা করুন।" যাবার আগে অমিয়র দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে বললে, "চললাম আজ। বিকেলে আসবেন আমাদের বাড়ি বেড়াতে।"

অমিয় আগেকার মত নিস্পৃহ গলায় জবাব দেয়, "আচ্ছা।"

ডাক্তার দত্ত বলেন, "খুব গুণী মেয়ে আমাদের হাসি। এমন সুন্দর গান আমি আর আগে শুনি নি! এখন যে সব কলকাতায় মাইকের সামনে চেপে চেপে গান গায়! আমাদের সময় সেই বুড়ো দত্ত বর্ধমান স্কুলের মাস্টার, ওঃ কী গাইত—'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর', বলে ভাঙা গলায় গেয়ে ওঠেন। হাসি দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ এমন বেসুরো গলার আওয়াজে খিলখিল করে হেসে ওঠে। সেদিকে তাকিয়ে অমিয় বললে, "আজ সন্ধ্যেবেলা যাব আপনাদের বাড়ি।"

আলাপ হল নেহাত মামুলীভাবে, যেমন হয়। কয়েক দিন পর আসা যাওয়া। এখানে অবশ্য সুবোধের সঙ্গে আগে থেকেই আলাপ থাকায় প্রথম আলাপের আড়ষ্টতা একটু তাড়াতাড়িই কেটে গেল, হাসি আর অমিয়র ভেতর। সাত দিন যাবার

পরও অমিয় কলকাতা ফেরার গা করল না। হাসির জোনা ফলস্ আগেই দেখা। তবু হঠাৎ সুবোধকে একদিন চেপে ধরল, জোনা ফলস্-এ যাবার জন্যে। সুবোধ ভুরু কুঁচকে বললে, "আমার ছুটি নেই।"

"বাঃ সেবার যে আমরা গেলাম,"—হাসি যেন আহত হয়।

সুবোধ বিরক্তির সঙ্গে বলে, "কতবার একটা জিনিষ দেখবে? ফলস না ঘোড়ার ডিম! একটা কল থেকে জল পড়ছে, আর চারপাশে জঙ্গল। আর একবার দেখার কি আছে? বুঝতাম, নতুন জায়গা!" হাসি বলে, "কিন্তু এত ভালো সিনারি আমি আর কোথাও দেখিনি সুবোধ।" সুবোধ অসহিষ্ণু গলায় বলে, "আসল কথা বল না, অমিয় যাচ্ছে—"হাসি তার কথা শেষ করতে দেয় না। ব্যঙ্গ করে বলে, "হিংসে হচ্ছে না কি?"

সুবোধ হাসে, বিদ্রূপে ঠোঁট কুঁচকোয়, বলে, "হিংসে? ও বয়সে দুটো-চারটে কথা আমরাও বলতাম। আর্ট, ইমোশনাল ইনটিগ্রিটি, এসথেটিক্স। ওগুলো আর পঁচিশ পার হয় না।"

হাসি কি বলবে ভেবে পেল না। হয়তো সত্যি সুবোধের কথা। চুপ করে যাচ্ছিল, হঠাৎ কি মনে করে বললে, "তাই বলে তোমার কাছে গান গাইতে গেলে তুমি বসে বসে পাজল করবে? আর অমিয়বাবু সেদিন নাম করে করে জিজ্ঞেস করলেন, —এ গানটা জানেন কি না, ও গানটা জানেন কি না।"

"এত কথা শোনাচ্ছ কেন? যেতে হয়, যাও।" সুবোধ চটে গিয়ে কড়া কড়া কথা বললে।

যাবার দিন বিকেল বেলায় কিন্তু সকাল সকাল ফেরে সুবোধ। হাসি চুলের ফিতে দাঁতে চেপে চুল বাঁধতে বাঁধতে আয়নার দিকে তাকিয়ে বললে, "গাড়ি এসেছে কি? সুবোধ প্রথমে গাঁইগুঁই করেছিল, শেষ পর্যন্ত নিজে রাজী হয়ে গাড়ির ব্যবস্থা করলে।

জোনা ফলস্। পড়ন্ত বিকেল। গাড়িতে ধুলো খেয়ে খেয়ে সকলেই আচ্ছন্ন, চুল বেসামাল। শীত শীত করছে সবার। অমিয় সামনের সীটে বসেছিল, হাসির দিকে তাকাবার সুযোগ হয় নি। কেমন একটা আলস্য লাগছিল সারাক্ষণ।

দীর্ঘ সিঁড়ি দিয়ে নীচে জলের ধারে নামতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে যায়। চারদিক ঘন সবুজ। খালি জলের শব্দ আসে কানে। নীচে বড় বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে জলের কোল ঘেঁষে একটা জায়গায় তারা বসে থাকে অনেকক্ষণ। অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। চিৎকার করতে করতে পাখীর ঝাঁক উড়ে যায়। খালি একটা পাথরের কোনায় মস্ত

বড় পাতাশূন্য এক পলাশ গাছের মাথা লাল হয়ে থাকে সূর্যের আলোয়।
সুবোধ বলে উঠে, "রাত হয়ে যাচ্ছে।"
হাসি সেদিকে কান দেয়। অমিয় জলে নুড়ি ফেলতে থাকে। সুবোধ উশখুশ করে। সামনে পিছনে গাঢ় অন্ধকার আর মাঝে মাঝে শুকনো পাতার ওপর পাতা ঘষার শব্দ।
সুবোধ হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠে। অমিয় হাসি কেউই সেই দিকে তাকায় না। অমিয় ঢিল ফেলে, আর হাসি তাকিয়ে থাকে সূর্যের আলোয় রাঙা গাছের মাথার দিকে।
সুবোধ বলে, "এখানে যা ব্যাপার! বাঘ ভাল্লুকও শুনি আসে মাঝে মাঝে।"
হাসি হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, "তবে নিয়ে এলে কেন? এত সকাল সকালই যদি ফিরে যেতে চাও, তবে আগে বললেই পারতে আসতুম না।"
সুবোধ বলে, "রাত বারটা পর্যন্ত থাকব বলে তো আসিনি!"
হাসির গলা আবার চড়ে যায়। অমিয় যে আছে খেয়ালই থাকে না। বলে, "তুমি সবটাতেই এমনি করবে সুবোধ। উঠতে বসতে সব সময়েই তোমার হিসেব। তবে না এলেই পারতে।"
অমিয় শেষ নুড়িটা জলের দিকে ছুঁড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলে, "কী যে বলেন আপনি! আসলে সুবোধের বোধ হয় ঠাণ্ডা লাগছে। ওপরে চলুন, বিড়লাজীর ধর্মশালা আছে।"
বিড়লাজীর ধর্মশালায় বড় বড় লোহার দরজা। বাঘ আসে বলে এই ব্যবস্থা। একেবারে লোহার গারদ। দুটো বড় তক্তপোষের ওপর কম্বল বিছিয়ে বসে সবাই। অমিয়ই বাইরে গিয়ে মালীকে ডাক দেয়। পাশে মালীর ঘর। একটা ছোট হাঁড়ি ভর্তি ভাতের নীচে গনগনে কাঠের আগুনের সামনে ওঁরাও মালীটা উবু হয়ে বসেছিল। হাসি বললে, "আমরা খেয়ে নেব। কখন ওবেলা খেয়েছি।"
"কোথায় রাঁধবে?" সুবোধ বললে।
"কেন ঐ মালীর হাঁড়িতে খানিকটা চাল ডাল চাপিয়ে দি না।"
সুবোধ আকাশ থেকে পড়ে—"পাগল না কি!" তখনকার মত সকলেই ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে চা খায়। কিন্তু পাহাড়ী হাওয়ায় আর এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে ওঠানামা করার দরুন বোধ হয় খিদের জ্বালা আধ ঘণ্টা না যেতেই বেশ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত হাসির কথাতেই সায় দিতে হল। হাওয়ায় স্টোভ ঠিক মত ধরল না। অমিয়র দিকে তাকিয়ে একটু ঠোঁট টিপে হেসে হাসি বললে, "ব্যাগে কয়েকটা আলু আছে, ফেলে দিন তো।" মালী তার ঝকঝকে দু-পাটি সাদা দাঁত মেলে জানায়

চাল ডালের ব্যাপারটা সে নিজেই সামলে দিতে পারবে। বাবুরা তার ওপর খবরদারি না করে যদি পাশের ঘরে গিয়ে বসেন তো ভালো হয়।

একটা আলোয়ানে কান পর্যন্ত ঢেকে বেশ আরাম করে বসে অমিয় হাসিকে বলে, "ইবসেন পড়েছেন ?"

"কতবার বলেছি সুবোধকে, নিজে না পড়, আমায় কয়েকখানা আনিয়ে দাও বই। ইবসেন, হ্যাঁ পড়েছি মনে হচ্ছে।"

জানালার ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা আসছিল। কাঠের জানালা বন্ধ করে দিতে ঘরটায় শীতের হাড়-কাঁপানো ভাবটা একেবারেই কেটে যায়। বেশ ঘন অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে ঘরের ভেতরকার বাতাস।

অমিয় বলে, "জানি না, আপনার ঐ নাটকটা কেমন লাগে। কিন্তু আমাকে থেকে থেকে এমন ভাবিয়ে তোলে! কোন্‌টা বলছি বলুন তো ?" অমিয় এমন ভাবে জিজ্ঞেস করে কথাটা যেন সে একান্তভাবে হাসির সঙ্গেই আলাপ করছে।

"ঠিক মনে নেই," অস্পষ্ট উত্তর দেয় হাসি।

অমিয় আলোয়ানটা ঘাড় থেকে নামিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বলে, "ঐ সেই 'ডলস হাউস'। আমার এক বন্ধু গল্পটা নিয়ে বাংলায় নাটক করেছিল এমন বিশ্রী লাগল। বাংলায় যেন স্বামী-স্ত্রী খালি ভালবাসবে, বড়জোর স্বামী স্ত্রীকে ধরে লাথি মারবে, কিংবা মাতলামি করবে। কিন্তু তার চেয়ে আর কিছু ..."

সুবোধ ফস করে বললে, "আর কিছুটা কী ?"

"এই যেমন, সংসার করেও তো বেশী লোক সংসারী না। বিয়ে করার পর স্বামী-স্ত্রীতে যে বেশীর ভাগ সময়ই অভিনয় করতে হয়, তা নিয়ে বাংলায় কেন যে লেখা হয় না!"

সুবোধ অসহিষ্ণুভাবে বলে, "তার মানেই হল বিলেতে যেটা বাস্তব, বাংলাদেশে কিংবা ভারতবর্ষে সেটা বাস্তব নয়।"

অমিয় তাকায় সুবোধের দিকে, তারপর দৃষ্টিটা হাসির চোখের ওপর এক নজর স্থির রেখে ঘাড় নীচু করে ধীরে ধীরে বলে, "তুমি কি মনে কর না সুবোধ, আমাদের দেশে ঘরে ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল নেই।"

সুবোধ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, "নাই বা থাকলো! সে তো আগেও ছিল না। এখনও নেই। তাই বলে 'নোরা' হতে যাবে কেন আমাদের দেশের মেয়েরা। ধর, এই প্রেম করে বিয়ে করার ব্যাপারটা। এটাই তো আমাদের দেশে অবাস্তব। প্রেম করা আমাদের এক কুলি-মজুরদের ঘরে আছে, আর আছে নাটক-নভেলে। আমাদের

দেশের ছেলেমেয়েরা প্রেম করার স্বপ্ন দেখে কলেজ-লাইফে। তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওসব কেটে যায়। এই যে তোমার বাবা মা অমিয়। এঁরা তো প্রেম করে বিয়ে করেন নি, কিন্তু কোন্ অসুখটা তাঁদের ?"

সুবোধের বলার ঢঙে এমন একটা চাপা ঝাঁজ ছিল যে অমিয়ও অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। বলে, "বাবা মা প্রেম করেননি, কিন্তু তাই বলে—" সুবোধ হাসে অমিয়র অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ্য করে। অমিয়র বাকি কথাটা সেই জুড়ে দেয়, "তাই বলে, আমি করব না তার কোনও মানে নেই, এই তো ? তার মানেই তোমার, অনেক ক্ষেত্রে বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি, আলাদা বাড়ি করার খরচ ! বেশীর ভাগ বুদ্ধিমান ছেলেই জানো কেন প্রেম নিয়ে মাথা ঘামায় না ? তার কারণ এত ঝামেলা পোয়াতে হয় !"

হাসির মুখ কালো দেখায়। অনেকক্ষণ থেকেই সুবোধের কথাকে খণ্ডন করার জন্যে যুক্তি খুঁজছিল সে। এখন বলে ওঠে "সাহেবরা তাহলে তোমার মতে বড় বোকা না ?"

সুবোধ জবাব দেয়, "সাহেবদের ঝামেলা পোয়ানোর কথাই ওঠে না। তাদের ছেলেমেয়ে বড় হলে, প্রেমের জন্যে তারা যদি ছোটাছুটি না করে, তবে লোকে বলবে পাগল, কিংবা অসুখ আছে। ওদের দেশের কথা আলাদা।"

হাসি তর্ক করে, "আমাদের দেশে প্রেমে-পড়ার গল্পও তো নেহাত কম নয় সুবোধ !"

সুবোধ হাসে। বিদ্রূপে কুঁচকিয়ে যায় ঠোঁট। হাসিকে লক্ষ্য করে বলে, "তা নেই, তবে কি জানো হাসি, শকুন্তলা হতে গেলে তপোবন চাই। দুখানা ঘরের মধ্যে ছোট ভাই আর বুড়ো বাবা নিয়ে তো বেশীর ভাগ মেয়ের বাস। সেখানে প্রথমত বিয়েই হয় না, খালি বয়সই বাড়তে থাকে তারপর তা-না-না করে যদি বা বিয়ে হয়, তখন নোরা হতে গেলে যে গলায় দড়ি দিতে হবে।"

হাসি কী বলবে বুঝে উঠতে পারে না। ব্যথায় ম্লান হয়ে ওঠে মুখ। আঁচলটা হাতের মুঠোয় পাকাতে পাকাতে বলে, "তুমি কী বলছ সুবোধ ? শরৎবাবুর বেশীর ভাগ বই-ই তো প্রেমের ব্যাপার। সেগুলি সব মিথ্যে না কি ?" একটা দীর্ঘ-নিশ্বাসের মত হাসির কথা শোনায়। বেশ একটা কঠিন সত্য সে যেন নিশ্চিতভাবে আয়ত্ত করেছে, এমনি ভাবে ঠাণ্ডা শান্ত গলায় সুবোধ বলে, "প্রায়ই মিথ্যে। শুধু খুব সুন্দর, সুন্দর কথা খুব গুছিয়ে সাজিয়ে বলা। বেশীর ভাগ লোকের জীবন থেকেই যা অনেক দূরে।"

"তুমি তো বড্ড সিনিক হয়ে পড়েছ বিয়ে করে," অমিয় খোঁচা দিয়ে বলে সুবোধকে। সুবোধ জবাব দেয়, "ও সব সিনিক ফিনিক বলে কী লাভ বল ? যা সত্যি তা বলছি।"

তারা যখন গাড়িতে উঠল তখন রাত প্রায় নটা। শাল গাছের ওপরে নিস্তব্ধ চাঁদ একমাত্র সাক্ষী। মাঝে মাঝে শীতের দমকা ঝড়ো হাওয়ায় গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। চায়ের সাজ সরঞ্জামের টুকরিটা ড্রাইভারের পাশে দেওয়ায় অমিয়কে বসতে হয় পেছনে। হাসি পাদানিতে এক পা বাড়িয়ে অমিয়র হাতে একটু চাপ দিয়ে বললে, "আমি কিন্তু আপনার দলে।" ইঞ্জিনের স্টার্ট নেওয়ার শব্দে হাসির গলা শোনা যায় না।

চব্বিশ

বিষ্টি, বিষ্টি, বিষ্টি। বিষ্টির কি কোনও শেষ হবে না? সব জায়গা স্যাঁতসেঁতে, ভিজে, বেমানান দেখাচ্ছে। আর বাইরে প্রায় তিন দিন ধরে আকাশ এমন মেঘলা যে, জানালায় মুখ বাড়িয়েও দম বন্ধ হয়ে যায়।

আর এই দমবন্ধ ভাবটা চেপে ধরল অমিয়কে। কলকাতাতেও এমনি হয়। সেই থার্ড ইয়ার পার হবার পর থেকেই কলেজ ছাড়া পর্যন্ত মাঝে মাঝে তার আকস্মিক-ভাবে মন খারাপ হয়। আর তখন পৃথিবীটাকে খালি রূপক দিয়ে ভাবতে ভালো লাগে,—যেমন অন্ধকার সমুদ্র কিংবা ধু ধু মরুভূমি কিংবা ঠাণ্ডা শবঢাকা এক পাহাড়ের ভেতর দিয়ে সে পথ করে নিচ্ছে একা একা মাইলের পর মাইল। আর তখন জীবনের সান্ত্বনা হিসাবে মনে হয়েছিল, একটি মাত্র বস্তুই অবশিষ্ট আছে—প্রেমে পড়া। যেন একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির কোনায়, আর সে ডাকছে, এস আমার জীবনে। সঙ্গে সঙ্গে—কী হবে তা ঠিক বলতে পারে না। কিন্তু কিছু একটা যেন ঘটবে। অমিয়কে যদি কেউ জিজ্ঞেস করত, সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন গানের মত হয়ে উঠবে কি না, তবে অমিয় কি জবাব দিত, বলা মুশকিল।

দুপুর তিনটে নাগাদ বিষ্টি থেমে গেল। মাউণ্ট হোটেলের মাথাটা রৌদ্র-ধৌত এক স্নিগ্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। লোহারডাগা থেকে মালগাড়ি হেলতে দুলতে চলে গেল। রাস্তায় এসে দাঁড়ায় অমিয়। একটা চায়ের দোকানে চা খেয়ে আবার হাঁটতে শুরু করে। প্রথমে ভাবল, রাঁচী পাহাড়ের দিকটায় যাবে, তারপর কি মনে করে হাঁটতে শুরু করল উল্টো রাস্তা ধরে।

হাসি ঘুমোচ্ছিল। কড়ার আওয়াজে বিকেলের ঝি এসেছে বলে দরজা খুলে দিয়ে

ভীষণ অবাক হয়ে যায়। খানিকক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখছিল অমিয়কে। হেসে অমিয় বললে, "বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখবেন?"

হাসি অপ্রস্তুতে পড়ে, "বাঃ তাই বলছি না কি? আসুন।"

ঘরখানায় হাসির সাজানো-গোছানো ছাপ একটু বেশীরকম প্রকট। বিয়েতে পাওয়া ভারী কার্পেটটা ঘরের তুলনায় অনেকটা জমকালো। রবীন্দ্রনাথের ফটো প্রায় তিন-চারখানা। টেনিস র‍্যাকেট নিয়ে সুবোধ ফটো ফ্রেমের ভেতর থেকে হাসছে।

"সেদিন যে বললেন, আপনি আমার দলে, তার মানেটা শুনতে এলাম, আপনার কাছ থেকে।" কথাটা বলেই অমিয় তার একাগ্র-বিষাদ চাউনি হাসির সমস্ত মুখের দিকে মেলে দিয়ে তাকিয়ে থাকল। হাসির একবার মনে হল, পাশের ঘরে ঝিটা থাকলে ভালো হত। তারপর নিজের দুর্বলতায় নিজেই হেসে উঠে বললে, "অত তাড়া কি? বসুন, চা-টা খান। তারপর না হয় শুনবেন।" হাসি একছুটে গিয়ে উনুন ধরায়।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে অমিয় বলে, বেশীক্ষণ বসতে পারব না আজ।"

"কেন কী হয়েছে?"

অমিয় একটা ভাসা ভাসা জবাব দেয়, "কাল রাত্তির থেকে এমন জ্বর জ্বর করছে শরীরটা।"

হাসি সহজ গলায় বলে, "জ্বর হয়েছে তা বেরিয়েছেন কেন?"

সিধে জবাব। চটবার কোন কারণ নেই। অমিয় তবু চটে যায়। মেয়েদের মনের রহস্য এখনও মাঝে মাঝে মনে হয়, ঠিক ধরা পড়ে না তার কাছে। একটু চেষ্টা করে ভেবে বলে, "জ্বর নিয়েও কেউ কেউ তো ছুটে আসে।"

হাসি তাকায়। অমিয়র সেই একজোড়া অপলক চোখ। বেশ বানিয়ে বানিয়ে অমিয় কথা বলবার চেষ্টা করছে, আর তাও পারছে না, এটা অস্পষ্টভাবে তার মনে উঠেই মিলিয়ে যায়। নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, "আমার সঙ্গে কি আপনার এত দরকার?" গলা কাঁপল একটু।

"হ্যাঁ, এতই দরকার।" অমিয় যেন প্রার্থনা করছে; এমন উজ্জ্বল, অপলক, নির্মল তার চোখের চাউনি। সে চোখে চোখ রেখে হাসির মনে হল, হতে পারে—হতে পারে এ দরকার সত্যিই অন্তরের?

কি একটা ছুতো করে হাসি ভেতরে পালায়। আর সুবোধের ফটোটার দিকে তাকিয়ে অমিয় ভাবে, সুবোধকে যতখানি গাড়োল ভেবেছিল তার কলকাতার অভিজ্ঞতা থেকে সেরকম বোধ হয় সে নয়। সুবোধের সেই কথাগুলো কি সত্যি—

বেশীর ভাগ লোকের জীবনে ভালবাসা একটা অবাস্তব ব্যাপার, কতকগুলো তৈরি করা সাজানো কথা মাত্র ? অস্বস্তিকর চিন্তা যেন জোর করে সরিয়ে দিল অমিয়।

হাসি ফিরে আসে কাপড় বদলিয়ে। সামান্য পাউডার ছুঁয়ে চুল পালটিয়েছে মনে হয়।

অমিয় বললে, "কই বললেন না তো, কেন আপনি আমার দলে ?"

হাসি বলে, "ওসব বাজে কথা আমি বলি না।"

"বাজে কথা মানে ?"

"মানে আর কি ? ও সব বড বড় কথা আপনাদের জন্যে। আমরা ছোট্ট মানুষ, ছোট্ট বুদ্ধি। ঠিক বুঝি না।"

অমিয় সামনের দিকে ঝুঁকে নীচু গলায় বলে, "আমরা সবাই এড়িয়ে যেতে চাই। সব্বাই। ভাবি, যে সব কথা আমাদের মনের মধ্যে আছে, তা না বললেই যেন শান্ত হয়ে যাবে।"

হাসি ধীরে ধীরে একটু ইতস্তত করে বলে, "কোন কথা ?"

অমিয় বলে, "সেদিন বেড়াতে গিয়ে যা বলা হচ্ছিল ?"

হাসি মাথা ঝাঁকাল। যেন তার কোনও ব্যথায় অমিয় বার বার হাত রাখছে। বললে, "একদম বুঝি না, বললাম তো। ছোট্ট মানুষ আমি।" অমিয় বলে চলে, "তা হলে এত সব পড়াশুনার কি মানে হল ? এত পড়া, এত স্বপ্ন দেখা, এত ভালো লাগা খারাপ লাগার কী মূল্য। জানেন সব সময় মনে হয়, মানুষের মন কী সাংঘাতিক রকমের একলা। কলকাতায় যখন শুয়ে থাকি, রাত্তির মনে হয় কাটে না, যেন অন্ধকার আর অন্ধকার, পারই হচ্ছি, খালি পারই হচ্ছি।"

বিকেল হয়ে এসেছে। ঘরে রোদ্দুরের রঙ বদলাচ্ছিল। সোফার সবুজ মাথাটা লালচে লাগছে। সিগারেটের শেষ অংশটুকু ফেলবার জন্যে উঠে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল অমিয়। শেষ টানটা একটা দীর্ঘনিশ্বাসের মত নিয়ে বললে, "অথচ বেশীর ভাগ ঘরেই দেখুন, কী সুন্দর মিষ্টি কথা। 'নোরার' সমস্যাটা প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই।"

হাসির গলা কেঁপে ওঠে, বলে, "তবে, ভালবাসা বলতে কি কিচ্ছু নেই ?"

"ভালবাসা বলতে—না, তা বলতে পারি না। তবে," হাসির দিকে তাকিয়ে সোজাসুজি অমিয় কথাটা বলে ফেললে, "তবে, এটুকু বলতে পারি, বিয়ে করাটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একধরনের থিয়েটার করা। ঝগড়া হতে পারে তাই মন রেখে কথা বলতে হবে। দুজনে দুজনকে ছেড়ে যেতে পারব না, তার কারণ আর

কিছু না, নেহাত উপায় নেই বলেই তাই।"

হাসি বলে, "আপনার কথা শুনতে ভালো লাগছে। কিন্তু মানে বুঝছি না। আপনি কী চান?"

"তা যদি নিজেই জানতাম।"

হাসি বলে "আমার মনে হয়, আপনি তা জানেন।"

অমিয় এক দৃষ্টিতে হাসির দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, "তবে, কেন মিছিমিছি কথার খেলা করছেন?"

হাসি এই প্রথম কৌতুক অনুভব করলে। অমিয় এমন গুরুগম্ভীরভাবে বলতে চাইছে কেন, এতক্ষণে যেন তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একটু নড়ে চড়ে আঁচলটাকে বুকের ওপর মেলে দিয়ে হেসে বললে, "আপনি এত জানেন অমিয়বাবু।" অমিয় ব্যগ্রভাবে বলে, "কিছুই না, কিছুই না। সমস্ত জীবনটাই একটা রহস্যের মত লাগে। কোথাও তার নাগাল পাই না।"

হাসি হাতের মুঠোটাকে শক্ত করে মাথা ঝাঁকাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কখন যে ঘনায়মান অন্ধকারে অমিয় তার পাশে বসে তার হাতখানা হাতে তুলে নিয়েছে তা যেন নিজের বুকের রক্তের তোলপাড়ে খেয়াল করেনি সে। আর মনে হয় না, সত্যি কি মিথ্যে, ন্যায় কি অন্যায়, শুধু গত কয়েক মাসের এক দীর্ঘ একটানা ক্লান্তির পর রক্তের এই ঝমঝম তাকে আচ্ছন্ন করে। তার সমস্ত বিচার বুদ্ধিকে লুপ্ত করে অমিয়র এক ঝাড় চুল নেমে আসে তার বুকের ওপর। কতক্ষণ, খেয়াল থাকে না। এক তন্দ্রাচ্ছন্ন আবেশে তার ডান হাতখানা অমিয়র মাথা বুলোতে থাকে। তারপর যখন দুজনেই সামলে নিয়েছে, নেহাত নিবিষ্ট মনে পাশাপাশি বসে আছে, চেনাশোনা লোকের মত, তখন হাসি জিজ্ঞেস করলে, "তাহলে—তাহলে—" অমিয় উত্তর দেয় ম্লানভাবে, "তা কি জানি হাসি? যদি জানতাম।" হাসি মাথা ঝাঁকিয়ে বলে ওঠে "অত হেঁয়ালী করেন কেন? এত শক্ত শক্ত করে কথা বলেন আপনি।" তারপর কি একটা কথা মনে পড়েছে, এমনি ভাবে হঠাৎ উঠে পড়ে বলে, "সুবোধ এসে পড়বে এখনি। কালকে হবে না, পরশু দিন আসবেন।"

অমিয়কে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল, যখন সূর্যের আলোর দিকে মুখ করে বেরিয়ে গেল সে। হাসি অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকল সেদিকে।

সুবোধ এলে তাকে খাবার দিয়ে পাশের ঘরে এসে গীতবিতানটা খোলে, কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর প্রথমে গুন গুন করে ধীরে ধীরে গান করে, তারপর গলা ছেড়ে দেয়—

"কাহার গলার পরাবি গানের রতন হার ...."

সুবোধ ক্রশওয়ার্ড পাজল করতে করতে পাশের ঘর থেকে চেঁচিয়ে বললে, "বেড়ে গাইছ তো!"

যদি ভাবা যেত অমিয় হাসিকে ফুসলিয়ে বাড়ির বার করার চেষ্টা করছে (যে ধরনের ঘটনা প্রায়ই খবরের কাগজে দেখা যায়) তবে গল্পের সুবিধে হত। কিন্তু অমিয়র বিপন্ন একলা ভাবকে কেন হাসি প্রশ্রয় দিলে? বুদ্ধিমতী সে, বলতে পারত, "মাসীমাকে বলব, আপনার বিয়ে দিয়ে দিতে।" কিংবা ব্যাপারটাকে সহজে হালকা করে নিতে পারত। হাসি কিন্তু চায় না, ব্যাপারটা হালকা হয়ে যাক।

ছোট বেলা থেকেই সে ভেবে আসছে ব্যাপারটা। সত্যগোপাল আর বৌদির দিনরাত খিটিমিটি, মেয়ের চুলে জল আছে কিনা, তাই নিয়ে সমস্ত বাড়ি তোলপাড় করা, এর মাত্র একটা কারণই হাসি আবিষ্কার করেছে—ভালবাসার অভাব। আর ছোড়দাকে তার যে জন্যে ঠিক ভালো লাগে না, তার কারণ সে চিরকালই এ ব্যাপারটায় কেমন কাঠ কাঠ ভাবে কথা বলে। এমন তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে ব্যাপারটাকে নেহাত ছেলেমানুষির পর্যায়ে ফেলে দেয় যে, হাসির পালাতে ইচ্ছে করে সেখান থেকে। তারপর সুবোধ। মনে হত, এবার বোধহয় একেবারে অন্যরকম লাগবে, আচমকা ভালো লাগার এক প্রকাণ্ড তোলপাড়ের মধ্যে প্রত্যেকটা দিন ভেসে যাবে। কিন্তু সেরকম কিছুই মনে হয়নি বিয়ের পর। ভালবাসা ব্যাপারটা কি তা হলে নেহাত ভুয়ো, কয়েক মুহূর্তের সস্তা বিহ্বলতা?

একটা দিন বাদ দিয়ে অমিয় যখন সকাল সকাল হাসির বাড়ি এল, তখন তাকে দেখে মনে হল সে বেশ তৈরি হয়েই আছে। বেশ গোল গোল করে এক নতুন কায়দায় চুল পেঁচিয়েছে, স্থানীয় মেয়েদের মত কয়েকটা চাঁপা ফুল গুঁজেছে খোঁপায়। চকচকে তাঁতের সবুজ শাড়ি আর মুখচোখে এমন একটা তাজা ভাব যে, অমিয়র কথা বলতে বেগ পেতে হল না।

অমিয় অনেকগুলো কায়দা ভেবে এসেছিল। বিজয়ার মন পাবার জন্যে নায়ক-নরেনের মত সাউথ আফ্রিকায় না হোক, কালই কলকাতা এবং কলকাতা থেকে টাটায় কি একটা চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছে—এরকম কয়েকটা টোপ দিয়ে একটু খেলাবার জন্যে সে তৈরি হয়ে এসেছিল। কিন্তু তার দরকার হল না। হাসি গালে টোল ফেলে চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে একটা ঠাট্টা অথবা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতেই বললে "আপনি যা ঘরকুনো নিশ্চয় কাছের তালাগুটা দেখেননি। চলুন

তালাও-এর পাশে আল ধরে হেঁটে আসি।" তারপর বেশ পরিহাসের ছলেই বললে, "আর আপনার ভালবাসার গল্প শোনা যাবে।"

অমিয় অস্বস্তি বোধ করে। আগের দিনের মত লজ্জা সম্ভ্রম হাসির ব্যবহারে মোটেই নেই। বরং তার চোখদুটো আনন্দে চকচক করে উঠলেও আরও যেন তাতে কি আছে, লক্ষ্য করলে অমিয়। যেন হাসি আজ তাকে পরীক্ষা করবে, বিচার করবে।

"কি দরকার, এখানেই বসা যাক না"—অমিয় বললে।

হাসি কোন পাত্তাই দেয় না তাকে, বলে, "বাঃ বাইরে এসে ঘর সংসার করে বেরুতেই পারি না। আজ কি ভাগ্যি সুবোধ ক্লাব হয়ে বাড়ি ফিরবে রাত্তির দশটায়। চলুন, চলুন। বৈজনাথ, বৈজনাথ, বাবু এলে বলবি, দত্তবাড়ির গিন্নীমা যিনি সেদিন এসেছিলেন, তাদের বাড়ি গিয়েছি।" হাসি আগে আগে যায়, অমিয় তার পেছনে।

সেদিন চাঁদ উঠবে অনেক পরে। কালভার্টের নীচ দিয়ে যে নালাটা গিয়েছে, বর্ষায় তার চেহারা দু-কূল প্লাবিত হলেও এখন অন্ধকারে তার সাদা বালি এক মরা সাপের মত শুয়ে আছে মনে হয়। খালি এক জায়গায় পায়ের পাতা ভেজে এমনি জল হাত দশেক, পাথর বিছানো—পায়ে পায়ে পার হবার জন্যে।

হাসি আগে পার হয়ে ডাক দিল, "দেখবেন, পিছলোবেন না যেন।" এক অদৃশ্য কৌতূহল তার মনে এল হঠাৎ অমিয়কে বোকা বানাবার জন্যে। অমিয় যখন তার হাতে হাত রাখলে, তখন একবার মনে হল ঠাট্টা করে বলবে, "ও আবার কি হচ্ছে?" কিন্তু এও মনে হল, এ হাতে স্পর্শের পেছনে হয়তো বা সত্যিই কিছু আছে, এই চারদিকের ঘনায়মান অন্ধকারের রহস্যের মত, তার জানালার বাইরে দেখা ভোরের তারার মত।

হাসি আজকে শুনতে চাইছিল, এমন ধরনের ভালবাসার কথা, যাতে তার একঘেয়েমি কাটে। সুবোধের বিয়ের আগে ভালবাসার ধরন ছিল এক বিশেষ রকম, তার মধ্যে অমিয়র মত জন্মমৃত্যুর সমস্যা, বাঁচার ক্লান্তি, আনন্দ—কোনও কথাই টেনে আনত না সে। সিনেমায় যেত এক সাথে হৈ হৈ করে, সত্যগোপালের ইংরেজিপনাকে সস্নেহ বিদ্রূপ করত, আর ঘর বাঁধলে মানুষ যে সুখে থাকে, তাই সুবোধ জানিয়ে দিত নানা ছলে, কখনও পারিবারিক গল্প তুলে, কখনও আপিস থেকে ফিরে বাড়িতে একলা লাগার প্রসঙ্গে, কখনও হাসিকে উপহার দিয়ে। আর অমিয়?

তালাও-এর ঘাটে বটগাছ থেকে পাতা পড়ে সিঁড়িগুলো সব ছেয়ে আছে। শুকনো পাতা খসে পড়ছে শীতের হাওয়ায়। হাসি অমিয়র কাছ থেকে খানিকটা দূরে বসে

পড়ে বলে, "অত ভাবছেন কি ?"

এক ঝাঁক বক জলের ধারে একটা শিমুল গাছের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। অমিয় সেদিকে তাকিয়ে বলল, "ভাবছি, কাল চলে যাব।"

হাসি চমকিয়ে উঠল। "কাল ? কালকেই যাবেন কেন ? এই তো মাত্র সেদিন এলেন !"—সংযত হবার চেষ্টা সত্ত্বেও হাসির গলা বেমানান ভাবে কেঁপে উঠল।

অমিয় বলে, ঠাণ্ডা গলায়, "নাঃ ভালো লাগছে না।"

"কেন বন্ধুবান্ধব নেই বলে।"

অমিয় বলে, "নাঃ ঠিক তা নয়। বন্ধুবান্ধব আমার বিশেষ নেই। যারা আছে, তারা নেহাত কথাবলার লোক।"

হাসি আগ্রহের সঙ্গে বললে, "তবে যাচ্ছেন কেন ?"

অমিয় এবার তার মনের কথা বলার সুযোগ পেল। কিন্তু কেন জানি হেলায় হারাল সে সুযোগ। একেবারে কথার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে বললে, "না, কতদিন আর বাপের পয়সায় খাব ! চাকরি-বাকরি একটা করা দরকার।"

"ও, সেই জন্যে ? তা নয় চাকরি করবেন ! তাই বলে অত মুখ গোমড়া করে আছেন কেন। অত ভাববেন না।" হাসি কথাটা শেষ করে শুকনো কতগুলো পাতা, যা এতক্ষণ সে কোঁচড়ে করে নাচাচ্ছিল, হঠাৎ অমিয়র পিঠের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলে, "অত গম্ভীর কথা আমার ভালো লাগে না।"

অমিয় হাসির দিকে একটু ঝুঁকে বলে, "কী ভালো লাগে ?"

কোনও দরকার নেই, তবুও সিঁড়িতে হেলান দিয়ে হাত দুটো দিয়ে খোঁপা সামলে নিয়ে একটা সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে হাসি ধীরে ধীরে মাটি থেকে অমিয়কে দেখতে লাগল। তারপর মৃদু হেসে অনায়াসে বললে, "তা কি আপনি জানেন না ?"

অমিয়র আজকে কি হয়েছে বলা মুশকিল। এ অবস্থায় পড়ে আগে দু-তিনবার সে যা করেছে, এবারও তাই করাটাকে স্বাভাবিক না ভেবে কেন নেহাত বাঁদরামি বলে মনে হল, তা সে টের পায় না। নিজেকে কেমন যেন ছোট মনে হচ্ছিল, নিজের কাছে। এসব ব্যক্তিগত কথার মনোরম পথ ছেড়ে সে আবার ফিরে গেল চাকরির কথায়, "নাঃ, চাকরি একটা করা দরকার। অনেক আজেবাজে ভাবনা-চিন্তা থেকে বাঁচা যায়।"

এবার হাসি আহত হল। কয়েক দিন আগে দেখা যে স্বপ্নবিহ্বল তরুণ অমিয়র মধ্যে ছিল, সে আজ কোথায় ? অমিয় কি বিরক্ত হয়েছে, না, সে নিজেই বেশী দূর এগিয়ে গিয়েছে ?

অমিয়র মনে পড়ছিল অন্য কথা। বছর তিনেক আগে রিচি রোডে যখন তারা থাকত, তখন পাশের বাড়ির মিনির সাথে আলাপ হয় তার। অন্ধকার রাতে বাড়ির সামনে ম্যাডাস স্কোয়ারে ঘাসের ওপরে পাশাপাশি তুজনে বসে। অমিয় বলেছিল, "পরশু সার্কুলার রোডে কী আশ্চর্য চাঁদ উঠেছিল মিনি!" আর মিনি খুব হাসত। চাঁদ ওঠার সঙ্গে হাসির কোনও সম্বন্ধ না থাকলেও হেসে কুটিপাটি হত। আর খুশিকে একদিন গঙ্গার ধারে নিয়ে গিয়ে খুব আবেগের সঙ্গেই বলেছিল, "জানো খুশি, বেঠোফেনের 'মুনলাইট সোনাটা' শুনলে মন কি রকম করে? মনে হয়, এত ছাড়া ছাড়া আমরা, কোথাও যেন কারও নাগালই পাওয়া যায় না।"

আর আজ স্বচ্ছ তালাও-এর ওপর দ্বাদশীর চাঁদ, ঘাটের সিঁড়িতে জ্যোৎস্নার জালি, পাশে ধানকাটা ক্ষেতের নিস্তব্ধতা, দূরে কালভার্টের ওপরে বাসের আনাগোনার চমকিত শব্দ, আর—হাসি।

হাসি হাই তুলে বলে, "আমার আর গম্ভীর ভদ্রলোকের সাথে থাকতে ভালো লাগছে না।" সিঁড়ির ধাপে পা ছড়িয়ে দিয়ে কনুই তুটো ঘাটের ওপরের ধাপে রেখে শরীরটাকে টান করে দিতে দিতে হাসি ব্যঙ্গ করলে, "কি মশাই, ভালবাসার গল্প বলবেন না?"

এ কি কৌতুক নিত্য নতুন, কৌতুকময়ীর আসল মানে কি ফ্লার্ট?

অমিয়র যেন সত্যি কি হয়েছিল, মোটেই ভালো লাগছিল না, বানিয়ে বানিয়ে ভালো ভালো কথা বলতে। বলতে গিয়ে কথা বেধে যাচ্ছিল। যেন এই সর্বপ্রথম তার কাছে কথার মানে হারিয়ে গেছে।

হাসি আবার ব্যঙ্গ করলে, "লজ্জা করছে বুঝি? আশেপাশে স্থবোধ নেই, কোনও পাহারা নেই, তাই বলে?"

অমিয় চুপ করে শুকনো পাতাগুলো পায়ের আঙুল দিয়ে সরাতে থাকে। ভাবলে কিছু বলবে না, কিছু করবে না। কিন্তু অভ্যাস,—অভ্যাস যে কিছুতেই যায় না। বন্ধুদের সঙ্গে নারীঘটিত ব্যাপারের আলাপের অভ্যাস, ইংরেজি ফিল্ম দেখার অভ্যাস। সেই অভ্যাসেই অমিয় এক ঝাপটা মেরে বুকে টেনে নিল হাসিকে। কিন্তু টেনে নিয়ে কাঠ হয়ে গেল তার শরীর। কী এক অদ্ভুত পথে তার চিন্তা হঠাৎ চলে গেল। মনে পড়ল তার পাড়ার লালির কথা। লালি তাদেরই পাড়ায় থাকে, লাল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লোম। কুকুর বংশেয় কোনও স্ত্রীলোকেরই নিস্তার ছিল না তার কাছে। তাহলে লালি আর অমিয়?

হঠাৎ অত্যন্ত নিস্পৃহভাবে হাসির হাত ছাড়িয়ে সরে বসল অমিয়। একটা বিরক্তি

আর হতাশার ভাব তার মুখেচোখে এত প্রকট যে হাসি কেঁদে ফেললে। বুকের কাছে একটা হাত রেখে হাসি প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বললে, "আমি তো কিছু চাইনি আপনার কাছে, কিছু চাইনি!" মুখে কাপড় চেপে উঠে দাঁড়ায় সে, তারপর অমিয়কে কিছু বলার অবকাশ দেবার আগেই ছুটে পালিয়ে যায়।

পঁচিশ

অমিয় যখন ফেরে, তখন রেললাইনের ওপারে নাচের বাজনা বাজনা বাজছে, কান মুড়ি দিয়ে সাইকেল রিক্সাওয়ালা চলেছে সেদিককার আস্তানায়। রাঁচীর বিখ্যাত কড়াইশুঁটি যা কলকাতার বাজারে এসে ভাগ্যবানদের তৃপ্ত করে, তার বিস্তৃত ক্ষেতের ওপর চাঁদের আলো পড়েছে। অমিয় কিন্তু এসব দেখবার সময় পায়নি, সে ভাবছিল অন্য কথা।

অমিয় ভাবছিল, একটা পরিচ্ছেদের শেষ হল তার জীবনে। অবশ্য এর আগেও সে এ রকম ভেবেছিল। কিন্তু এবারে তার মনে হল, এ পরিচ্ছেদটাকে আর বেশী দূর টনা যাবে না। তা হলে প্রশ্ন—কী করবে। কলকাতার ফিয়ে আবার সাউথ হলের আড্ডায় সকাল নটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত চা খেতে খেতে কে কত ভালো ইংরেজি বলতে পারে, তার পাল্লা দেবে, কিংবা চিরাচরিত প্রথায় বলবে, নারীজগতের বিস্তৃত ক্ষেত্রে কে কতরকম পিকনিক করেছে। এ দুটোই এত পুরনো ঠেকে তার কাছে।

একটাই উপায় আছে। তা হল চাকরি নেওয়া বোধ হয় চাকরির নটা-ছটার ভেতর পড়লে জীবনটাকে এ রকম অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে দেখবার ইচ্ছেগুলো আর থাকবে না। কিন্তু মামা কই? কেরানীর চাকরি ছাড়া আর একটু বড় কিছু করতে গেলেই মামা চাই। বিলিতি ফার্মে একজিকিউটিভ হ্যাণ্ড হতে গেলে এক বড় খানদানী ঘরের ছেলে হওয়া চাই, নইলে দিল্লী সার্কেলে বাপ থাকা চাই। উপায় একটাই আছে—বিলেত।

দু-তিন দিন অমিয় তার বাপ-মার সঙ্গে কি আলোচনা করলে, বোঝা গেল না। বাবার নাকি আপত্তি ছিল। কিন্তু অমিয়র মা অমিয়র দিদিমার দেওয়া সোনা বিক্রি

করা স্থির করলেন। এ ছাড়া চায়ের শেয়ারগুলোর ডিভিডেণ্ট থেকে অমিয়দের সংসারে বেশ কিছু আসত, তাও বিক্রি করা হবে ঠিক হল।

অমিয় বিলেত গিয়ে কি করবে? ব্যারিস্টারি—যা ওখানে গিয়ে সবাই পড়ে, তা পাশ করে বিশেষ লাভ হবে না। আর অক্সফোর্ডে গিয়ে ফের ইংরেজি সাহিত্য পড়বে ভাবতে হাসি পায় তার। মাস দুয়েক আগে থেকে কলকাতার এক নিউজ এজেন্সিতে বিকেলে সে কাজ করছিল। কিছু দিন আগে একটা চিঠিও লিখেছিল, তাদের হেড-কোয়ার্টার লণ্ডনের আপিসে যদি কিছু দিন থেকে কাজ শিখতে পারে, সেইজন্যে। সপ্তাহ খানেক আগে রাঁচীতেই তার উত্তর এসেছে। এ ছাড়া আর একটা সুযোগও তার ছিল। অমিয়র বাবার বাড়িতে থেকে একটি পার্শি ছোকরা পড়াশোনা করতেন। তিনি এখন লণ্ডনে একটা হোটেলের ম্যানেজার, বেশ প্রতিপত্তিশালী লোক। তাঁর মারফত একটা পার্ট-টাইম চাকরিও পাওয়া যাবে। অমিয় কলকাতা রওনা হয়ে গেল হাসি সুবোধকে না জানিয়েই। দু-দিন পর হাসি জানলে কথাটা অমিয়র মার মারফত। অমিয়র যৌবনের সঙ্গী 'সাউথ হলে' বিষাদের ছায়া নেমেছে।

মিষ্টভাষী মোটা ম্যানেজার পরেশবাবু বিব্রত হচ্ছিলেন এই ভেবে যে অমিয় গেলেই তার আশে পাশে যে মধুচক্রটা জমেছিল, তা ক্রমে লোপ পাবে। নেহাত কম নয় তারা। প্রায় বছর চারেক ধরে জনা কুড়ি-পঁচিশ একেবারে পার্মানেণ্ট খদ্দের।

ঠিক হল 'সাউথ হলে' একটা বিদায়ী ডিনার দেওয়া হবে অমিয়কে। চাঁদা তোলা হল তিন টাকা করে মাথা পিছু। মেনু—মুর্গির মাংস, চাও চাও আর চকলেট পুডিং—যার ইংরেজি নামটা বাংলায় করলে দাঁড়ায় "বাষ্পাকুল সুলতানা।" মেনু-কার্ডের ওপর লেখা হল, "ফিউনার‍্যাল ডিনার।" সন্ধ্যে সাড়ে আটটার সময় যখন কুড়ি পঁচিশ জন তরুণ জমা হল সাউথ হলে এসে, তখন সত্যিই মনে হচ্ছিল, একটি পরিচ্ছেদের সমাপ্তি। কারণ এটা শুধু অমিয়র বিদায়ী সভা সত্যিই নয়, এই তিন-চার বছর ধরে কোনও রকম টেনে টুনে যে বন্ধুত্বের রসচক্র অটুট রাখা গিয়েছিল, তা যেন এবারে ভেঙ্গে পড়বে মনে হল। ইতিমধ্যেই তাদের দুজন, যারা সরকারি চাকরিতে পরীক্ষা দিয়ে সাফল্য লাভ করেছে, তাদের চিন্তার জগৎ যেন ইতিমধ্যে আলাদা হয়ে পড়েছে। এছাড়া তাদের লীডার বুড়ো বলে যে ছেলেটি কি বর্ষা কি শীত সব সময়ই সাদা পাম্প পরে আসত, সেও এবার কাস্টমসে প্রিভেন্টিভ অফিসার হয়েছে। যারা আছে, তাদের কেউ কেউ বিলেত যাবে, যেমন সাচু। আর যারা এখানে থেকে যাচ্ছে চায়ের আসরে, তাদের মেজাজ মরে গিয়েছে অনেকেরই। তাদের কেউ কেউ অত্যন্ত আলগাভাবে বামপন্থী রাজনীতির কথা ভাবে, এবং সুযোগ পেলেই জানিয়ে

দিতে ছাড়ে না যে, বাংলা দেশের চিফ সেক্রেটারির কাজ ছাড়া আর সমস্ত কাজই তাদের পক্ষে অযোগ্য।

পরেশবাবু তাঁর রেস্তোরাঁ সাড়ে আটটার পর বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন। পর পর সাজিয়ে এক করা হল টেবিলগুলো। পরেশবাবুর স্ত্রীর হাতের এমব্রয়ডারি করা টেবিল-ক্লথ দিয়ে টেবিল ঢেকে দিয়ে ফুলদানিতে কয়েক ঝাড় ফুল সাজিয়ে ছেলেরা খেতে বসল।

'বাম্পাকুল স্থলতানা' চমৎকার লাগল। সকলের খাবার পর একটা অভিনব ব্যবস্থা হল। আইডিয়াটা এসেছিল অমিয়রই মাথা থেকে। ইংরেজি কায়দায় 'টোস্ট' করা, অবশ্য মদে চুমুক দিয়ে নয়, সাদা জলে চুমুক দিয়ে। সে উপলক্ষে স্মার্ট ইংরেজি বলবার ও শোনবার জন্যে দুটো-তিনটে বক্তৃতারও ব্যবস্থা হল। মেনুকার্ডে পেনসিল দিয়ে বাবুন লিখলে—

১। টু দ্য সাউথ হল—বুড়ো ব্যানার্জী
২। এণ্ড অফ্ এ চ্যাপটার—অমিয় দত্ত
৩। টু দ্য ফিউচার—বাবুন সরকার

বুড়োর ইংরেজি বলার মধ্যে একটা আর্ট ছিল। সে একবুক নিশ্বাস নিয়ে ইংরেজি বলতে আরম্ভ করলে, প্রায় হঠাৎ কোনও ভালো কথায় এসে চট করে অনেকখানি আওয়াজ একটা দমকা হাওয়ার মত ছেড়ে দিতে লাগল।

"Gen'men, beauty is fragile. As beautiful flowers fade, so our South-Hall fades, and what remains finally is memory. In my memory, I shall always cherish Amiya as one I love best. I love him and shall continue to do so."

বেশ লরেন্স অলিভিয়ারের মত ঘাড়ের ওপর দিয়ে তাকিয়ে কথা শেষ করলে বুড়ো। অমিয় ঠাট্টার ছলে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু গম্ভীর হয়ে গেল শেষের দিকটা—

Yes, it is the end of a chapter. One may ask, what's the use. I should say that at this stage when one is at the wrong end of twenty-five, we should cease to search for a purpose in our every action. After all, we must have the courage to accept graciously what life offers to us. And when you remember how over shrinking coffee-cups and with gaping purses we built up a solidarity throughout these years, we must say

that the chapter was glorius."

বাবুন : **"To The Future."**

"Gentlemen, if I am permitted to refer to the imagery of painting, I should say that our future is like a futuristic painting with its uncertain lines and chaotic colours, one thing is however solid in this chaos—our solidarity and friendship. Wherever we may be in London or in New York, we shall always build South-Halls."

বাবুনের শেষ কথাটায় সকলেই অন্তরঙ্গভাবে হাততালি দিল। রেস্তোরাঁর ভেতর এতক্ষণ বড় গরম লাগছিল বিশেষ করে অমিয়র মত যারা গরম কোট চাপিয়ে এসেছে, তাদের কাছে। বাইরে এসে যখন তারা দাঁড়ায়, তখন শেষ ট্রাম যাচ্ছে। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে সবেমাত্র।

বেড়ে হাওয়া চারদিকে। সামনেই দেবদারু গাছটা পাতা ছেড়েছে। কচি পাতাগুলোর ওপরে ইলেকট্রিকের আলো, আর সবে জল পড়ায় যেন পেখম তুলে নাচছে সমস্ত গাছটা।

এক মাস পর এডেনের শীল-মারা একখানি চিঠি পেল হাসি। অমিয়র মায়ের কেয়ারে এসেছিল। মিসেস দত্ত দিয়ে গেলেন।

খামখানা খুলতেই ফর্ ফর্ করে গোটানো মাদুরের মত জোড়া লাগা একখানা জাহাজের ছবি খুলে গেল। এস্ এস্ করফু, ২০ হাজার টন। জাহাজের ডাইনিং রুমের ছবি, ডেকটেনিস খেলার প্রশস্ত জায়গা, ধূমপানের জন্যে সাজানো ঘর ইত্যাদি। উল্টো দিকের সাদা পৃষ্ঠায় খালি একটা কবিতা। বেশ গোটা গোটা হরফে লেখা—

চলেছি আমি সুদূরে
ভেসেছি আমি সাগরে,
যদি বা যাই গো ভাসিয়া
যেও নাকো মোরে ভুলিয়া।
ঝরা বকুলের কল্পনা
কে দিল এঁকে আল্পনা
মিনতি করি ভুলো না

ভুলো না মোরে ভুলো না।
আজ সাগর হয়েছে উতল
আমার মন আজিকে পাগল
আসিছে নিশা ডাকিছে বান
ভাঙিছে তরী খান খান।
হয়ো না অধীর বন্ধু মোর
দুখের রাতি হইবে ভোর
জেনো ফের আমি ফিরিয়া আসিব
জগতের কাছে অমর হইব।
আমার প্রথম কবিতা। "অ"

হাসি চিঠিটা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করলে। পাশের ঘরে সুবোধ যেখানে গা গড়াচ্ছিল, সেখানে এসে ও কি মনে করে দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে খাটের বাজুতে হাত রেখে। হঠাৎ বলে উঠল, "দেখ, কেমন একটা মজার চিঠি এসেছে।"

সুবোধ খাটের ওপরে ফেলা চিঠিটা আলগোছে তুলে নিয়ে একবার এদিক আর একবার ওদিক দেখে বললে, "অ-টা কে? ও অমিয়!" একটু চুপ করে থেকে বললে, "অমিয়কে জানতামই আগে থেকে; যা বোহেমিয়ান টাইপ।"

পাশ ফিরে ক্রশওয়ার্ড পাজল করতে লাগল সুবোধ।

দুই ভাই

ছাব্বিশ

অনেক সময় ঘটনা ঘটে অত্যন্ত ধীরে ধীরে, এত ধীরে যে, যখন ঘটে যায়, তখনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। লক্ষ্য করতে গেলে দ্বিতীয় ব্যক্তির চোখ দিয়ে দেখতে হয়। আবার অনেক সময় এমন ব্যাপার ঘটে যে, তার নায়কও এক বিরাট আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে যায়।

চৌধুরীর ছাব্বিশ বছরের আপিস জীবনের সায়াহ্নে বাইরে থেকে কিছু চোখে পড়ে না। কোনও পরিবর্তনের এক চুলও বোঝার উপায় নেই। বাইরে আজও তাঁর আপিসে পাড়ায় তাঁকে সবাই 'সাহেব' বলে। আজও তাঁর লম্বা উস্কখুস্ক চুল, একজোড়া তীব্র চোখ আর পরনে চাঁদনি-চক থেকে কেনা সস্তা জীনের পেণ্টুলুন, পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগের মতই আজও তাঁর কাঁধ নামিয়ে পাইপ ধরাবার ভঙ্গি, ওপর-ওয়ালা লোকের সঙ্গে কথা বলবার সময় মুখেচোখে সেই নির্বিকার ভাব, আগের মতই এখনও বড় কোনও খবর এলে, প্রথমে বিচলিত হয়ে পড়েন, ছোট ছেলের মত দৌড়া-দৌড়ি করেন, কিন্তু তারপরই যখন স্থিরভাবে বসেন, তখন তাঁর স্বচ্ছ ভাষার ধার দেখে মনে হয় না, তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন।

বুড়ো না হলেও, চৌধুরীর পরিবর্তন এসেছে। পঁচিশ বছর আগে ব্যারিস্টারির ফাইন্যাল সবেমাত্র দিয়েছেন, এমনই লম্বা-চওড়া চেহারার সুপুরুষ, বিদ্বান তরুণ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর কাগজের আপিসের এক এডিটারের লণ্ডনের এক সান্ধ্য-মজলিসে দেখা হল। সাহেব এক কথায় একটা বড চাকরি দিয়ে ফেলেছিলেন। চৌধুরী বলেছিলেন, আপিসে বসে কাজ করতে তাঁর পা ধরে যায়। ছোটাছুটি ভালবাসেন, তাই রিপোর্টার হয়ে স্বদেশে ফিরে এলেন।

জীবন তখন সত্যগোপালের কাছে ছিল প্রায় একটা অ্যাডভেঞ্চার। সাহেবদের আচার-ব্যবহারে যে প্রখরতা আছে, যা দেশীয় সামন্ততন্ত্রের লদলদে ভাবের সঙ্গে খাপ খায় না, চৌধুরী ছিলেন সেই প্রখরতার ভক্ত। তাঁদের জেনারেল ম্যানেজার যদি তাঁর নামের আগে মিস্টার বাদ দিতেন, তাহলে অবলীলাক্রমে চৌধুরী মিস্টার বাদ দিয়ে তাঁর জেনারেল ম্যানেজারকে ডাকতে কোনওদিন দ্বিধা করেন নি। তাই যখন সাহেব মারার যুগ এল, লবণ আন্দোলন হল, কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় মদের দোকানের সামনে পিকেটারদের সঙ্গে পুলিসের ফাটাফাটি হল, এমন কি বিয়াল্লিশ সালেও যখন টাই পুড়ল রাস্তায়, তখনও চৌধুরী বিচলিত হন নি। গভীর আনন্দের

সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। পর পর সাড়ে আটটায় গিয়ে রাত্তির তিনটেয় বাড়ি ফিরেছেন। কাজের আনন্দে এমন মেতে রইলেন যে, জ্যোৎস্নাদি তাঁর জীবনে একটা অত্যন্ত অনাবশ্যক ঘটনা হয়ে রইলেন। শুধু বিয়ে বললেই ভুল হবে, তাঁর সমসাময়িক বড় চাকুরেরা যখন নিউ আলিপুরে বাড়ি করছেন, তখনও তিনি তিনখানা ঘরওয়ালা ফ্ল্যাট ছেড়ে কোথাও যাবার কল্পনাও করেন নি। ভাইদের অনেকগুলো আইবুড়ো মেয়েকে চড়া পণে পাত্রস্থ করেছেন। এক টিবি-রোগাক্রান্ত ভাইপোকে ভাওয়ালী স্যানাটোরিয়ামে পাঠিয়ে কয়েক বছর প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও তাঁর মন খুঁত খুঁত করেছে তাঁর ভাইপোর ভালো চিকিৎসা হয়নি বলে। কোনও ব্যাপারেই তিনি হিসেবী ছিলেন না, তাই আত্মীয়স্বজন, তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোক কেউ তাঁকে ভালো নজরে দেখেনি কোনদিন।

সংসার-আপিস, কিছুর ঝঞ্ঝাট তাঁকে স্পর্শ করেনি এতদিন। চৌধুরী কিন্তু বিচলিত বোধ করছেন, নেহাত সম্প্রতি,—যুদ্ধের শেষের দিক থেকে। তিনি নিজেই ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না, তাঁর অসোয়াস্তির পেছনে কোনও সঙ্গত কারণ আছে কি না এই ভেবে। এক একবার মনে হয়েছিল, বয়স বাড়ছে বলেই বোধহয় তিনি খাপ খাওয়াতে পারছেন না।

কিছু দিন হল তাঁদের আপিসে একটা পরিবর্তন এসেছে। মাসখানেক ছুটির পর চৌধুরী আপিসে এসে অবাক হলেন। তাঁদের টেবিলে তাঁর সীটে এক নতুন ভদ্রলোককে দেখে চমকিয়ে যান চৌধুরী। ছোটখাট চেহারা, ফর্সা রঙ, পাতলা হয়ে গেছে সামনের চুল, সরু চাপা ঠোঁট—মিস্টার সেন উঠে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে বললেন, "মানুষের ভাগ্যে লেখা থাকলে কী না হয়! বেশ তো ছিলাম দিল্লীতে, আবার আপনাদের মাঝে যে আসতে হবে, ধারণাও করতে পারিনি।" বাংলায় বললেন, "কেমন আছেন, চৌধুরী সাহেব? আমাদের মত তো আর ঘোরতর সংসারী লোক নন আপনি। আপনাদের আইডিয়া আছে, নানা জিনিষ ভাবেন। আর আমরা উই হ্যাভ সোলড আওয়ার সোল ফর এ মেস অফ পটেজ।"

ঠিক এমনি সময় এক সাহেব ঘরে এসে ঢুকলেন। বিদেশী ফুটবল খেলোয়াড়দের মত বেশ স্বাস্থ্যবান চেহারা, সাধারণত মুখের ভাবখানা খুব প্রশান্ত। কিন্তু এখন বেশ উত্তেজিত বলে মনে হল। চৌধুরীর দিকে না চেয়েই সোজা সেনের দিকে তিনি তাকালেন। সেন চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ান। সাহেব বললেন, "আমি বলেছিলাম না তোমাকে সেন, পার্ক স্ট্রীটের ঐ কেসটা সম্বন্ধে খোঁজ করতে। এখন এডিটর আবার ক্ষেপে গেছেন।"

"আমি এখনই পাঠাচ্ছি রায়কে ব্যাপারটা খোঁজ করতে।" সেন জবাব দেন। যাবার সময় সাহেব খালি একবার আড়চোখে তাকিয়ে বললেন "হ্যালো চৌধুরী।" চৌধুরী একটু অবাক হলেন। ভাবেন, ক-দিনের ব্যবধানে এমন কি হল?

পার্ক স্ট্রীটের ভারটা পড়ল রায়ের ওপর। পাতলা ছিপছিপে চেহারা, চিকণ কালো রঙ, উজ্জ্বল বড় বড় চোখ, বছর পঁয়ত্রিশ বয়স—এই ভদ্রলোকের সঙ্গে পুলিসের লোকের খাতির খুব বেশী। বিশেষ করে সেইসব তরুণ আই-পিদের সঙ্গে তাঁর আলাপ, যাঁরা পূর্বতন যুগের পুলিশ অফিসারদের মত ঘাড় অসম্ভব ছোট করে ছাঁটেন না, কলেজে পড়া ইংরেজি সাহিত্যের কিংবা ইওরোপীয় ইতিহাসের গন্ধ যাঁদের গা থেকে একেবারে মোছেনি, সন্ধ্যেবেলা বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'হুইস্কি ওয়েদার' হলে এই ধরনের অফিসারদের সঙ্গে জীবনের বিচিত্র সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে করতে টুক করে খবর বের করে নেন রায়।

সেই ভদ্রলোক প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকে দেখেন চৌধুরী ছাড়া আর কেউ নেই। তার চকলেট কর্ডের সঙ্গে চীনে বাড়ি থেকে তৈরী করা সাপের চামড়ার চকরা-বকরা জুতোয় বড্ড ধুলো পড়েছে; চৌধুরী হাসলেন রায়ের চেহারার দিকে তাকিয়ে।

চৌধুরীকে একা পেয়েই রায় ভুলে গেলেন, তাঁর কাজের কথাটা। আপিসের সব ব্যাপারে আছে, অথচ সব ব্যাপারে নেই, এই মানুষটাকে মনের কথা বলতে ভয়ও লাগছিল তাঁর, কিন্তু কিসের তাড়নায় চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়েই গলগল করে বলতে শুরু করলেন, "আর বলবেন না মিঃ চৌধুরী। যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি বলব, আই অ্যাম ডিসগাস্টেড। হ্যারিস না কে একটা মরেছে পার্ক স্ট্রীটে। এরকম কত হরিদাস মারা যাচ্ছে এদিক সেদিক। গিয়ে দেখি একটা বদমাইস পাঁড় মাতাল, পুলিসের রেকর্ডে কী যে আছে আর কী যে নেই তার নামে। আর আমাদের এডিটার ইনটারেস্টেড।"

তারপর খানিকটা জিরিয়ে নিয়ে সেই পুরনো কথাটাই পুনরাবৃত্তি করলেন, "আপনি তো আপনার লাইফটা পার করে দিলেন, মিঃ চৌধুরী। আমি যে কী করব ভেবে উঠতে পারছি না। যখন ঢুকেছিলাম তখন অনেক আশা ছিল,—লুই ফিশার, গান্থার, এড্‌গার স্নো—এদের মত না হতে পারলেও, একটা কিছু হব ভাবতাম। তখন কি জানতাম, দশ বছর খালি মুচিপাড়া আর বড়বাজার থানার ও-সির সঙ্গে রেপ-কেস, পয়জন-কেস নিয়ে আলাপ করতে করতে কেটে যাবে! জানেন, আপনাকে খুব একটা পার্সোনাল কথা বলছি। আপনি জানি ভুল বুঝবেন না। কলেজে কী দারুণ

ইংরেজি লিখতাম। হ্যামলেটের মেলানকোলি কোয়েশ্চানে দ্বিয়েছিল, প্রফুল্ল ঘোষের পেপার, আঠারোতে ষোলো পেয়েছিলাম। আর সেই আমি" মিঃ রায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন।

চৌধুরী চুপ করে থাকেন। মনে মনে একটু আশ্চর্যও হন। বিয়ের আগে সুবোধের সঙ্গে যখন আলাপ হয়েছিল, তখন সুবোধও ঠিক এই ধরনের কথা বলত। ঠিক কী বলেছিল সুবোধ, তা এখন তাঁর মনে নেই। কিন্তু অনেক কিছু হতে চেয়ে কিছু হয়নি, এ কথাটা সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানিয়েছিল, এটুকু মনে আছে।

রায় অনেকক্ষণ নিজের কথা বলে ফেলেছেন তাই বোধ হয় লজ্জা পান। বলেন, "আপনাকে বোধ হয় নিজের কথা বলে বিরক্ত করছি।"

চৌধুরী একটা লাল-নীল পেন্সিল দিয়ে নোট বই-এ অন্যমনস্কভাবে দাগ কাটছিলেন, বলেন, "না, না, বলুন না—তাতে কি।" তারপর চুপ করে থেকে, খানিকক্ষণ পর একটু ধীরে গলায় মাথা নীচু বলেন, "তবে কি জানেন, আমি সত্যি করে বলছি, আমাকে ভুল বুঝবেন না—আপনাদের ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। যে লাইনেই আপনি যান—কতকগুলো বাধা বিপত্তি তো থাকবেই, আগেও তো ছিল।"

এমন সময় আবার নিউজ এডিটার ঘরে ঢুকলেন। একবার টেবিলের দিকে তাকিয়ে তারপর জানালার ওপর চোখ বুলিয়ে নিজের মনেই বললেন, "ও সেনকে কোনও সময়েই পাওয়া যাবে না, সব সময়েই বিজি।" নিউজ এডিটার চলে যাবার পর, একবার আড়চোখে সেদিকে তাকিয়ে যেন খুব একটা গোপনীয় কথা বলছেন এমনি ভাবে গলা নামিয়ে রায় বললেন, "মিঃ চৌধুরী, আপনি আমায় মাপ করবেন, কিন্তু একটা কথা আপনাকে না বলে পারছি না, আপনার বিরুদ্ধে একটা মস্ত বড় কনস্-পিরেসি চলছে।"

"কনস্—পিরেসি !" এমনভাবে ভাঙলেন কথাটা চৌধুরী যে মনে হল তিনি ঠাট্টা করছেন।

"না, না, আপনি ঠাট্টা করবেন না। বুঝছেন না কেন সেনকে ডেপুটি চিফ করে এনেছে।"

চৌধুরীর মুখেচোখে এবার একটা দৃঢ়ভাব ফুটে উঠল। বললেন, "আপনি জানেন, আমি এ ধরনের পার্সোনাল কথাবার্তা ভালবাসি না।"

সন্ধ্যে হতেই আলো জ্বলল। একটা মস্ত বড় বিলিয়ার্ড খেলার মত টেবিল। ওপরে ঢাকনি দেওয়া ফ্লুয়োরেসেন্টের আলোয় বড় ঘরখানা বেশ মনোরম দেখাচ্ছিল। অন্যান্য দেশী খবরের কাগজের টাকা থাকলেও রুচির যে বিরাট অভাবে একই ঘরে

প্রুফ-রিডার তারস্বরে চিৎকার করছে—তার পাশেই একখানা ছোট সেক্রেটারিয়েট টেবিলে হুমড়ি খেয়ে সাব-এডিটাররা কপি এডিট করছে, আর রিপোর্টাররা টাইপ-রাইটার টানতে টানতে একবার এ-টেবিল আর ও-টেবিল করছে, এরকম অব্যবস্থা এ আপিসে নেই। টেবিল ঘিরে যে নজন রিপোর্টার বসেছে—তাদের ভেতর তিন জন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বাদ দিয়ে আর সবাই বাঙালী।

সেন এই মাসখানেকের ভেতরই চৌধুরীর অবর্তমানে সকলের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছেন। ঢেঙা, রোগাপানা, পরনে হাতকাটা নীল শার্ট, চোখে চশমা, ডেভিড নামে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যে তরুণটি টেবিলের কোনায় বসেছিল, সে সেনকে বলছিল, "ও মিস্টার সেন, মাই সার্ভেণ্ট ইজ ট্রাবলিং মি এ লট্।" তারপর কথায় কথায় সেন ডেভিডের ছোট বোনের প্রসঙ্গে বলেন, "শি ইজ সুইট রিয়্যালি।"

"গুড ইভনিং জেণ্টলমেন···"

দীর্ঘ ক্ষীণাঙ্গ খুব ফ্যাকফেকে ফর্সা, বয়স প্রায় পঁয়ষট্টির কাছাকাছি হবে, কিন্তু এখনও ঘাড় উঁচু করে ইস্কুলের ছেলেদের মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলেন, যে ভদ্রলোকটি এবার ঘরে এসে ঢুকলেন, তাঁকে বলা যেতে পারে, ভারতীয় ইতিহাসের কয়েকটি লাইন। কথিত আছে, মধুদা ক্ষুদিরামের সহকর্মী ছিলেন। অত্যন্ত নাবালক থাকায় সামান্য শাস্তিতে ছাড়া পেয়ে গত পঁচিশ বছর ধরে চৌধুরীর মতই রোজ সকালে সাহেবদের আপিসে 'গুড-মর্ণিং' করে আসছেন।

মধুবাবু অন্যদের মত টাই পরেন না। পাতলা সাদা সুতির কোটটা চেয়ারের গায়ে ঝুলিয়ে দিয়ে গলার বোতাম আলগা করে যেই ফ্যানের নীচে আরাম করে বসেছেন, অমনি মিস্টার সেন, ডেভিডকে ছেড়ে মধুবাবুকে নিয়ে পড়লেন, "কি মশাই, আপনার তো সব ছেলেগুলোরই হিল্লে হয়ে গেল, থার্ডটাকে কি শেষ পর্যন্ত আর্মিতেই দিলেন।"

"দেব না! আর্মি, নেভি এ সবই তো লাইন আজকাল। যতসব মডার্ন ইয়ংম্যান হয়েছেন, বড় বড় বাত করবেন, আর শেষ পর্যন্ত হবেন মাছি-মারা কেরানী। শুধু বি-এ এম-এ পাশ করলাম—ওসব দিন আর নেই।"

বেশ কথাবার্তা চলছিল। মাঝখান থেকে রায়ই ফ্যাসাদ বাধালেন। টেবিলের এক কোনায় রাখা কার্ডখানা তুলে, রায় সত্যগোপালকে প্রশ্ন করেন, "আমরা কি এটা কাভার করব?"

প্রায় ছোঁ মেরে কার্ডটা তুলে নিলেন মিঃ সেন, কার্ডের ওপর চোখ বুলিয়ে বিরক্তভাবে বললেন, "নো নো,"! তারপর মধুবাবুকে সম্বোধন করে বললেন, "জানেন মধুবাবু,

এই লোকটা কে? একটা লোক একেবারে চোখের সামনে আঙুল ফুলে কলাগাছ হল। ছিল একটা পুরনো নড়বড়ে বাড়িতে, আর যুদ্ধ লাগার পরই যত রাজ্যের সাহেবগুলো এসে লোকটার ছবি কিনে একেবারে লাল করে দিল ব্যাটাকে।"

এতক্ষণ পর ডেভিড কথা বলার সুযোগ পায়। কালচার সম্বন্ধে তারও যে উৎসাহ একেবারে নেই, তা নয়। আপিসের বেয়ারার কাছ থেকে নিয়মিত "রীডার্স ডাইজেস্ট" রাখে আর ক্রসওয়ার্ড পাজলে শেক্‌স্‌পীয়ারের কোনও অসম্পূর্ণ লাইন থাকলে, তাকে সম্পূর্ণ করতে সেও শেক্‌স্‌পীয়ারের কয়েকখানা বইতে চোখ বুলিয়েছে। বেশ মুরুব্বীর মত মুচকি হেসে বলে, "ইউ নো, হাউ হি কেম টু ফেম!" তারপর এক লাটসাহেবের মাথা-পাগলা পার্শ্ব-সহচর কিভাবে তার এক সঙ্গিনীর খেয়াল সামলাবার জন্যে লোকটার ছবি কিনে সাহেবদের জগতে একটা আলোড়ন আনে, তা শোনাতে থাকে হেসে হেসে।

"আরে তা তো হবেই"—মধুবাবু কথাটার উত্তরে জবাব দেন। বলেন, "ও লোক-টাই তো ওঠালে এ ব্যাটাকে, নইলে যা আর্ট আমার, মরি মরি! আমার ভাই-পোটা যে ক্লাস থ্রিতে পড়ে, সে পর্যন্ত ওর চাইতে ভালো আর্টিস্ট।"

মোটা মত, চোখে চশমা-পরা, প্রচুর ছোটাছুটি করতে হয় বলে সবসময়েই ঘেমে হাঁসফাঁস করছেন, মাঝবয়সী অনিলবাবু টেবিলের কোণ থেকে জবাব দেন, "হ্যাঁ মধুবাবু, যা দিনকাল, একটা মানুষের মাথা এঁকে তারপর গোরুর চোখ বসিয়ে দিলেই আর্ট। আর্টিস্ট হলেও মন্দ হত না।"

চৌধুরী চুপ করে থাকেন। ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু খারাপ লাগছিল তাঁর। মনে হচ্ছিল, এ ঘরে তাঁর যেন আর থাকার কোনও দরকার নেই। তিনি যেন ফালতু। আর্টিস্টের প্রসঙ্গে তিনি আরও বিরক্তবোধ করেন। বড় পুলিস অফিসার, বড় কংগ্রেসী নেতা, বিলিতি টেনিস প্লেয়ার, কিংবা ক্যালকাটা পোর্টের রেলওয়ের অথবা চা-বাগানের কোনও বড় সাহেব—এই ধরনের লোক ছাড়া দেশের কারো সম্বন্ধেই এ আপিসের লোকেরা শ্রদ্ধাশীল নয়, একথাটা নতুন করে তাঁকে খোঁচা মারে। আরও খারাপ লাগে, সবচেয়ে শ্রদ্ধাহীন মধুদার কথা, যাঁর নাকি স্বপ্নের মত এক অতীত ছিল।

এমন সময় নিউজ এডিটার চ্যাটারটন আবার ঢুকলেন। এসেই সেনকে পার্ক স্ট্রীটের ঘটনাটা জিজ্ঞেস করেন।

সেন কিছু বলার আগেই চৌধুরী জবাব দিলেন, "ওটা কিছু না। ওটা মামুলী বদমাইসের ব্যাপার। রায় দেখে এসেছে।"

সাহেব অসন্তুষ্ট হয়েছেন বোঝা গেল। একবার সেনের দিকে আর একবার চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে টেবিলের উপর একটা ছোট্ট চড় মেরে বললেন, তাঁদের এডিটার ব্যাপারটাতে ইনটারেস্টেড।

"আমি জানি," অসম্ভব ধীর গলায় চৌধুরী জবাব দিলেন।

সাহেব কিন্তু ঘুরে তাঁর এডিটারের দোহাই পাড়লেন। প্রকারান্তরে জানালেন, স্বয়ং এডিটার যখন বলেছেন তখন কিছু না কিছু একটা লিখতেই হবে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন চৌধুরী। তাঁর মিহি কোমল গলা চড়া পর্দায় বেশ সুন্দর শোনায়, "মিঃ চ্যাটারটন, আমি এ আপিসে কতদিন আছি জানেন? ঠিক ছাব্বিশ বছর। আমি জানি, এ কাগজ ঠিক কোন্ অক্ষরটা চায়!"

সাহেব অবাক হন। দুর্বিনীত হবার মধ্যেও যে সৌন্দর্য আছে, তাতে যেন তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন বলে মনে হল। ব্যাপারটাকে হালকা করার জন্যেই হেসে বললেন, "তিনি একটা সাজেশান দিচ্ছেন মাত্র," তারপর একটু যেন ঠাট্টা করে বলেন "নিউজ সম্বন্ধে তাঁরও তো কিছু জ্ঞান আছে।"

"ইউ আর এ স্ট্রেঞ্জার মিস্টার চ্যাটারটন!" চৌধুরী চেঁচিয়ে ওঠেন, তারপর বলেন, তিনি মাত্র এক বছর এদেশের মাটিতে পা দিয়েছেন। এদেশের খবর সম্বন্ধে তিনি রায় দেবেন কি করে! চ্যাটারটন এবার অপ্রস্তুত, এতখানি তিনি আশা করেননি। যাওয়ার আগে মুখে হাসি টেনে বলে গেলেন, "চৌধুরী তোমার শরীর ভালো আছে তো? এত তাড়াতাড়ি চটে যাবে, আমি তা ভাবতেই পারিনি!"

সেনও অনেকখানি বিচলিত বোধ করছিলেন। বিশেষ করে সেদিনই চ্যাটারটন তাঁকে অনেক কথা বলেছিলেন ঘরোয়াভাবে। দেশের নতুন পরিস্থিতিতে কী ভাবে পলিসি ঢালতে হবে, ডিপার্টমেণ্টদের হেডদের কিভাবে ও কেন আরও ম্যানেজ-মেণ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে হবে, এমনি অনেক কথা। কিন্তু চৌধুরীর ভারী গম্ভীর মুখ দেখে কিছু বলতে সাহস করলেন না।

বাইরে আকাশ মেঘলা হয়ে আছে। তেতলার ঘরখানায় খুব হাওয়া দিচ্ছিল। নীচে যখন এসে নামলেন চৌধুরী, তখন বাইরে ধুলোর ঝড় উঠেছে। শুকনো পাতা আর কাগজ এলোমেলো উড়ছে বড় রাস্তায়। সেই ধুলোতেই দেখলেন, অনিল দৌড়চ্ছে। চৌধুরী ডাকেন, "কোথায় যাচ্ছ এই ধুলোর মধ্যে?"

"শার্ক, গঙ্গায় হাঙ্গর এসেছে!"

"ও তো আমরা অনেকবারই করেছি। ঝড়টা একটু দেখেই যাও না! সবটায় তোমার এত তাড়াহুড়ো কেন বল তো! একদিন যে রাস্তায় পড়ে মরবে।"

অনিলবাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। স্টীল ফ্রেমের চশমার ভেতর থেকে তাঁর বড় মোষের মত একজোড়া চোখ মেলে চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ কষ্টে তাঁর মুখখানা বিকৃত হয়ে গেল।

কেতাদুরস্ত, টাইপরা, সাহেবী অপিসে চাকরি করেন বলে পান-সুপুরি খান না, মোটা হয়ে যাচ্ছেন বলে ভোরে উঠে বাজার যাবার আগে দড়ি নিয়ে লাফান, আর সব সময় মন খারাপ করেন, রায়ের মত ইংরেজি তাঁর কলম থেকে বেরোয় না বলে—এই ধরনের মাঝবয়সী অনিলবাবুকে এখন দেখে মনে হয়, ইস্কুলের একটা ছোট ছেলে। ধুলো ঝাড়বার জন্যে মাটিতে কয়েকবার জুতো ঝাঁকিয়ে মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে তিনি বললেন, "আই হ্যাভ টুয়েলভ্ মাউথস্ টু ফীড!" একটা দীর্ঘনিশ্বাসের মত শোনাল কথাটা।

"আপনার বাবা তো বেঁচে আছেন!"

"আমার বাবা? তাঁদের কথা আলাদা। তাঁরা ছিলেন অন্য জাতের মানুষ। তিনিও কাজ করতেন খবরের কাগজে। তবে আমাদের মত কুলি ছিলেন না, বুঝলেন মিস্টার চৌধুরী। আমার বাবার মত লোক পৃথিবীতে দু-চারটে হয়। তাঁদের জাতই ছিল আলাদা।"

অনিলবাবু যেভাবে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবে ট্রামের দিকে দৌড় দিলেন।

ঝড় থামল কয়েক মিনিট পরে। গাড়িতে উঠেই চৌধুরীর মনে পড়ল, কয়েক দিন আগে মধুবাবুর কথা। মধুবাবু চিনতেন অনিলের বাবাকে। এলাহাবাদের এক কাগজের আপিসে তিনি ছেলের মতই খবর সংগ্রহ করতেন। তারপর অকস্মাৎ একদিন সানস্ট্রোক হয়ে মারা যান।

সাতাশ

ফিরে এসেও সন্ধ্যেবেলা চৌধুরীর মাথা-ধরা গেল না।

অন্ধকার ঘরে, কম পাওয়ারের টেবিল ল্যাম্পের আলোয় একটা বেতের চেয়ারে বসেছিলেন চৌধুরী। বারান্দা পার হয়েই রান্নাঘরের সামনে জ্যোৎস্নাদি চিৎকার করে বকছিলেন গুজারামকে তার অসময়ে আফিম খেয়ে ঝিমোবার জন্যে। চৌধুরী একবার বাধা দিলেন, আজকে তাঁর গণ্ডগোল সহ্য হচ্ছিল না। জ্যোৎস্নাদি চুপ করলেন, কিন্তু ফিরে এসে প্রায় দশ মিনিট ধরে এমনভাবে অনুযোগ করতে লাগলেন, স্বামীর অতিরিক্ত ভালমানুষির জন্যে যে, চৌধুরী তর্ক করে বোঝাতে গিয়ে বিফল হলেন। তারপর বেশ কর্কশ গলায় স্ত্রীকে বললেন, "যাও চিৎকার করো। আমার কোনও আপত্তি নেই, যত ইচ্ছে চিৎকার করো।" জ্যোৎস্নাদি লক্ষ্মী প্রতিমার মত ধীরে ধীরে পা ফেলে চৌকাঠ পার হয়ে গেলেন।

একটা প্রশ্ন বার বার চৌধুরী করছিলেন নিজের মনকে—তিনি কি বুড়ো হয়ে গেছেন! লোকের কথায় এখনও তো কলমের জোর অক্ষুণ্ন শোনা যায়। এডিটারের নিজের হাতে লেখা টাইপ-না-করা কত অসংখ্য অভিনন্দন তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। তাহলে দিল্লী আপিস থেকে সেনকে আনার কি মানে হল!

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে উঠে, চেয়ার ঠেলে, একেবারে আয়না-টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন চৌধুরী। এক নজরেই চোখে পড়ে বিরাট চওড়া কপাল, একঝাড় কাঁচা পাকা চুলের নীচেই তরুণদের মত উজ্জ্বল চোখ। খালি নাকের পাশ দিয়ে এক-জোড়া দাগ নেমেছে চিবুক পর্যন্ত। ঘাড় কাত করে আয়নায় নিজের চেহারা দেখছিলেন চৌধুরী। এমন সময় দরজায় পায়ের আওয়াজে চমকিয়ে উঠলেন।

হাসির চিঠি দাদা"—নিত্য এসে চিঠিটা টেবিলে রাখল।

হাসির চিঠি :

দাদা,

তোমায় চিঠি লেখা আমার একটা রোগে দাঁড়িয়েছে। কিভাবে সারাব তাই ভাবছি। আমার জন্যে তোমার ভাবনার কোনও কারণ নেই। খুব বেড়ালাম ক-দিন; হুড্রু আর জোনা ফল্স্। ডালটনগঞ্জেও গিয়েছিলাম এখান থেকে সোজা গাড়িতে। চমৎকার ডাকবাংলো। পাশেই নদী বয়ে যাচ্ছে তর তর করে, বেশ ছবির মত। আর নামও তেমনি—কোয়েল। একহাঁটু জল ভেঙে পারাপার হচ্ছে মানুষ।

এক রাত্তির ছিলাম।

একমাসে অনেক কিছু শিখেছি দাদা। আগে ভাবতাম এখনকার ডিগ্রি পাওয়া বৌরা কি ভাবে ঝগড়া করে চাকর-বাকরদের সঙ্গে দিনরাত, যে মহিলাটি দু-বছর আগে সন্ধ্যে-সকাল বার্নাড শ পড়ত মন দিয়ে, সে বাজারের চুরি ধরবার জন্যে কি করে সারা সকালটা নষ্ট করে, এখন কিন্তু সে ব্যাপারগুলো শিখে ফেলেছি।

একটা কথা মনে হচ্ছে—বলতে ঠিক সাহস হয় না। সুবোধের সঙ্গে যতই মিশছি, ততই মনে হচ্ছে সুবোধ আর তুমি একেবারে আলাদা। কি নিয়ে তোমরা এতদিন আড্ডা দিতে, ভাবতে অবাক লাগে।

সুবোধ একটা হার দিয়েছে আমার জন্মদিনে। প্রায় আড়াই ভরি সোনার। একটা তাসের আড্ডায় বড্ড জমে গিয়েছে আজকাল। আপিস থেকে সোজা সেখানে যায়। রাত হয় ফিরতে। ঠিক বুঝি না মাঝে মাঝে।

বাজে কথা লিখলাম। কেমন আছ? ছোড়দা কেমন আছে? বৌদি, নানীর খবর কি? ভালবাসা নিও। —হাসি

চিঠি পড়ার পর বেশ কঠিন দেখাল চৌধুরীর মুখ। নিত্যর দিকে একবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "কী চাস তোরা বলতো? তোরা যারা মডার্ন ইয়ং ম্যান, তোদের আমি একদম বুঝি না। আজকে আপিসেও রায় বলে যে ছোকরা কাজ করে, সে বলছিল তার দুঃখের কথা। তোরা কি চাস বলতো?"

নিত্য শান্ত গলায় বললে, "সুবোধকে যতদূর জানি তাতে মনে হয়, সুবোধ বোধ হয় আই-সি-এস্ হতে চেয়েছিল। তা হলে পারল না। তারপর খেলাধুলো করত। চেহারাও ভালো ছিল। তাই ভাবত পোর্ট কমিশনের ভালো চাকরি পাবে। শেষে এক তেলের কোম্পানীতে কাজ নিয়ে রাঁচী যেতে হল, তাইতে বোধ হয় খানিকটা ফ্রাস্ট্রেশন এসেছে।"

চৌধুরী প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "চমৎকার, হোয়াট এ গ্লোরিয়াস্ এজ! আমরা কিন্তু অনেক ভালো ছিলাম। বলতে পারিস, আমাদের তেমন দেশের সঙ্গে যোগ ছিল না, বড্ড সাহেব-ঘেঁষা ছিলাম, কিন্তু আমাদের লাইফে একটা অ্যাডভেঞ্চার ছিল।"

কথাটা বলেই চৌধুরী দাঁড়িয়ে উঠলেন। তারপর পায়চারি করতে লাগেন ঘরময়। হঠাৎ আয়নার সামনে থমকিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলেন। নিত্য যে বিস্ময়াবিষ্ট অবস্থায় তাঁর পেছনেই বসে আছে, তা তিনি ভুলে যান। নিজের মনেই আয়নার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, "ডু আই রিগ্রেট?" তারপর চুপ

করে থাকলেন। সেই চুপ করে আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকাটা এতখানি উল্লেখযোগ্য মনে হল যে, চৌধুরীর বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই—এটা যেন জোর করে বলার আর কোনও দরকার ছিল না।

এমন সময় চা নিয়ে এলেন জ্যোৎস্নাদি। দু-কাপ চা আর ঘিয়ে ভাজা সাদা ময়দার লুচি রেখে দিয়ে চলে যাবার সময় বোধ হয় আয়নায় তাঁর ছায়া পড়েছিল। জ্যোৎস্নাদি যেদিক দিয়ে চলে গেলেন, সেদিকে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন চৌধুরী। তার পর খুব ধীর গলায় বললেন, এত ধীরে যে, নিত্যও বোধহয় শুনতে পারল না, "সামটাইমস্ আই ফিল, আই হ্যাভ নট ডান্ জাস্টিস্ টু সামওয়ান।"

আরও দু-মাস পরের কথা। কলকাতায় শীত পড়তে শুরু করেছে। চৌধুরীর আপিসে শীত আসে তাড়াতাড়ি, আর যায়ও অনেক দেরীতে। সেদিন সকালে গুজ্জারামকে দিয়ে গরম কাপড নামালেন চৌধুরী। একবার মনে হয়েছিল হাসির কথা। হাসি থাকলে সে নিজেই দেখে শুনে গুছিয়ে দিত।

গাড়িতে আসতে আসতে প্রথম শীতের আমেজে বেশ আরাম লাগছিল। চৌধুরী ভাবছিলেন তাঁর আপিসের কথা। ছাব্বিশ বছরের আপিসের জীবন, আপিস-বাড়ির প্রত্যেকটি ইটই যেন তাঁর কাছে চেনা। ছুটিতেও একবার করে সন্ধ্যের দিকে এসেও আড্ডা দিয়ে যান চৌধুরী এখনও। কেউ বললে বলেন, আপিস তাঁর কাছে স্বাস্থ্যনিবাস।

এ দু-মাসে চৌধুরীর আপিসে বিশেষ করে তাঁদের ঘরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিভাবে যে হল তা বলা যায় না। অন্তত কোনও বড় ঘটনার মধ্যে দিয়ে নয়। তবু সামান্য মামুলী দৈনন্দিন কতগুলো ঘটনা জড়ো করে এখন এমন একটা অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে যে, পরিবর্তনটা নজরে পড়ে। যেমন এডিটার এমন কোনও বিতর্কমূলক সম্পাদকীয় অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান সমস্যার ওপর কিংবা কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে সরকারের কি নীতি হওয়া উচিত এসব বিষয় লেখা, সোজা চাপরাশি দিয়ে মিস্টার সেনের কাছে পাঠিয়ে দেন। আগে এগুলো চৌধুরী দেখতেন।

মাসখানেক আগে একটা কিসের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে শহরের কোনও বিজনেস ফার্মের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে চৌধুরী গররাজী থাকায় মিস্টার সেনই কোর্টে দাঁড়িয়েছিলেন আপিসের তরফ থেকে।

বছরের শেষে সাধারণত ইনক্রিমেণ্টের সময়। এ আপিসে এবার মাস দুয়েক আগেই সে ব্যবস্থাটা হল। দেখা গেল, এক লাফে দেড়শো টাকা ইনক্রিমেণ্ট দেওয়ার ফলে মিঃ সেনের মাইনে চৌধুরীর প্রায় গলায় গলায় এসে দাঁড়িয়েছে।

আর একটা ঘটনা ঘটেছে মাত্র সাত দিন আগে। অলক্ষিতে অত্যন্ত সাধারণভাবেই নিউজ এডিটারের সঙ্গে সেনের কথা হচ্ছিল ঘরের বাইরে। ঘরের ভেতরে ছিলেন চৌধুরী। কি একটা কথা প্রসঙ্গে সেনের মন্তব্য শোনা গেল, "ও ডোণ্ট টেক হিম সিরিয়াসলি। হি ইজ এ পাগলা।" তারপর থেকে চৌধুরীর কথায় ঘরের সকলে নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়াচাওয়ি করতে শুরু করল। সেন প্রকাশ্যেই বললেন, "আপনি কিছু দিন রেস্ট নিন, মিঃ চৌধুরী। বয়স তো হল—এ বয়সে···।" সেন উঠছে আর চৌধুরী ডুবছে, এটা যেন আর্দালির সেলামের মাঝখান দিয়েও প্রকাশ পাচ্ছিল।

গাড়িতে আসতে আসতে চৌধুরী ভাবছিলেন অন্য কথা। অনেক কাল আগের কথা, একশো বছর আগে তৈরী হয়েছিল তাঁদের আপিস। এখনকার মত কংক্রীটের পাঁচতলা বিশাল বাড়ি, ঢুকতেই ঘোরানো কাঁচের দরজা, দুটো ঝকঝকে লিফ্‌ট, নীচে বিজ্ঞাপন বিভাগ তদারক করবার জন্যে বিরাট কাউণ্টারের পাশে মেমসাহেব আর বুড়ো বাবু, ওপরে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এডিটারদের ঘরে কুলিং সিস্টেম, অনবরত টেলিফোন, টেলিপ্রিণ্টার আর রাত্তিরে রোটারির গমগমে আওয়াজ, কম্পোজ রুমে অটোমেটিক লাইনোর পাশে সারি সারি অপারেটার, ভোর না হতেই ডাক এডিশন নিয়ে যাওয়ার জন্যে বিরাট কালো ওয়াগনের সারি, পিওন, পেয়াদা, মেশিনম্যান, দফতরি, বড়বাবু, ছোটবাবু, গাড়িওয়ালা, ডিপার্টমেণ্টের হেড ঘাঁটি সাহেব আর গাড়িহীন অতিমাত্রায় কেতাদুরস্ত দেশী মেজো সাহেব—এককথায় চোদ্দ পনের শো লোক নিয়ে এই বিশাল খবরের কাগজের আপিসের কোনও চিহ্নই ছিল না সেদিন। পার্ক স্ট্রীট দিয়ে আসতে আসতে চৌধুরী ভাবছিলেন, সেই আগেকার আপিসের কথা যার কথা তিনি শুনেছেন, পড়েছেন।

একশো বছর আগে লালরঙের দোতলা বাড়ির গেটের পাশেই খালি একটা সাদা বোর্ডের ওপর আলকাতরা দিয়ে কাগজের নাম লেখা ছিল। একমাত্র সামনের বাগানটাই ছিল দেখবার মত। হলদে পাঁচিলের গা দিয়ে ক্যানার ঝাড়। বাড়ির ঠিক পেছনেমস্ত উঁচু রেনট্রি বড় বড় ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আর তার গোড়ায় থোকা থোকা ফুলেভরা বিলিতি লতা। সুরকির রাস্তা, ঠিক যেখানে আরম্ভ হবে, তার কোণেই আস্তাবল, সহিসের দল আট-দশটা ঘোড়াকে দলাই মলাই করছে।

চৌধুরী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। আর যতই ভাবছিলেন তাঁর আপিসের কথা ততই তাঁর মুখচোখ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

অবশ্য সাহেবদের ব্যবহারে গলদ যে ছিল না তা নয়। চৌধুরীর মনে পড়ল অনেক

কাল আগের একটা গল্প, বোধ হয় গল্পই। কাশিমবাজার না কোথাকার মহারাজ একবার আপিসে এসেছিলেন তাঁর মেয়ের বিয়েতে, তাঁদের এডিটারকে নেমন্তন্ন করতে। পেয়াদা একটু তাড়াতাড়ি করে সাহেবকে খবর দিতে গিয়ে দেখল, সাহেব ব্যস্ত। ঠিক সে সময় বাংলা দেশে নীল চাষীদের ভীষণ উপদ্রব। সাহেবদের সঙ্গে রক্তারক্তি হয়েছে অনেক জায়গায়। একজন দুঁদে পুলিস অফিসারকে উপদ্রুত অঞ্চলে পাঠাবার জন্যে সাহেব সম্পাদকীয় লিখছিলেন। এমন সময় পেয়াদা এসে বললে, "এ জেণ্টল্‌ম্যান স্যার।"

"ভিটরমে লাও"—বেশ মোটা রাশভারী গলায় চোখ না তুলেই সাহেব বলেছিলেন। তারপর মহারাজকে সামনে রেখে পেয়াদা যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। হিন্দী না বলে সোজা ইংরেজিতেই পেয়াদাকে বললেন, "ইউ টোল্ড মি, এ জেণ্টলম্যান ইজ ওয়েটিং, বাট হি ইজ এ বাবু!"

কিন্তু গল্পটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরীর মনে পড়ল, তাঁদের আপিসের রামবাবুর কথা। রামবাবু তাঁদের প্রি টার,—মোটাসোটা চেহারা, তবে বয়সের ভারে জরদ্গব হয়ে গেছেন। পেটে দেশী পড়লেই, চিৎকার করেন, ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে, "এ আপিসে ঢুকেছি, পঁচিশ টাকায়, এখন কত পাই জানেন স্যার, পাঁচশো। এ খালি সাহেব আপিস বলে।"

গাড়ি ব্রেক কষতে চৌধুরীর চটকা ভেঙে গেল। হঠাৎ মনে পড়ল, সেদিন অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র দপ্তরের এক উপমন্ত্রী লণ্ডন যাবার পথে দমদম এয়ারপোর্টে নামবেন। গাড়ি দাঁড় করিয়ে চৌধুরী দৌড়ে লিফটে উঠলেন।

প্রায় মিনিট পনেরো ওপরে ছিলেন। আগেকার অভ্যাসের মত দু-তিন সিঁড়ি এক-লাফে ডিঙিয়ে নীচে নেমে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। গাড়ি? তারপর দেখলেন খানিকদূর এগিয়েই, গাড়ি দাঁড় করানো আছে, গেটের কাছে। কয়েক পা এগিয়েই তিনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। আর এক ডিপার্টমেণ্টের এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছোকরা হাত তুলে কি একটা ইশারা করলে, ড্রাইভার কি বললে বোঝা গেল না দূর থেকে। ছোকরাটি আবার এগিয়ে যাওয়ায় ড্রাইভার এবার উঠে দাঁড়াল। গাড়ি বেরিয়ে গেল চৌধুরীর নাকের ওপর দিয়ে।

অপমানে আর রাগে চৌধুরীর চেহারা বদলে গিয়েছিল। একটা চলন্ত ট্যাক্সিতে প্রায় লাফিয়ে ওঠে গেলেন, দমদমে। ফিরে এলেন যখন, তখন তিনি অন্যমানুষ। যাঁরা উপমা ভালবাসেন, তাঁরা বলতে পারেন- চৌধুরীকে সেদিন লাগছিল অস্তাচলে রাঙানো সূর্যের মত। একবার লাল আবীর ছড়িয়ে ডুববার আগে যে

জমজমাট ভাব, তাই ছিল তার চলনে-বলনে। সেনও সে মুখ দেখে বলেছিলেন, "আজকে পাগলটা একটা গণ্ডগোল বাধাবেই।"

চৌধুরী সেদিন সুযোগ খুঁজছিলেন কথা বলার। এ ক-মাসে যে একটা অস্বস্তিকর গুমোট ভাব জমেছিল তাঁর মনে, একটা ঝড়ের মত তা উড়িয়ে দেবার জন্যে তিনি যেন ছল খুঁজছিলেন। আর সে সুযোগও এসে গেল।

জ্ঞানী লোকেরা বোধহয় কথা কম বলেন এ জন্যে, কারণ কথায় কথা বাড়ে এবং অনেক সময় এই কথার আবর্তের মধ্যে মানুষ যে আসলে কি বলতে চায় সে কথাটাই খুঁজে পাওয়া যায় না।

সেদিন এডিটোরিয়াল কনফারেন্স শেষ হবার পর যখন আপিসের ডিপার্টমেণ্টের চিফরা (এখনও এ বিষয়ে চৌধুরীই চিফ) বেরিয়ে আসছিলেন, তখন খুব আস্তে আস্তে যেন এ ব্যাপারে তাঁর নেহাত্ কোনও আগ্রহই নেই, এই ভাবে চৌধুরী বললেন, "মিঃ চ্যাটারটন, কী মুশকিলেই আজ পড়তে হয়েছিল ! দমদমে গিয়ে দেখি, আর সব কাগজের লোক এসে গেছে।"

"কেন, আমাদের গাড়ি ?"

"ওঃ, সে আর বলো না। সেদিনকার ছোঁড়াটা, টমাস না কি নাম, নাকের ওপর দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমায় যেতে হল ট্যাক্সিতে।"

"তুমি বারণ করলে না কেন ?"

চৌধুরী এবার আড়চোখে তাকালেন সাহেবের দিকে, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "আই থট, হি ওয়াজ্ ইয়োর ক্রিচার্।"

"মানে, তুমি কী বলতে চাও চৌধুরী, তোমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে ?"

"আমার মাথা বেশ পরিষ্কার আছে। সেই জন্যেই জিজ্ঞেস করছি, আমার ছাব্বিশ বছর চাকরির পরেও এটা কি আমায় বিশ্বাস করতে হবে যে, এ আপিসে দুটো সেট অফ রুল্স্ আছে। একটা ইণ্ডিয়ানদের জন্যে, আর একটা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের জন্যে !"

চৌধুরীর গলা অনেকখানি চড়ে গিয়েছিল। ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। যে কথাটা দিয়ে কথার সূত্রপাত হয়েছিল, তা তিনি কিছুক্ষণ পরেই হারিয়ে ফেললেন এবং কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল চৌধুরী প্রায় উন্মত্তের মত চিৎকার করছেন, "আমায় কি এটা বিশ্বাস করতে হবে, মিঃ চ্যাটারটন, এই সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বছর পর আমায় কি আবিষ্কার করতে হবে যে, এই আপিসে দুটো সেট অফ রুল্স্ আছে ? আমি তা কল্পনা করতে পারি না ! তা কল্পনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব !"

চ্যাটারটনও ঝতে পারছিলেন এখন যুক্তি দিয়ে কিছু হবে না। এরকম অসম্ভব

উত্তেজনা এ মুহূর্তেই কি ভাবে থামানো যায়, তা বুঝতে না পেরে প্রায় মিনতি করতে লাগলেন তিনি নীচু গলায়, "ফর হেভেনস সেক, প্লিজ স্টপ মিস্টার চৌধুরী !"

অন্যান্য কাগজের আপিসে এ ধরনের চিৎকার অভাবিত কোনও ব্যাপার নয়। হৈ-হল্লা, লেকচার, খিস্তি-খেউড়, শার্ট-পাঞ্জাবী নিয়ে টানাটানি, মাসের শেষে কারো পকেটে হাত ভরে দেওয়া—এই বিরাট মাছের বাজারে কোনও একটা লোকের চিৎকার শুনে কেউ মাথাও তুললো না। কিন্তু এ আপিস সত্যিই আপিস ! এক টুকরো কাগজের কুচি নেই কোথাও। ডিস্টেম্পার করা দেওয়ালের ঠিক নীচে টুলের ওপর বসে প্রায় সাত হাত অন্তর বেয়ারা। টেলিপ্রিন্টার আর টাইপরাইটারের শব্দ ছাড়া চারিদিক নিস্তব্ধ।

চৌধুরীর পরিচিত চড়া গলায় করিডোরে ভিড় জমে গেল। বেয়ারা থেকে চিফ সাব-এডিটার পর্যন্ত দাঁড়িয়ে পড়ে মজা দেখতে লাগে। চৌধুরীর খেয়াল হল অনেকক্ষণ পর, মধুদা এসে যখন পেছন থেকে তাঁর হাত ধরলেন। এতক্ষণ পর তিনি তাঁর চারপাশের লোকজনকে দেখতে পেলেন।

একবার মাথায় হাত দিয়ে মৃদুস্বরে চৌধুরী বললেন, "ও আই অ্যাম নট ওয়েল।" তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন ভিড়ের মাঝখান দিয়ে।

এ ঘটনার পর থেকেই কেমন চুপ মেরে যান চৌধুরী। আপিসে প্রায় কথা বলতেন না, আর কেমন একটা উদাস ভাব তাঁর মুখে চোখে সব সময়ে লেগে থাকত। চিফের কাজ বেশ সুষ্ঠুভাবেই করতে শুরু করেছেন মিস্টার সেন।

একটা নতুন দিকে খালি চৌধুরীর উৎসাহ দেখা গেল। তাঁদের বাড়ির সরু লম্বা ব্যালকনিটা ধরে সারি সারি টবে ফুলগাছ লাগালেন সে বছর। নিজের হাতে বুরুশ দিয়ে লাল রঙ লাগালেন টবে। সেবার শীতের আঁশ আরও জোরে পড়তে একদিন ভোর বেলায় নিত্যকে প্রায় জোর করে ওঠালেন খাট থেকে। ছোট্ট চারায় মস্ত বড় সোনালী রঙের ডালিয়া ফুটেছে।

টবের কাঠিটা সোজা করে তাঁর পুরনো উজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়ে বললেন, "সামনের বছর ক্রিসেন্থিমাম লাগাব।"

নিত্য অন্যমনস্কভাবে বললে, "আমায় কিছু দিনের জন্যে বাইরে যেতে হবে দাদা।"

সত্যগোপালের ভ্রূক্ষেপ নেই।

একদৃষ্টিতে ফুলটি লক্ষ করে বললেন, "কী রঙ !"

আটাশ

সাধারণত তারা জমায়েত হয় রাত্তির লাগতে না লাগতেই।

সন্ধ্যের খিদিরপুর। হাইড রোড,—ব্রেথওয়েট, লিপটন, অন্যান্য কারখানার রাস্তা। রাস্তার আগে বটগাছের নীচেই যে টিনের চালওয়ালা দোতলা বাড়ি তার সমস্ত মাথাটা ছেয়ে কাঁচি সিগারেটের মস্ত বিজ্ঞাপন। আর তারই দোতলার একখানি ঘরে ইউনিয়ন আপিস।

আপিস মানে একটা চেয়ার আর টেবিল। তবে মাদুরেই বেশী মিটিং হয়।

নিত্যর সঙ্গে আলাপ হল যাদের সাথে, তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ মজুর, নাম রমজান। মাস্টার মশাই আলাপ করিয়ে দিলেন রমজানকে তাদের ইউনিয়নের সেক্রেটারি বলে। নিত্য দেখল, সুনীল সেনও এসেছে এই ইউনিয়নে।

প্রথম সাত দিন আট দিন টুকটাক কাজ, কিছুই না বলতে গেলে। এই একটু মেলামেশা করা, খবরাখবর নেওয়া, চাঁদা তোলা এমনি কাজের ভেতর মাস খানেকের ওপর কেটে যায়।

নিত্য ঘুরে ঘুরে এ অঞ্চলটা দেখল। যুদ্ধের সময় তৈরি করা ইঁটের গোল সারি সারি আশ্রয়স্থল, এখন পোর্টের বস্তি। আর হাইড রোডের যেন জাত নেই, সমাজ নেই। রোজ সকালে ট্রেন এসে লাগতেই হুড়হুড় করে নেমে আসে মানুষ। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশের সমস্ত জাতের মানুষের পায়ের শব্দে, চিৎকারে সরগরম হয়ে থাকে হাইড রোডের সকাল-বিকেল।

ঘুরে ঘুরে দেখা অবশ্য দিন কয়েকের মধ্যেই কেটে গেল। বেশ একটু দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। লোকের সঙ্গে লোকের মেলামেশা, ইউনিয়ন আপিসে সন্ধ্যেবেলায় ভিড় করে আলাপ জমানো, ভোরে উঠে গে -মিটিং করা, আরও ছোটখাট কাজ, যার ভেতর দিয়ে নিত্য ক্রমশ উৎসাহ পাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলা মাস্টার মশাই মুখ গম্ভীর করে এলেন।

"বৌদির সাথে নিশ্চয়ই ঝগড়া হয়েছে," সুনীল বললে হালকাভাবে। মাস্টার মশাই-এর চিন্তাগ্রস্ত মুখে কিন্তু কোনও ভাবান্তর হল না।

এবার বাঁকা তোবড়ানো গালের নীচে তার ছুঁচলো থুতনিতে হাত ঘষতে ঘষতে রমজান বললে, "কুছ গড়বড় হুয়া মাস্টারজী ?"

মাস্টার মশাই মুখ তুললেন। একটা দ্বন্দ্বের ছায়া খেলে গেল তাঁর মুখে। কি ভেবে

সকলের অগোচরে এক মুখ হেসে ছায়া সরিয়ে ফেললেন। আজেবাজে আলাপ করলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বললেন, "কেয়া রমজান সাব, হালচাল কেইসা মালুম হোতা ?"

রমজান রাজমিস্ত্রী ছিল। নিত্য শুনেছে, কলকাতার কত বড় বড় ইমারত তার হাত দিয়ে তৈরি হয়েছে, সেই গল্প। খুব জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু কয়েক বছর ধরে পয়সার টানাটানি, ক্রমাগত পুলিসের অত্যাচার আর বিশ্রী হাঁপানি ধরার ফলে এখনকার আর পুরনো রমজানের ভেতর কিছুটা ফারাক হয়ে গিয়েছে।

মাস্টার মশাই-এর কথায় রমজান চুপ করে থাকে। তারপর চোখ দুটোকে সরু করে হাতের তালুর ওপর চেয়ে থাকল। হঠাৎ একবার মাস্টার মশাই-এর দিকে তাকিয়ে বলে বসলে, "স্ট্রাইক হোবে না মাস্টার মশাই।"

"কেন ?"

রমজান মাথা নাড়ল—"আভি নেহি হোগা।"

মাস্টার মশাই বোঝালেন। শ্রমিকেরা এগিয়ে যেতে চাইছে, এ অবস্থায় যদি পিছু টানি, তবে মুখ দেখাব কাল কার কাছে! অনেক কোম্পানীতে স্ট্রাইক-ব্যালট নিচ্ছে শ্রমিকেরা। এদের সব এক করে যদি একটা সাধারণ ধর্মঘটের দিকে না নিয়ে যাওয়া যায়, তবে শ্রমিকদের নেতা হলাম কিসে!

রমজানের যুক্তি নেই, তর্ক নেই, সেই সোজা জবাব, "আভি নেহি হোগা মাস্টার মশাই।"

আপাদমস্তক একটা র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে মাস্টার মশাই বসেছিলেন। হঠাৎ সুনীলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী বলুন না, আপনাদের কি মত ?"

সুনীল বললে, "আমারও মনে হচ্ছে, প্রত্যেকটা লোক স্ট্রাইক চাইবে, আর তখনই খালি আমরা স্ট্রাইক করব, এটা ঠিক নয়। সাধারণ ধর্মঘটের দিকে না যাবার তো কারণ দেখি না আমি।"

আলোচনা চলতে থাকে আরও কয়েক দিন, উত্তেজিতভাবে, শান্তভাবে, নানা কায়দায়। রমজান কিন্তু বারেবারেই মাথা নাড়লে। বারে বারেই সেই এক সোজা জবাব দিলে, কোনও তর্কের ধার দিয়ে না গিয়ে—"আভি নেহি হোগা।"

কিন্তু ক্রমশই মাস্টার মশাই আর সুনীল বেশী করে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। প্রায় হাল ছেড়ে দিল রমজান। তার কোনও তর্কও ছিল না, যুক্তিও ছিল না, কথাটা ভালো করে গুছিয়েও বলতে পারত না। শেষ পর্যন্ত ভোট নেওয়া হল। ভোটে সাব্যস্ত হল, সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তুতি।

সেদিন বেশ হাড়কাঁপানো শীতের মাঝে বৃষ্টি নামল। নিত্য ইউনিয়ন আপিসের বাইরে এসে দেখে, আকাশে মেঘ করেছে, হাওয়া দিচ্ছে। হঠাৎ একটা মস্ত বড় রুপোলি সাপ ঝলমলিয়ে গেল, আকাশের এপ্রান্ত হতে ওপ্রান্ত পর্যন্ত। ঘুমন্ত পোর্টের বস্তি ঝকমক করে উঠল আলোয়। আলো হয়ে উঠল খিদিরপুরের খালের জাহাজের ফানেল, ক্রেন, মাস্তুল। ইউনিয়ন আপিসের সামনে বৃষ্টিতে ভেজা বট গাছটাও নতুন মনে হল হঠাৎ।

সন্ধ্যে সাড়ে সাত কি বড় জোর আট। কিন্তু অন্ধকার যেন গিলে খাচ্ছে। খুব দূরে লাইট-পোস্টের নীচে এক এক খোকা আলো। সে আলোয় নজরে আসে, কয়েক দিনের বৃষ্টিতে ভেজা লাল মাটির রাস্তা, কাদায় পুলিশ-ট্রাকের টায়ারের ভাঁজ। বস্তির সামনেই তারের বেড়া, সান্ত্রী দাঁড়িয়ে।

যে পাঁচজন ছেলে এসেছিল, তারা ইস্তাহারগুলো আলোয়ান বা শার্টের নীচে লুকিয়ে ফেললে। তারপর ঢুকল বস্তির ভেতর দৃঢ় পদক্ষেপে।

কুস্তির আখড়া ঢুকতেই। আবছা অন্ধকারে, তেল আর ঘামে ভেজা কতগুলো চলন্ত শরীর আর মাঝে মাঝে ভারী নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

মাঝখানে খোলা ড্রেন, আর দু-দিক দিয়ে সারি সারি ঘর। চাপ চাপ ধোঁয়া জমে আছে সারা অঞ্চলটার মাথার ওপর। আলো এত কম যে, ড্রেনের পাশেই শান-বাঁধানো ফুটপাথের মত জমিতে যে ছেলেমেয়েগুলো অকাতরে ঘুমোচ্ছিল, তাদের ওপরে আর একটু হলে পা পড়ে যেত আগন্তুকদের।

অন্ধকার খান খান করে স্লোগান উঠল, "ইনক্লাব জিন্দাবাদ!" বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো ধড়ফড় করে জেগে উঠে ভিড় করল চারদিক থেকে।

একটা চারপাই-এর ওপর যারা নীচু গলায় কথা বলছিল, তারা কিন্তু উঠল না। যখন হ্যাণ্ডবিলগুলো তাদের কাছে এনে দেওয়া হল, তখন তাদের কেউ কেউ উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকালে আগন্তুকদের দিকে। একজন হ্যাণ্ডবিলখানা উলটে পালটে আবছা অন্ধকারে কাগজের এপিঠ ওপিঠ আঙুল দিয়ে বোলাতে বোলাতে বললে, "হাম লোগ পড়া-লিখা নেহি বাবু।"

আগন্তুকদের যে লোকটি বিলি করছিল হ্যাণ্ডবিল, সে একটু অপ্রস্তুতে পড়ল। এরকম ব্যাপারের জন্যে সে যেন তৈরি ছিল না মোটেই। বাচ্চারা অবশ্য এক তাড়া হ্যাণ্ড-বিল রেখে দিল নৌকো বানাবার জন্যে। আর চারপাই-এর লোকগুলো যেভাবে বসেছিল, ঠিক সেই ভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করল খানিকক্ষণ পর।

পাশের বস্তি। সেই ধোঁয়া, তেমনি অন্ধকার। মাঝে মাঝে খালি বাঁশের খুঁটিতে

ঝোলানো কেরোসিনের ডিবের লালচে আলো।

এ বস্তিটায় ধর্মঘটের আহ্বান জানাবার পর সামনের দিন মিটিঙে শ্রমিক জমায়েত জোরদার করার জন্যে বক্তৃতা দেওয়া শুরু হয়েছিল, হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা রোগা ঢেঙা লোক এগিয়ে এল, হাতে একটা ময়লা, হলদে, তালপাকানো কাগজ। নিত্যর কাছে এসে বললে, "স্যার, তিন মাস মাইনে আটকে রেখেছে। আপনি যদি বলে কয়ে………"

"স্যার", 'বাবু"—আগন্তুকরা অবাক হল। নিত্য ভেবে এসেছিল, আজকেই আত্মীয়তা না হলেও কিছুটা আলাপ করা যাবে। কিন্তু সারি সারি মানুষগুলোর মুখ-চোখ দেখে হঠাৎ ছ্যাঁত করে উঠল তার বুক। কিছুটা কৌতূহল যে ছিল না সে চোখমুখে তা নয়! কিন্তু এমন ভাবে আচমকা এতগুলো লোক তাদের বস্তির ভেতর ঢুকে পড়ে হঠাৎ তাদের কেন "মিটিঙে" সামিল হতে বলছে, তা বুঝতে না পেরে তারা শুধু লক্ষ করতে লাগল আগন্তুকদের।

এক বস্তি ছাড়িয়ে আর এক বস্তি। আবার বস্তির শুরু। এই অন্তহীন অন্ধকার, ধোঁয়া আর তার অন্তরালে অগণিত আবছা মানুষের নড়াচড়া, মৃদুস্বরে কথা বলা এর যেন শেষ নেই। এক জায়গায় যাঁতা ঘোরার শব্দ আসছিল। অন্ধকারে ঠাওর হয় না। কিন্তু একটা মানুষ ভূতের মত বসে আছে, পা দুটো সামনে জড়ো করে। পাশেই চাকি ঘোরাচ্ছে একটি স্ত্রীলোক, মাথা নীচু করে।

স্ত্রীলোকটির মাথার চুল ধবধবে সাদা, গায়ের রঙ ফর্সা। মুখ তুলতেই চোখে পড়ল, একজোড়া কঠিন চোখের তীব্র দৃষ্টি। দূরের ল্যাম্পপোস্টের আলোয় ঝকমক করে উঠল তার গলার হাঁসুলী।

আগন্তুকরা তাদের দেখেই এগিয়ে গেল। বক্তৃতা চলল কিছুক্ষণ। লোকটি যে ভাবে স্থাণুর মত বসেছিল, সেই ভাবে বসে রইল অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। স্ত্রীলোকটি এক মুহূর্তের জন্যে মাথা তুলল না।

মাস্টার মশাই এবার উবু হয়ে বসলেন তাদের কাছে, মিনতিমাখা গলায় বললেন, "আপনিই তো এখানকার বহুজী, আপনি যদি না এগিয়ে আসেন, তবে বস্তির লোকেরা কার কথাই বা শুনবে ?"

স্ত্রীলোকটি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে শুধু একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। তারপর নিবিষ্ট মনে ক্ষীণ ল্যাম্পপোস্টের আলোয় কী যেন দেখতে লাগল, তার নিজের হাতের আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে।

মাস্টার মশাই কথা বলে চললেন, আর আগন্তুকরা বিহ্বল চোখে দেখতে লাগল এই

কিস্তুতকিমাকার মানুষ আর এই নির্বিকার স্ত্রীলোকটিকে।

এবার মাস্টার মশাই সরে গিয়ে পুরুষ মানুষটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেয়া মিশিরজী, তামাম মজদুর লোগোনে আগে বাড় রহা। এহি ক্রান্তিকা সময়মে আপ কেয়া শোচ রহা ?"

মাস্টার মশাই-এর কথায় লোকটা ঘাড় তুললে। ঠিক একটা জানোয়ারের মত ভঙ্গি। যেন একটা অজানা জায়গায় পা বাড়িয়ে জানোয়ারটা চারদিক দেখছে বিপদের আশঙ্কায়। একবার যেন দপ করে তার চোখদুটো জ্বলে উঠল, ঠোঁট নড়ল। মাস্টার মশাই উঠে এসে মুখের কাছে মুখ লাগিয়ে বললেন, "বোলিয়ে বোলিয়ে মিশিরজী, আপ বোলিয়ে কুছ।" আবার ঘোর নামল মিশিরজীর চোখে। একবার মাস্টার মশাই, আর একবার আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার মাথা নীচু করলে লোকটা।

হঠাৎ অন্ধকার ভেঙে পড়ল। স্ত্রীলোকটি কথা বলছে। একটা তীব্র সারেঙ্গীর ছড় চড়া পর্দায় কেউ যেন টান মারলে। এমন তীক্ষ্ণ সুরেলা গলা যে আগন্তুকরা প্রথমে বুঝতেই পারলে না, স্ত্রীলোকটি কি বলছে। একটা বন্য অব্যক্ত ফোঁপানি কাউকে শাপ দিচ্ছে, ধিক্কার দিচ্ছে কাউকে।

স্ত্রীলোকটি এবার দাঁড়িয়ে উঠল। আগন্তুকদের মুখের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাদের প্রত্যেককে আপাদমস্তক দেখতে লাগল চুপ করে। সেই তীব্র চাউনির সামনে চোখ নামায় অনেকেই।

স্ত্রীলোকটি হঠাৎ বলতে শুরু করে চাপা গলায়, "হাম লোক ভুখা হ্যায় বাবুজী। লেকিন কিসিকো নোকর নেহি হাম, কিসি কো নেহি।"

একবার পুরুষটির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে, "আগাড়ী সালমে স্ট্রাইক হুয়া, গোলি ভি চালা। ইসকে বাদ সব ঠাণ্ডা হো গিয়া। একঠো আদমী দে দিজিয়ে বাবুজী যো সব সামাল দেনে শকেগা। মিটিনমে যায়েগা, লেকিন সামাল কৌন দেগা? বোলিয়ে, কৌন সামাল দেগা ?"

কে বিপদের ঝুঁকি মাথায় নেবে ? কে দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত ? স্ত্রীলোকটি হঠাৎ কথা থামিয়ে গাল পাড়তে থাকে, শাপ দিতে থাকে, একবার এগিয়ে যায়, আর একবার পেছোয়। আগন্তুকরা ঠাওর করতে পারে না, কি বলবে।

স্ত্রীলোকটির মাথায় সাদা চুল উড়ছে। লম্বা ক্ষীণাঙ্গ একহারা চেহারা। ফাটা সেলাই করা ময়লা নেতা জড়ানো সারা অঙ্গে। ফর্সা রঙটা এখনও জ্বলে যায় নি। যেন একটা ক্রুদ্ধ ফণিনী। একটা সাদা গোখরো তাদের গায়ে এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে,

এ রকম অস্বাভাবিক অবস্থা কতক্ষণ চলেছিল বলা যায় না। সুনীল হঠাৎ বললে, "এখানে কিছু হবে না। পাশের বস্তিটায় চল যাই।"
বস্তি থেকে ফিরবার মুখেই আবার আখড়া। যে দুটি শ্রমিক এতক্ষণ কুস্তি করছিল, তারা জিরোতে বসেছে হাওয়ায়। আগন্তুকদের দিকে এক নজর তাকিয়ে দ্বিতীয়বার মহড়া দেবার জন্যে তারা আবার উঠে দাঁড়াল।
মাস্টার মশাই, সুনীল, নিত্য কেন এভাবে তাদের কর্তব্য-বুদ্ধি বিপন্ন করলে তার কোন স্পষ্ট যুক্তি নেই। শুধু বলা যায় এক উজ্জ্বল, অদূর ভবিষ্যতের স্বপ্নে তারা মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল। মাস্টার মশাই যখন তাঁর ক্ষয়কাশে ফাঁপা হাপরের মত বুকটা এক হাতে চেপে ধরে সেই স্বপ্নের কথা বলতেন আর সুনীলের চোখ মুখ জ্বলে উঠত তখন তাদের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্যেও কারো মনে হত না যে এ ব্যাপারে তাদের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে। কিন্তু একটা ব্যাপারে ভুল হয়েছিল নিশ্চয়। আগামীর নানাবর্ণের বিহ্বলতায় তাদের স্মরণে ছিল না, মানুষের মুক্তির পথে কোন শর্ট-কাট নেই।

ছোট্ট পার্ক, আর পার্ক জুড়ে যেন কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে—এত লাল পাগড়ী। যে কজন দর্শক তার চেয়ে অনেক বেশী প্লেন-ড্রেস পুলিস। মিটিঙের ডায়াস বলতে একটা টেবিল আর কখানা চেয়ার। তার চেয়েও একটা বড় টেবিল আর চেয়ার, আর পেট্রোম্যাক্সের আলো নিয়ে বসে আছে পুলিসের লোকরা পাশেই। একটু দূরে একটা ভাঙা শুকনো দেবদারু গাছের তলায় কতগুলো শ্রমিক জটলা করছিল।
নিত্য, সুনীল এরা চার পাঁচজন মজুরকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকছিল। পুলিসের মহড়া দেখে, পেছন ফিরতেই দেখলে তাদের ভেতর অনেকেই হাওয়া হয়েছে। একজন শ্রমিক কাঁধের গামছাটা মুখের ওপর নামিয়ে নিত্যর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে মিলিয়ে গেল। মাত্র একশো সোয়াশো লোক নিয়ে মিটিং শুরু হয়।
মাস্টার মশাই সবেমাত্র উঠেছেন বলতে এমন সময় ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার নিয়ে পুলিস অফিসার এগিয়ে এলেন। একশো-চুয়াল্লিশ ধারা, বেআইনী সভা। মাস্টার মশাই আর দর্শকদের কেউ কেউ বললে, "আমরা মানব না, চালিয়ে যাব সভা।"
ডায়াসের ঠিক পেছনেই সার করে স্টিল হেলমেট-পরা আর্মড গার্ড্স্ তৈরি ছিল, হুইশ্ল্ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাঠি চলল। টেবিল চেয়ার ভাঙল। পতাকাগুলোকে পায়ের তলায় ফেলা হল। মাস্টার মশাই, সুনীল গ্রেপ্তার হল। নিত্য মাথায় লাঠি খেলে। রেলিং টপকিয়ে অবশ্য বেশী দূর এগোতে পারেনি, রক্ত-ধাঁধা খেয়ে

এক ডিসপেনসারির সিঁড়িতে গিয়ে পড়ল। ডাক্তার যত্ন করলেন। পুলিস এলে তাঁর বাড়ির একতলার ক্লিনিকে অন্যান্য রোগীদের মধ্যেও নিত্যকে শুইয়ে রাখলেন।

ঘা শুকাতে বেশ কিছু দিন গেল, আধঘুমন্ত আধজাগ্রত অবস্থায়। মাথায় ব্যাণ্ডেজ নিয়ে রাস্তায় বেরোবার বিপদ ছিল। নিত্য তাই এ ক-দিন চিলে কোঠার ঘরে শুয়ে কাটাল।

হাশেমের কথাগুলো মনে হচ্ছিল তার বেশী করে "এটা যেন একবারও আমরা না ভাবি, কোনও অভাবিত ব্যাপার করছি আমরা, অথবা কারো পাল্লায় পড়ে করছি।" সেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, অনেকগুলো মানুষের সঙ্গে চলা, আর সেই হাসিতে উজ্জ্বল লোকটা, যে বলেছিল—তামাম হিন্দুস্থান হেলিয়ে দেবে।

শুধু সেদিনকার কথা নয়, গত দু-বছরের ঘটনাগুলো আবার নতুন করে ঘটতে শুরু করল তার চোখের সামনে আর সে বারেবারেই ভাবছিল, কোথাও ফাঁকি আছে কি না, অন্তত তার এই দিক থেকে। সাহিত্য-পড়া নিত্যগোপালের মনে হল এতদিন বেশ একটা সুন্দর নদীর ধার দিয়ে হাঁটছিল সে। শরৎকালের মেঘ কাঁপছে জলে, মৃদু মৃদু হাওয়ায় ঢেউ তুলে চলেছিল নদী। হঠাৎ একটা মোচড় দিয়ে বাঁক ফিরতেই জল হল ঘোলা, কালো আঁধারের পাক খেতে খেতে ঘূর্ণি তুলে নদী ছুটল, শব ভেসে এল জলে।

অবশ্য মাথার ঘা শুকোবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা যত স্বাভাবিক ও চাঙ্গা হয়ে উঠতে লাগল ততই এ ধরনের চিন্তা কেটে যায় নিত্যগোপালের মন থেকে। তার মনে হল, যতই চমকপ্রদ উপমা হোক না কেন জীবনটা আর তার অভিজ্ঞতা তার চেয়ে অনেকখানিই বেশী প্রকাশ করে। পোর্টের বস্তির সেই নিশ্ছিদ্র রাত তো আরো মানুষের কাছে যাবার জন্যে আঙুল দেখাচ্ছে তাকে। আবার সেই পুরনো প্রশ্নটাই তার ঘুরে ফিরে মনে হতে থাকে—মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্থাপন না করে তুমি তার মঙ্গল করবে কী করে?

উনত্রিশ

"এটা কি হল নিত্য, এটা কী হল ? তোরা কজন রাস্তায় নামছিস রোজ আর পড়ে পড়ে মার খাচ্ছিস। ওদিকে সিনেমার লাইনে ভিড় হচ্ছে, ট্রাম-বাস ভর্তি করে ইডেন গার্ডেনে খেলা দেখতে চলেছে লোক। এর মানে কি ? সবচেয়ে অবাক হচ্ছি তোর কথা ভেবে নিত্য। তুই কেন ভিড়েছিস, ভাবতে আশ্চর্য লাগে। তুই তো ভাবনা চিন্তাও করিস। কেবল মরিয়া হয়ে প্রাণ দেওয়াটা তো তোর কাছে আসল ব্যাপার না। তুই কেন এখানে ?"

"আর যতই বলিস বার বার তুই মানুষের কাছে যেতে চাস, তাদের সঙ্গে তোর যাকে বলে একটা গভীর ধরনের সম্বন্ধ গড়ার ইচ্ছে, তুই আসলে এ জগতে একেবারে মিসফিট। আচ্ছা, তুই মিথ্যে কথা বলতে পারবি ? দরকার হলে মানুষের মঙ্গলের জন্যে মানুষকে খুন করতে পারবি ? বুকে হাত দিয়ে বল পারবি ! পারবি না তো, তাহলে ?"

"আসলে সব এক নিত্য—ইংরেজের পলিটিক্স, কংগ্রেসের পলিটিক্স, সাম্যবাদের পলিটিক্স। একটা ব্যাপারে সব এক। নিজের লক্ষ্য সিদ্ধির জন্যে সব কিছু করার নাম পলিটিক্স। তর্ক করিস না। আমি খারাপ বললে কী এসে যায়। গোটা পৃথিবীটাই চলছে এ নিয়মে। তবে এটাকে যখন বলে মানুষের মঙ্গলের জন্যে তখন আমার গা ঘিন ঘিন করে। আমার নিশ্বেস বন্ধ হয়ে যায়। তুই আবার ভুল বুঝছিস আশা করি। তুই ভুল বুঝবিই। কারণ নিজে ভালোটি হয়ে তুই আর সবাইকে ভালো ভাবছিস। এইখানে আমার খালি আপত্তি। আমার আপত্তি তুই যথেষ্ট পরিমাণে যাকে বলে ঝানু নোস। কোন দলেই ঠাঁই পাবি না তুই। কেউ তোকে পাত্তা দেবে না।"

"তুই যে ভাবে মানুষকে দেখতে চাস আগাগোড়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, চারপাশ থেকে দিনের পর দিন ধরে, তার সময়ও নেই ইচ্ছে নেই কারো। মানুষের সঙ্গে মানুষের আজকে একটাই সম্বন্ধ, নেহাত দেনাপাওনার। আবিষ্কার করার মত তা মোটেই আশ্চর্য কিছু না। এ সম্বন্ধের কোন রঙ নেই, বৈচিত্র্য নেই। যেটা ভাবছিস সেটা একেবারে তোর নিজস্ব মনের রঙ।"

"কথা বলছিস না যে ! তুই বেশ ভালো শ্রোতা নিত্য। খালি শুনেই যাস ;

অথবা জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করিস না। একটা কথা তোকে জোর করে বলব। তোর মাথায় রাজনীতি নেই। তুই একজন দার্শনিক আর তোর দর্শন একেবারে নিজস্ব।"

"মাকে বোধহয় তোর মনে পড়ে না নিত্য। কতদিন হয়ে গেল, সে যেন একটা আলাদা জগৎ। আমার চেহারার সঙ্গে মার কোন মিল নেই। তবে মার মত তোর চোখ দুটো, মার মত তোর কোঁকড়া চুল। তুই নির্ঘাত ঠকবি মার মত। বড্ড কথা বলছি। বোধহয় বুড়ো হয়ে যাচ্ছি বলে। আসলে জানিস আমি কি চাই? আমি চাই যেন আমার ভাই আমার চেয়েও একটা শক্ত লোক হয়। চারদিকের ঘাঁতঘোঁত ঠিকমত বুঝতে পারে, যাকে বলে ঠিক দুঁদে লোক। তা না তুই কোথায় মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছিস। কিরে, কথার জবাব দিস না কেন? কিসের এত গুমোর তোর বলতো নিত্য?"

অন্ধকারে মনে হচ্ছিল নিত্য ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্তত একবারও হাত-পা নাড়ায়নি! এবারে হঠাৎ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে, "দাদা, দাদা, তোমার দয়া থেকে আমায় বাঁচাও। তোমার অনুকম্পা তুলে রাখো আর কারো জন্যে। তুমি আমায় ফিলজফার বল, চিন্তাশীল বল, কিন্তু দরকার হলে আমি যে পুলিসের গাড়িতে ঢিল ছুঁড়ি দাদা! অন্যায়ের সামনে যখন সংঘবদ্ধভাবে দাঁড়াতে পারি না, তখন আর পাঁচ-জনের মতই আঙুল কামড়াই, মাথা খুঁড়ি। যদি তোমার মত দিনরাত জনসাধারণকে উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত থাকতে পারতাম! তা যে পারি না।"

গলা চড়িয়ে নিত্য বললে, "মার কথা কেন টেনে আনছো বার বার? মার কথা দিয়ে নিজের কথা প্রমাণ করতে চাইছো? পৃথিবীটা তোমার খারাপ লাগে সাধারণ মানুষের কোন চরিত্র নেই, এগুলো বলবার জন্যে মাকে অপমান করছো কেন? আমার মাকে মনে নেই। খুব অস্পষ্ট। কী রকম যেন···কার চুল আমার মুখের ওপর এসে পড়েছে। তবে মা যা তোমায় শেখাতে চেষ্টা করলে সারা জীবন ধরে অন্যের বাড়ির রাঁধুনি হয়ে, চটের থলি সেলাই করে তা কি মানুষকে অপমান করবার জন্যে?"

"আমার একটা রাতের কথা মনে পড়ে দাদা, সেই হাওয়ার রাত—সেই ১৪ই আগস্ট ১৯৪৭ সালের আশ্চর্য রাতটার কথা। তুমি বলতে পারো উচ্ছ্বাস, বলতে পারো কবিতা, ইমোশনালিজম, যত চোখা কথা ব্যবহার করতে পারো। কিন্তু সে রাত্রির সেই অসংখ্য, মানুষের কলরবের কি কোন দাম নেই? তারা কি পেয়েছে সেটাই তুমি দেখছো; কারণ তুমি যাকে বলে এ সমাজব্যবস্থার পাবলিক

রিলেশনস্ অফিসার। যা এসেছে তাই মেনে নিয়েছো। তারা কি চেয়েছে, কি চাইছে, কি খুঁজছে, তার একবারও খোঁজ নাওনি তুমি।"

নিত্য এবার শান্ত হয়ে যায়। বলে, "মানুষ সম্বন্ধে ওপরচালাকি করেও লাভ নেই। গদগদ হয়েও লাভ নেই। তুমি মরলেও মানুষ চলবে, আমি মরলেও চলবে। আমাদের সামনে একটাই রাস্তা, তার চলার সাথী হওয়া। তোমার পলিটিক্সে গা ঘিন ঘিন করুক, তাতে কিছু আসে যায় না। মানুষের সমাজ থাকবে, রাষ্ট্র থাকবে। আমার এইটুকু গুমোর, আমি তাদের সঙ্গে চলি।"

'Mad, mad! নিত্য তুই বদ্ধ পাগল!" সত্যগোপাল চেঁচিয়ে উঠলেন।

"তোমার যা খুশি বল দাদা, আমি চলব।"

ত্রিশ

গোরু আর মানুষ একাকার হয়ে শোয় তারা। বেড়ার ফাঁক দিয়ে নিত্যর প্রায় গায়ের ওপর গোরুটার নিশ্বাস পড়তে থাকে। তা ছাড়া কলকাতার চেয়ে এই মাঠের মধ্যে অনিল মাস্টারের বাড়ির দাওয়ায় যে ঠাণ্ডাটা অনেক বেশী তার দরুনও নিত্যগোপালের প্রথম রাত্রে ঘুম আসে না।

এই ক্যানিং অঞ্চলে কিংবা কলকাতার দক্ষিন দিকটায় সে আগে কখনও আসেনি। তবে লোক মারফত শুনেছিল এখানকার জলহাওয়া মাটি বাংলাদেশের গ্রামগুলো থেকে একটু আলাদা। আরো বন্য, আরো রুক্ষ, আরো গরীব এ অঞ্চল। নিত্যগোপালের গাঁয়ে মাস্টারি করবার জন্যে এদিকটা বেছে নেওয়ার মধ্যে বোধহয় এ কারণগুলোও ছিল।

চাঁদের আলোয় ধানকাটা মাঠের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কখন তার চোখ জুড়ে আসে। ঘুম ভাঙল অনেক গলার আওয়াজে।

গত রাত্রিতে অনেকক্ষণ আলাপ হয়েছে অনিলের সঙ্গে, তবে সে যে হোমিওপ্যাথিও করে এ খবরটুকু নেওয়া হয়নি। এত সকালেই পাশের দাওয়ায় গোল হয়ে অনেকগুলো লোক বসেছে, আর মধ্যে অনিল একটা ওষুধের বাক্স নিয়ে।

সকাল বেশী হয়নি। রোদ্দুরের এক ফালি ঘরের চাল ছুঁয়েছে মাত্র।

"যাও না মাস্টার একবার গাঁটা ঘুরে এস না—" অনিল এক রাত্রিতেই তুমি-তে নামিয়ে এনেছে নিত্যগোপালের সঙ্গে তার সম্বন্ধ।

একটা দাঁতন কাঠি হাতে নিয়ে নিত্য বেরোয় গাঁয়ের পথে। পায়ের নীচে মাটি শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে আছে। অন্যবার এর চেয়েও কিছু পরে ধান কাটা হয়। এবারে ধান হয়েছিল যা-তা বৃষ্টির অভাবে, না ছিল গোছ না ছিল ছড়ার বাহার। কাটা হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি।

গাঁয়ের রাস্তায় পা দিতেই নানা আওয়াজ ভেসে আসে কানে। রাস্তার দু-ধারের পুকুরে পাতিহাঁসের ডাক আর সমস্ত পথে তালের পাতার মর্মর শব্দ। নিত্যর সত্যি মনে হয় সে গাঁয়ে এসেছে। দশ হাত লম্বা তরতরে খালের ওপর তেঁতুল নেমেছে ফুল এসেছে মাদার গাছে—কিন্তু বেশীক্ষণ চোখ জুড়াতে পারে না সে। তার আজ চাকরির প্রথম দিন।

অনিলের দাওয়ায় নিত্য যখন উঠে এল তখন সেখানে ভিড় নেই। খালি একটি মাঝবয়সী রোগাপানা বৌ একবুক ঘোমটা দিয়ে সামনে এসে বসল।

অনিল চিৎকার করে উঠল—'আমি পারবনি বলে দিচ্ছি বাপু। তোমার যে অসুখ তাতে সুঁই লাগবে, ওষুধের খরচা লাগবে। সে তেজ আমার ওষুধে নেই।"

মূর্তিটি জড়ভরতের মত বসে থাকে। নড়বার চড়বার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। শুধু অসুখে জ্বলে যাওয়া জীর্ণ হাতখানা মাটির ওপর দাগ কাটতে থাকে।

অনিল বিরক্ত হয়ে বলে—"কি বসে আছ কেন ঢঙ করে রাঙা বৌ? বলে দিলাম না আমার ওষুধ নেই!" বেশ জোরেই খটাস করে বাক্সের ডালা বন্ধ করলে অনিল, বৌটি নড়ে না। মাথা আরও বুকের দিকে নেমে আসে। সেই ধুলোয়ভরা ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলির ওপর সকালের রোদ এসে পড়ল।

অনিল গাল পাড়তে থাকে, "কেন মনে ছিল না হারামজাদী কাল সাপটাকে যখন বাড়ি আনলি? মেজকর্তা, মেজকর্তা, নোলায় যে জল আসত। মোষের গাড়ি হবে, টিনের চাল হবে। তারপর তোমাকে পালঙ্কে নিয়ে বসবে মেজকর্তা। এখন যাও না একবার মণ্ডলদের বাড়ি, উঠোন পেরুতে পার কিনা একবারটি দেখ না।" বৌটি হঠাৎ রোগা হাতখানা দিয়ে ঘোমটা খসিয়ে ফেলে। অদ্ভুত মুখখানা। বেশ লম্বাটে আদল, এককালে সুন্দরী ছিল মনে হয়। এখন চোখ দুটো ঘোলাটে, ধূসর, প্রায় অন্ধ বলতে গেলে। ঠোঁট একবার কেঁপে উঠল। তারপর বেশ কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে ওঠে সে—"খেতে দিত গো।" কেমন একটা

থমথমে রাগে সমস্ত মুখখানা কালো হয়ে যায় অনিলের। হঠাৎ ফিস ফিস করে বলে—“সে ঢ্যামনাটা তো এখনও আসে শুনি। গলাটা টিপে দিতে পারো না?”

বৌটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে যায়।

“কে অনিলদা?”

“আমাদের মেজকর্তার—” অনিল একটি বিরূপ মন্তব্য করল।

প্রথম দিনের পক্ষে ভালোই বলতে হবে। খালি একটা বিরক্তিকর ব্যাপার ঘটেছিল। এখানকার প্রতিষ্ঠিত জোতদার চালের কলের মালিক, মাধব মণ্ডল ওরফে মেজকর্তার আবির্ভাব। স্কুল বসতে না বসতেই নিত্য যখন কি ভাবে সকালে উঠে দাঁত মাজা স্নান করা সম্বন্ধে ছাত্রদের বোঝাচ্ছিল তখন এক রোগা প্রৌঢ় ভদ্রলোক স্কুল ঘরে ঢুকলেন।

অনিল তখন চালের একটা মস্ত ফুটো ঢাকবার জন্যে কয়েক অঁাটি বিচুলি নিয়ে ব্যস্ত। মাধব জানালা দিয়ে ফুচ্‌কি পেড়ে বললে, “শুনলাম কলকাতার এক ছোকরাকে নিয়ে ভিড়িয়েছ। বিপদে পড়বে অনিল বলে দিচ্ছি। একবারে স্ুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুবে।”

“বেরুক না” অনিল চালে অঁাটি গুঁজতে গুঁজতে নিস্পৃহভাবে বলেছিল।

মাধব কাছে সরে এসে চাপা গলায় বললে, “তোমার আর কোন প্রতিপত্তি থাকবে না।”

“তুমি বিদেয় হও।”

“কেন নস্করদের বাড়ির ছেলে—”

“ওটা একটা হাবা। তার ওপর তোমার কথায় ওঠে বসে।”

“আচ্ছা” মাধব দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।

পরের ঘণ্টায় ঐক্য, বাক্য, মানিক্য—ঘরের এক কোণে অনিল যখন সেই ক্লাস নেয় তখন একটি মাত্র নড়বড়ে উদাসীন বোর্ডের ওপর ঘষে ঘষে অঁাক কষলে নিত্য। তারপর ভূগোলের ক্লাস, সূর্য মাথার ওপর থেকে একটু সরলেই পুকুর পাড়ে খোলা জমিটায় ড্রিল, কাবাটি।

স্কুল শেষ হলেও বেলা বেশ আছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বক উড়ে আসছে মাতলার দিক থেকে। নিত্য স্টেশনের দিকে পা বাড়াতে অনিল বললে—“টর্চ নিয়ে যাও, সাপখোপ থাকতে পারে।”

মাতলার বাঁধের ওপর এসে যখন নিত্য উঠল তখন মস্তবড় থালার মত পূর্ণিমার

চাঁদ উঠছে একেবারে মাঠের শেষ প্রান্তে ঝোপের ভেতর থেকে। স্টেশন থেকে যাত্রী, মেছো আর দোকানীর গুঞ্জন ভেসে আসছিল। কিছুক্ষণ বসে থাকার পরে শীত শীত করতে থাকে।

ফিরবার পথে গণ্ডগোল। আবছা অন্ধকার তারার আলোর নীচ দিয়ে আল ভেঙে রাস্তা। প্রায় মাইল খানেক যাবার পর বাঁধের নীচে আগুন দেখে খেয়াল হয় তার—মড়া পুড়ছে, তার আগুন। সামনে একটা লোক বসে হাফপ্যান্ট পরা, মাথায় মিলিটারি টুপি, গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি। লোকটা চিৎকার করে ভাঙা গলায় মাঠের মাঝখানে গাইছে—

রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম।

একেবারে বেহেড মাতাল।

চাঁদ মাথার ওপর উঠলে দিক ঠিক করে নিত্য যখন বাড়ি পৌছল তখন অনিলের বৌ রমা উদ্বিগ্নভাবে বললে "কোথায় ছিলেন মাস্টার মশাই! নিশ্চয় রাস্তা হারিয়ে ছিলেন!"

দাওয়ায় লণ্ঠনের আলোয় অনিল বসে, আর একজন কে সামনে। হঠাৎ মেয়ের গলা শুনে নিত্য থমকে দাঁড়ায়। অনিলের কথা ছাপিয়ে সে যেন কথা বলছে। নিত্য পাশের ঘরখানায় ঢুকলে। একটা ডিবরি জ্বলছে। শ্লেট পেন্সিল নিয়ে অনিলের দুটো ছেলে হল্লা জমিয়েছে সে আলোয়। নিত্যও জমে যায়।

অনিলের সামনে যে চকচকে কালো মেয়েটি বসেছিল তার শরীরখানা বড়সড় দেখালেও মুখটা বড্ড কচি। চুল এমনভাবে পেছনের দিকে সোজা পালটান আর শান দেওয়া থুতনি যে অনেকটা কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে বলে ভ্রম হয়। প্রণতি অনিলের ছাত্রী, দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি। তবে তার বাবা জ্যাঠারা ক্রীশ্চান হয়ে যাওয়ায় তাদের থেকে কিছুটা ফারাক। প্রণতির বাবা অনিলকে খাতির ক'রে একটি মাত্র কারণে। লোকটার এদিক সেদিকে অনেক জানা-শোনা, যদি মেয়েটিকে ভালো জায়গায় পাত্রস্থ করতে পারে সে। অনিল কিন্তু এ সমস্যাটিকে কোনদিনই আমল দেয়নি।

সন্ধ্যে সাতটা কি বড় জোর সাড়ে সাত। খানিকক্ষণ শ্লেটে কাটাকুটি খেলার পর অনিলের মেজোটা ঘুমে অঢেল হয়ে পড়েছে, আর বড় ছেলেটি আধঘুমন্ত অবস্থায় শ্লেটে আঁক কষছে। হঠাৎ দাওয়া থেকে মেয়েটির গলার আওয়াজ

আসে। অনিলের নীচু স্বর, একটা দুটো কাটা কাটা কথা। কিন্তু প্রচণ্ড তোড়ে কথা বলছে মেয়েটি।

মেয়েটি বলে অনিলকে "তুমি খালি গাঁ গাঁ করে মর। আর আমি কাকা এমন হাঁপিয়ে উঠি মাঝে মাঝে। আমাদের বাঁধানো পুকুর ঘাটটা তো দেখেছ। কী যে বিচ্ছিরি লাগে, রোজ সকাল বিকেল জল ভরতে। শীতের সন্ধ্যে এমন মন খারাপ লাগে। মনে হয় এমনি করেই বুড়ী হয়ে যাব। আমি রোজ বাবাকে বলি কেন গোরুগুলোকে ঠিক আমাদের সামনের ঘরে বাঁধবে। কিছুতেই কিছু এসে যায় না, বেশ চলছে। আর ঠিক গোরুগুলোর পাশেই দাদা রোজ সন্ধ্যেবেলা চুপটি করে বসে থাকবে টুলের ওপর।"

"কেন, তার চাকরি এখনও হল না?"

"কি করে হবে? কি করেছে সে যে চাকরি হবে? সারা জীবন বাউণ্ডুলে, এখন আবার দু-ছেলের বাপ হয়েছে। সব সময় মুখচোরা ভাব। বৌদি মুড়ি দেবে তাও গিলে খাবে, চিবিয়ে খেলে পাছে শব্দ হয়।"

কথা বলতে বলতে অনিলের ছাত্রীর মুখ চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। বাইরে ফুটফুটে পূর্ণিমা। মেয়েটি সেদিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়। তারপর অনিলের মুখের কাছে সরে এসে চোখ কটমট করে বলে—"তোমার কাছে এলে এমন রাগ হয়, মনে হয় ঠাস করে একটা চড় মারি তোমার গালে।"

অনিল হেসে বলে, "হাতে লাগবে।"

"না সত্যি কাকা তুমি হেসো না। তোমার কাছে এলে খালি ভালো ভালো কথা বলবে। কিন্তু আমি আর তোমার খুকু নই। ওরকম আশার কথা শুনে শুনে আমার কান পচে গেছে।"

"তাহলে আয় গান ধরি, ও আমার পরাণ বঁধু, নিরাশার দহনে জ্বলি দিবানিশি," অনিল সত্যিই একটা সুর ভেজে দিলে।

প্রণতি গুম হয়ে বসে থাকে। এক একবার জ্যোৎস্নায় ধোয়া উঠোনের দিকে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করে চোখ ফিরিয়ে নেয়। অনিল হেসে বললে, "কি রে, গানটা পছন্দ হল না?"

চাপা রাগে ফুঁসে উঠল প্রণতি, "বাবা তো তোমায় রোজ পট্টি দিচ্ছে একটা বিয়ে দিয়ে দাও আমার। তাই দাও না। একটা বিয়ে করে ফেলি, সব চুকে বুকে যায়। কেন এই ভাবনা মিছিমিছি।"

চোখের কাছে জল চকচক করছে, চুল দু-গাছি উড়ে মুখের ওপর এসে নেমেছে,

চিবুকের পেশী কাঁপছে থেকে থেকে—কে বলে প্রণতি অনিলের সেদিনের ছাত্রী যে রোজ স্কিপিংয়ের দড়ি লাফিয়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরত।

প্রণতি হঠাৎ মাথা ঝাঁকি দিয়ে বলে, "জানো কাকা, মাঝে মাঝে মনে হয় আমি হয়ত একজন প্রতিভা। কই আমিই তো খালি এই রকম ভাবি, আর তো কেউ ভাবে না আমার মত। দিদিরা, মাসীমা সব তো বেশ ঘরকন্না করছে। সত্যি বিশ্বেস করো, রোজ রাত্তিরে জেগে জেগে আমি কবিতা লিখি।"

অনিলকে একটু বিচলিত দেখায়। ছাত্রীর স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, "রোজ রাত জাগিস, সে কি?"

"হ্যা কাকা, প্রায় রোজ রাত্তিরে, সব্বাই ঘুমোয়, তালপুকুরে চাঁদ ওঠে আর এমন চুপচাপ। খালি একটু একটু হাওয়া দেয়। আমার মনে হয় ডাক ছেড়ে কাঁদি। তখন রাত জেগে তাড়াতাড়া কবিতা লিখি। খাটের নীচে মার বাক্সটা প্রায় অর্ধেক ভরে গেছে। একদিন শুনবে কাকা?"

"ভাখ্ কবিতা-টবিতা তো আমি ঠিক বুঝি না। কেমন যেন গোলমেলে লাগে। আমার বরং পালা গান শুনতেই ভালো লাগে। তবে তুই যখন লিখেছিস—"

দপ্ করে নিভে যায় প্রণতি, কিন্তু পরমুহূর্তেই টগবগ করে ওঠে। বিজ্ঞের মত বলে, "আমি এমন একটা জিনিস শিখেছি কাকা তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না।"

"কি, মাছ ধরছিস নাকি?

"দূৎ, তোমার মাথা। জানো কাকা, আমি ড্যান্স্ শিখেছি।"

"ড্যান্স্, সেটা কিরে?"

"ওমা, তাও জানো না!"

প্রণতি হঠাৎ টপ করে উঠে দাঁড়ায়। তারপর সামনে পেছনে ঝুঁকে কোমর দুলিয়ে কয়েকবার অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করে, লণ্ঠনের ম্লান আলোয় দেখা যায় তার হাত দুখানা নানাদিকে নানা ভাবে নড়ছে আর দু-চোখ এমন বিস্ফারিত যে দেখে মনে হয় সে আর এ জগতে নেই।

অনিল যখন বলে ওঠে "ব্যস্ ব্যস্, আর পেছনে হটিসনে, জল আছে" তখন যেন সে সম্বিত ফিরে পেল। ধুপ করে অনিলের পাশে বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "কেমন, ভালো লাগল না কাকা?"

"চমৎকার, কিন্তু এত জিনিস তুই শিখলি কোথা থেকে?"

"বাঃ ফিল্মে কত ভালো ভালো ড্যান্স দেয়। আমি রোজ আয়নার সামনে

দাঁড়িয়ে সেগুলো শিখি। কাকা, তোমার পায়ে পড়ি, কাউকে বলে কয়ে আমায় ফিল্মে ঢুকিয়ে দাও না। আমি ঠিক বলছি, একবার যদি আমি ঢুকতে পারি ঠিক বিখ্যাত হব।"

এমন আগ্রহে প্রণতি বলে যে কষ্ট করে অনিলকে হাসি চেপে বসে থাকতে হয়। একে চারদিক চুপচাপ, তার ওপর একটা বড় মেয়ের পায়ের ধুপ ধুপ শব্দ,... সপ্তর্ষের দিকে চেয়ে চেয়ে কখন একটা চট্‌কা এসেছিল নিত্যর, হঠাৎ কেটে যায়। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাইরে বেরিয়ে আসে।

অনিল বললে, " এস মাস্টার, এস।"

নিত্য মাথায় চাদরমুড়ি দিয়ে চাটাইয়ের এক কোণে এসে বসল। প্রণতি অনিলের ঘাড়ের কাছে সরে এসে বললে, "লোকটা কে কাকা, আগে তো বলনি।"

নিত্য বললে, "কোথায় যেন কিসের আওয়াজ পেলাম মনে হল।"

"তুমিও পেয়েছো," অনিল হাসি চেপে বলে। তারপর প্রণতির দিকে তাকিয়ে বললে, "তোর সেই ড্যাঙ্ক না ম্যাঙ্ক একবার দেখিয়ে দে তো।"

রমা রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "ওকে কি সঙ পেয়েছো নাকি? প্রণতি বাড়ি যা তো।"

প্রণতিও বললে, "আমি আজ উঠি কাকা. রাত হয়ে যাচ্ছে।"

"দাঁড়া, আমি পায়ের জামাটা নি।"

নিত্যকে একলা পেয়ে প্রণতি তীব্র একটা সন্দেহের দৃষ্টিতে তার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে। স্থানীয় ইস্কুল মাস্টারদের মত চেহারা মোটেই নয়। শহুরে ছাপটা মাথায় আলোয়ান মুড়ি দিলেও প্রকট। লোকটা পকেট হাতড়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে টানতে থাকে।

প্রণতি লক্ষ্য করলে অনভ্যাসের দরুন দু-তিনবার টান দেবার পরই বিড়ি নিভে যায়। দ্বিতীয়বার ধরাবার সময় প্রণতি বলে উঠল, "আগে তো দেখিনি কোথাও।"

নিত্য ফিরে তাকায়। একটা সন্দেহ অবিশ্বাসে ভরা মুখ, একসারি ঝকঝকে দাঁতের পাটি, আবার টিপের বদলে লম্বা সরু কাজলের ছড় টানা হয়েছে কপালে। হেসে বললে 'তাই তো মনে হচ্ছে। তুমিও দেখছি বেশ কলকাতার মেয়ে।"

প্রণতি চেঁচিয়ে উঠল, "আমার গাঁয়ের মেয়ে হতে বয়ে গেছে।"

নিত্য অবাক হয়ে বললে, "তবে যে শুনলাম তুমি অনিলবাবুর ছাত্রী। কাছেই কোথায় থাকো।"

"থাকলেই কি কলকাতার মেয়ে হতে নেই? আমাদের বাড়ির সব্বাই কলকাতা যায়। কাকারা সব কলেজ স্ট্রীটের মেসে থাকে।"
নিত্য বললে, "ও।"
প্রণতির এরকম ছোটখাটো "ও, আ" তে মনঃপূত হয় না। বিরক্ত হয়ে বলে, 'তা এখানে আসতে কে মাথায় দিব্যি দিয়েছিল?"
"এমনি এলাম—"
প্রণতি মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, "বেড়াতে? বেশ ঘি টা সর-টা খাব, মোটা হব, না? তবে সে গুড়ে বালি, চালের ওপরে যদি একটা তরকারি জোটে তবে ভাগ্যি বলে মেনো।" তারপর নিত্যর দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'আবার চশমাও চড়ান হয়েছে, বলি কা পাশ?"
"বেশী দূর হয়নি।"
প্রণতি ঠোঁট উল্টে বলে, "ও তাই।" তারপর অনিলকে আসতে দেখেই চাপা গলায় বললে, "তুমি বরং একটা গুড়ের দোকান দাও, সময় কাটবে।"

একত্রিশ

সপ্তাহ ঘুরে মাস পড়তে চলল, কিন্তু একটা কথা বলি বলি করেও রমার বলা হয়ে ওঠে না। এই গত একটা মাস তাদের বাড়ির নতুন লোকটি যেমনটি এসে ঢুকেছিল তেমনটিই আছে, মুখে রা নেই। চেয়ে চিন্তে খাবার গরজও নেই। খায় দায়, ইস্কুল থেকে ফিরেই বেরোয়। কোনদিন মাতলা পার হয়ে যায়, আসতে রাত হয়। রমা রাগ করে একদিন ভাত রাখেনি, লোকটি কোন কথা না বলে এসে শুয়ে পড়েছে। এ ধরনের লোককে পছন্দ হয় না রমার, অনেক সময় এমন গুম হয়ে বসে থাকে যে ভয় ভয় করে।
সেদিন ছুটি। মেঘলা হয়ে আছে আকাশ, আর মাঠের ওপর এলোমেলো হাওয়া বইছে। সকালেই অনিলদের পুকুরে ছায়া নেমেছে। সেদিকে মুখ করে নিত্য চুপচাপ বসেছিল। রমা ঘাটে কাপড় কাচে। শীতের দিন বলে বাচ্চাগুলো

জলে যেতে চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। রমা হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে ওঠে, "জলে তো ঢেউ দেয়নি মাস্টার, কি শুনছো বসে বসে? ছেলেটাকে নাও না একটু।"

নিত্য একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাড়াতাড়ি দাওয়া থেকে নেমে অনিলের ছোট ছেলেটাকে কোলে নিতে গিয়েই ঘাটের পেছলে পা হড়কে পড়ে। একদিকে ছাই আর কাদা জমা ছিল, তাইতে মাখামাখি হয়ে যায় কাপড়ের খুঁট।

রমা কিছু বলে না। সেদিকে একবার তাকিয়ে আস্তে আস্তে ছেলেটাকে নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলে, "কাপড়টা ছেড়ে দাও, কেচে দিচ্ছি।"

তারপর কাচা কাপড় মেলে দিয়ে ছেলেটাকে দুধ খাইয়ে নিত্য যেখানে বসেছিল সেখানে চুপটি করে এসে বসে।

নিত্য বললে, "খোকার লাগেনি তো?"

রমা চুপ করে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে জবাব দেয়, "তাতে তোমার কি।"

নিত্য আশ্চর্য হয়। কৌতূহলী হয়ে তার দিকে তাকাতে রমা বলে, "তুমি যে একটু ভদ্রতা করতে জানো সেটা তোমার চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। তার জন্যে বলার দরকার কি? আর তা ছাড়া আমরা গরীব, গেঁয়ো মানুষ, খেয়ালী মানুষদের সাথে আমাদের কি সাথ? তাদের খেয়াল আছে, পয়সা আছে। যখন দরকার হবে পাড়া গাঁ বেড়াতে যাবে, যখন দরকার হবে..."

নিত্য রুক্ষ গলায় বলে উঠল, "বৌদি!"

"কেন খুব লাগছে, না? তবে তোমায় তো আমি খোকনের জন্যে লজেঞ্চুস কিনে দিতে বলছি না, বাজার করতে বলছি না! তুমি কী মানুষ গো। একটা মাস একসাথে কাটালে একবারটি গল্পও করলে না তোমার বাড়ির কথা, তোমার মার কথা, ভাইবোনের কথা। বিয়ে করোনি, খাওয়া করোনি, সংসার নেই, সাথী নেই, তুমি কী গো?"

রমা এক মুহূর্তে কিছু শুনবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে। নিত্য জবাব দেয় না। আচমকা আঘাতে একেবারে কাঠ হয়ে যায়। মার কথা বলতেই তার অসোয়াস্তি হয়। তার নিজের মনে নেই, কিন্তু দাদার কাছে শোনা সেই রাত্রির কথাটা তার মনে গাঁথা হয়ে আছে। ঘরে কেউ নেই আর ঘরময় হাওয়া খেলে বেড়াচ্ছে, দরজার গোড়ায় দাদার দু-হাতের ওপর মার মাথা। কোথাও হাওয়া উঠলেই নিত্য অসোয়াস্তি বোধ করে। কি ভেবে সে রাস্তায় দিকে পা বাড়ায়।

রমা বললে "কোথায় যাচ্ছো?" নিত্য জবাব দেয় না।

সন্ধ্যের পর অনিল দাওয়ায় উঠেই বললে, "মাস্টার তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

রমা অনিলের গলার স্বরে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে। অনিল নিত্যকে বললে, "চল মাতলার দিকে বেরিয়ে আসি।"

"চলুন।"

রমা কি একটা রসিকতা করবার জন্যে রান্নাঘর থেকে পা বাড়িয়েছিল, কিন্তু অনিলের দিকে চেয়ে চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

শীতের দিন হলেও মাতলায় সে রাত্তিরে হাওয়া দিচ্ছিল। শীত মাঝখানে কদিন চেপে পড়েছিল। আজ তেমন নেই, মনে হল একটু করে বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে।

বাঁধের ওপর গিয়ে চুপচাপ দুজনা বসে। বাঁধের গর্তে গর্তে লোনা জল ঢুকছে, তার ছল ছল আওয়াজ কানে আসে।

অনিল গম্ভীরভাবে বললে, "জানো মাস্টার এই ইস্কুল বাড়িটা গাঁথা হয় কেমন করে? ঐ যে সামনে ক্ষেতের মাঝখানে একটা কালভার্ট দাঁড়িয়ে আছে সেটা থেকে। কোম্পানীর কাছ থেকে মাত্র তিরিশটা টাকায় ওটা কিনে নি আমরা। কিন্তু মাটি কেটে প্রায় দু-হাজার টাকার ইঁট বেরোয়। আর চোত মাসের রোদ্দুরে এক একখানা ইঁট দু-মাইল দূর থেকে বয়ে নিয়ে আমার ছেলেরা এই দালান তুলেছে।"

এটুকু ইতিহাস বলতে গিয়ে অনিল এত গম্ভীর হচ্ছে কেন নিত্য ভেবে পায় না।

অনিল বললে, "একখানা চেয়ার ছিল না, বোর্ড ছিল না, বৃষ্টি হলে ছেলেরা ঠায় ভিজতো। বিশ বছর কোন সরকারী গ্রাণ্ট হয়নি। আমি তাই চাই না মাস্টার, টাকার অভাবে ইস্কুলটা আবার ভেঙে যায়।"

নিত্য তার দিকে অবাক হয়ে তাকাতেই অনিল বললে, "তুমি যে চাষীদের মধ্যে গিয়ে মিটিং করছো এতে আমার কিছু বলবার নেই কিন্তু আমি চাই না ইস্কুল এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এর প্রতিটি ইঁট কাঠ--"

নিত্য বাধা দিয়ে বলে ওঠে, "আর বলতে হবে না আপনাকে।" একবার একটা সন্দেহ দোল খেতে থাকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে, অনিল কি এতদিন পর সামাজিক প্রতিষ্ঠা চায়, সব ঝুঁকি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চায়। যে লোকটা নিজের হাতে জমিদারের পাইক ঘায়েল করেছে আজ কি সে নিরীহ ভদ্রলোকটি হয়ে বাঁচতে চায়? জোর করে এই অসোয়াস্তিকর চিন্তাটা মাথা থেকে সরিয়ে নিত্য বলে উঠল, "কালই আমি চলে যাব নদীর ওপার।"

"অত তাড়াতাড়ি নেই কিছু," অনিল শান্ত গলায় বললে।

নিত্য বাড়ি ফিরে তার টিনের সুটকেশটা গোছাতে থাকে। একটা কাচা শার্ট আর ধুতি লণ্ঠনের আলোয় বেশ যত্নের সঙ্গে ভাঁজ করে। তারপর ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ে।

নিত্যর ঘরখানা সম্প্রতি বদল হয়েছে। আগের ঘরটা ছিল অনিলের পাশেই। চালটা তার অনেক মেরামত হয়নি, ঠেকনা দিয়ে কোনমতে লাগানো ছিল। দিন পনেরো আগে দুপুরবেলা সামান্য ঝড়। ভাগ্যি সে ঘরে কেউ ছিল না, একেবারে হুড়মুড় করে চাল ভেঙে পড়ল। এখনও সারা হয়নি। নিত্য সম্প্রতি শোয় উঠোন পার হয়েই সামনে মাঠের ধারে হরি মাস্টারের ঘরে। হরি একলা লোক ছিল, গত বছর কলেরায় মারা যাবার পরথেকে খালিপড়ে আছে ঘরখানা।

শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসছিল না সেদিন। বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে ক-দিন থেকে। একেবারে হাট করে রেখেছে নিত্য দোর জানলা। একবার ভাবলে বন্ধ করে দেবে, সাপখোপ ঢুকতে পারে। কিন্তু এমন একটা মিঠে আলসেমিতে সারা শরীর ডুবে যায় যে আমবনে হাওয়ার শব্দ শুনতে শুনতে কখন চোখের পাতা জুড়ে আসে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে খেয়াল নেই। হঠাৎ কিসের আওয়াজে নিত্য চট করে জেগে ওঠে। ঠিক জানালার পাশেই কিসের ছায়া নড়ে। নিত্য চেঁচিয়ে উঠল, "কে, কে?" কিন্তু কোন উত্তর নেই। নিত্য দাওয়া থেকে নামে তারপর এক দৌড়ে ঘরের পেছনে গিয়েই থমকে দাঁড়ায়।

ধানকাটা মাঠের ওপর অস্পষ্ট হলদে নিস্তেজ চাঁদ। আর জানালার নীচেই সেই আলোয় দেখা যায় জড়োসড়ো অস্পষ্ট এক মূর্তি।

নিত্য মনে মনে হাসলে। এ ঘরেও সিঁধকাঠি দেবার লোক আছে। এগিয়ে গিয়ে মূর্তিটির কাঁধে ঝাঁকি দিতে গিয়েই মুহূর্তে হাত আলগা হয়ে যায়। প্রায় চিৎকার করে ওঠে নিত্য, "তুমি, তুমি এখানে!"

ভয়ে লজ্জায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে প্রণতি। নিত্য আশ্চর্য হয়ে বলে, "তুমি এখানে প্রণতি?"

আস্তে আস্তে মাথার কাপড় নামিয়ে মুখ তোলে প্রণতি। ম্লান চাঁদের আলোয় মুখের সবটা দেখা যায় না। প্রথম মুহূর্তের লজ্জা কেটে গিয়ে এবার ধীরে ধীরে একটা আগ্রহ ফুটে উঠেছে তার দুটি তীক্ষ্ণ চোখে। নিত্যর দিকে ঝুঁকে পড়ে কি যেন খোঁজে প্রণতি, তারপর ফিসফিস করে বলে, "কেন, তুমি আমার চিঠি পাওনি?"

গলা কাঁপছে প্রণতির। হাঁটু দু'টোও যেন ঠক ঠক করে নড়ে উঠল। নিত্যর প্রথমে মনে পড়ে না, তারপর আরও আশ্চর্য হয়ে যায়। ইস্কুলের একটা মেয়ের হাত দিয়ে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল বটে। ঠিক চিঠি না কারণ তাতে সম্বোধন কিছু ছিল না। এক টুকরো বালি কাগজে পেন্সিল দিয়ে আঁকা বাঁকা হরফে লেখা "আমার জন্যে সন্ধ্যেবেলা অপেক্ষা কোর।" ব্যস, নীচে কিছু লেখা নেই। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে অবশ্য জেনেছিল প্রণতির কাণ্ড। সেই দেখা করা মানে যে এত রাতে এভাবে দেখা করা তা সে একমুহূর্তও ভাবতে পারেনি।

প্রণতি এবার আরও কাছ ঘেঁষে বললে, "কেন আমার চিঠি তুমি পাওনি? জানো, সন্ধ্যেবেলা এসেছিলাম কাকার ওখানে, তুমি তো ছিলে না। এমন রাগ হল? প্রতিজ্ঞা করলাম আর দেখা করব না। শুনেছিলাম হরি মাস্টারের বাড়ি উঠে এসেছো। এ মাঠটা পার হয়েই তো আমাদের বাড়ি। ঘুমোতে পারলাম না কিছুতেই।

নিত্য বললে, "তোমার ঠাণ্ডা লাগবে প্রণতি, ভেতরে এস।"

প্রণতি নিত্যর হাতখানা ধরে বললে, "না না, বাইরে কেমন হাওয়া দিচ্ছে। চল না এখানেই বসি।"

হরি মাস্টারের পুকুরঘাট সারানো হয়নি। খোলা মাঠে কতকগুলো তালের গুঁড়ি পড়ে রয়েছে। প্রণতি তারই একটায় বসে পড়ে বললে, "আমি খুব খারাপ মেয়ে না? মাঝরাত্তিরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি।"

নিত্য চুপ করে থাকে। প্রণতি প্রায় রুখে উঠল, "কী খুব ধর্মপুত্তুর হয়েছ দেখছি, কথা বলছো না যে?"

নিত্য জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকে প্রণতির দিকে। খোলা চুলে হাওয়া খেলছে, উত্তেজনা এখনও শান্ত হয়নি সে দু-চোখে। নিত্য প্রণতির হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, "তুমি কী চাও প্রণতি?"

"জানি না।"

"তবে কেন এলে, এত রাত্তিরে?"

প্রণতি কাতর গলায় চেঁচিয়ে উঠল "থাক হয়েছে, আর শুনতে চাই না।" তারপর তার হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বললে, "নাঃ ভুল বুঝলে। তুমি আর সকলের থেকে একটুও আলাদা নও। তেমনি ভীতু, তেমনি গোঁড়া, তেমনি……"

"তেমনি কি?,'

"বোকা।"

আকাশের কোণ ঘেঁষে লালচে চাঁদটা ঝুলে আছে। তার সামান্য আলোয় মাঠের সীমানা ক্রমশ অস্পষ্ট, ঘরের চাল আর তালগাছের সারি সব এক হয়ে যায়।

প্রণতি ধীরে ধীরে বললে, "আমারই কি দায় পড়ে যাচ্ছে সব্বাইকে বোঝাতে। কেউ যদি বুঝতে না চায়, জানতে না চায়।" হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে নিত্যর চোখের দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে বললে, "জানো, এর আগেও আমি বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছি? তখন আমার বয়স তেরো।"

নিত্য আশ্চর্য হয়ে বললে, "তেরো বছর বয়সে?"

প্রণতি বিদ্রূপ করে উঠল, "কেন আঠারো না হলে কি পালাতে নেই নাকি? কোন্ শাস্ত্রে লিখেছে?"

হেসে বললে, "কিছু না, তুমি যা ভাবছো মোটেই তা না। একেবারে সাধাসিধে ব্যাপার। জামাইবাবু থাকতেন চাটগাঁ। সেখানে চলে গিয়েছিলাম। তখন আবার দিদি ছিল না সেখানে। সে নিয়ে কী কেলেঙ্কারি! আমার ছোট বোনটাকে দেখেছো তো, ওর বিয়ে হয়ে গেছে। বর এসেছিল আমায় দেখতে, আমার সম্বন্ধে খুব বদনাম আছে কিনা তাই বিয়ে করলে, ছোটবোনকে। মা খুব কাঁদলেন। জামাইয়ের প্রায় পায়ে পড়া বাকি ছিল।"

হঠাৎ কথা থামিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে হাত মুঠো করে চেঁচিয়ে উঠল প্রণতি, "আমি কেন বলছি, কেন এসব বলছি?"

রাত কটা ঠিক বোঝা যায় না। এক ঝাঁক বুনো হাঁস শব্দ করতে করতে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়। এবার সমস্ত বন জুড়ে হাওয়া ওঠে। অনেকক্ষণ মাতামাতি করেও থামে না। সমস্ত গাছ না হলেও এক একটা সে শব্দের রেশ টেনে চলে।

নিত্য ডাকলে, "প্রণতি।"

প্রণতির কোন হুঁশ নেই। চিবুকে দু-হাত রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কি ভাবছে, পাশে যে কেউ আছে বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। প্রণতির হাতে হাত রাখতে সে চমকে মুখ ফেরায়।

নিত্য বললে, "তুমি সেদিন দুপুর বেলা যখন তোমার কবিতা পড়ে শোনালে মনে হল সব ধার করা কথা। একটা কথাও তোমার না। সব অন্যের কথা মুখস্ত করেছো। আর তুমি যখন কথা বল—"

প্রণতি উদগ্রীব হয়ে বললে, "তখন?"

নিত্য কিছুক্ষণ কথা বলে না। প্রণতির মুখখানা দু-হাত দিয়ে তুলে দেখতে থাকে। তারপর সেই সদ্য ফোটা মুখখানা নিজের দিকে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে বললে, "তখন মনে হয় প্রণতি তুমি ঠিক তুমি, তুমি আর কেউ না।"
দুজনার পা-ই খালি। ফেরার পথে দুজনার পা মাখামাখি হয়ে যায় শিশিরে। হাওয়ায় মুকুলের গন্ধ। ভোর না হলেও চমকে চমকে কাক ডেকে ওঠে। প্রণতিদের দরজা ভেজানো। প্রণতি সেদিকে পা বাড়িয়েই ফিরে আসে। নিত্যর হাতের উল্টো পিঠটা নিজের মুখের ওপর বুলিয়ে নিয়ে হালকা পায়ে মিলিয়ে যায়।

বত্রিশ

হরি মাস্টারের ঘরে একটু গড়িমসি করে বেরুতে বেরুতেই আকাশ লাল হয়ে ওঠে। বাঁধের ওপর দিয়ে সূর্য উঠছে, খালপারে বড় বড় তেঁতুল গাছের মাথায় আলো পড়েছে। রাত জাগার অবসাদ যায়নি, তবে ভোরের হাওয়ায় বেশ স্নিগ্ধ লাগে শরীর।
এত সকালে অনিলের বাড়ির সামনে যেন হাট ভেঙে পড়েছে। নিত্য প্রথমে ভাবলে ওষুধবিতরণী সভা, কিন্তু এত লোক! জনা পঁচিশ-তিরিশ লোক গোল হয়ে গুলতানি করছে। কেমন একটা থমথমে ভাব। কেউ বিশেষ নজর দেয় না তার দিকে।
নিত্য ঝড়ের মত গিয়ে বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াল। সামনেই অনিল মুখোমুখি। গত রাত্তিরের মুখের ভাবখানা মোটেই নেই। সেই শান্ত ভাবুক মুখখানা। এগিয়ে এসে অনিল বললে, "এই যে মাস্টার এসেছো, ভালোই হল। আমাকে এক্ষুনি বেরুতে হবে। রমার কাছ থেকে সব শুনো।" কথাটা বলেই অনিল বেরিয়ে যায়।
রমা চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়েছিল। নিত্য অবাক হয়ে বললে, "কি হল, কি হল বৌদি?"

রমা হালকাভাবে জবাব দেয়, "রাঙা বৌ মেজো কর্তার গলা টিপে মেরেছে।"
"গলা টিপে মেরেছে!" নিত্য চমকে ওঠে। এক নিমেষে মনে পড়ে যায় সেই প্রথম দিনের কথা, ওষুধ দিতে হতাশ হয়ে অনিলের সখেদ উক্তি, "ড্যামনাটা তো এখনো আসে তোমার বাড়ি। গলা টিপে দিতে পারো না?"
অতি সাবধানে রমার দিকে তাকিয়ে নিত্য বললে, "তাতে তোমার কি বৌদি?"
"আমার? আমার আবার কি? স্বামীটা জেল খাটবে।"
নিত্য বেরিয়ে যায় সুটকেসটা দরজার গোড়ায় রেখে।
মণ্ডলদের বাড়ির সামনে প্রচণ্ড ভিড়। পায়ের চাপে ফুলকপি ক্ষেতের বেড়া নুয়ে পড়েছে। বাড়ির ভেতর থেকে ঘন ঘন কান্নার রোল উঠছে। শব এখনও মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়নি। একটা বেঞ্চিতে কাপড় মুড়ি দিয়ে শোয়ানো রয়েছে। বাইরে বারান্দায় দুটো টেবিল পরপর জুড়ে পুলিসের সাবি, আগে থেকেই তারা খবর পেয়েছিল। যে লোকটা গাঁয়ের স্বার্থ নিয়ে চিরকাল পুলিশের সাথে মারামারি করে এসেছে তাকে একটা খুনের মামলায় জড়ানো গেছে, এ চিন্তায় বেশ প্রফুল্ল মনে চা পান করছিলেন বড়বাবু। সামনে মাটির সঙ্গে মিশে একটি জড়োসড়ো নারী মূর্তি। খালি একখানা ফ্যাকাশে জরাজীর্ণ হাত মাটির ওপর আঁচড় কাটছে। কি যেন একটা কথা চলছিল, অনিল আসতে থেমে যায়।
দারোগাবাবু নারী মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে উদাসীনভাবে বললেন, "হ্যাঁ, বল কি বলছিলে?"
অনিলের পায়ের শব্দে রাঙা বৌ আরো মাটির সঙ্গে মিশে যায়। বাড়ির লোক, পাড়া প্রতিবেশী হুড় করে দেখতে এসেছে।
রাঙা বৌ মুখ খুললে না। অনিল বললে, "বল রাঙা বৌ, চুপ করে আছো কেন?"
রাঙা বৌ অনিলের আওয়াজ পেয়ে হঠাৎ এক গলা ঘোমটা সরিয়ে তাকালে। রক্তজবার মত চোখ, অতিরিক্ত কাঁদার ফলে মুখ ফোলা! হঠাৎ কী দেখে সেই টকটকে লাল চোখ দুটোতেও আতঙ্কের ছায়া নড়ে ওঠে। অনিলের ঠিক পিঠের পেছনেই সঙ্গীনের চকচকে নীল মুখ, একজন সান্ত্রী দাঁড়িয়ে। সেদিকে তাকিয়ে রাঙা বৌ ডুকরে উঠল, "আমায় মেরে ফেলো না গো বাবা, আমায় তোমরা মেরে ফেলো না। আমার কোন দোষ নেই। কোন দোষ নেই বাবা।"
দারোগা ধমক দেন, "তবে কার দোষ? লোকটা জলজ্যান্ত তোমার ঘরে এসেছিল। খুন করলাম আমি না তুমি?"

রাঙা বৌ আবার ঘোমটা সরায়। তার মনে হল কয়েক হাত দূরে ছুঁচলো ইস্পাতের ফলাখানা তার দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছে। তার চোখ ক্রমে ক্রমে গোল হয়ে ওঠে। হঠাৎ অনিলের দিকে তাকিয়ে উন্মাদের মত চিৎকার করে ওঠে, "ঐ, ঐ লোকটাই আমার সব্বনাশ করলে গো।"

নিত্য যখন হাজির হল তখন চারদিকে প্রবল উত্তেজনা। পুলিসের বড়বাবুকে বলতে শোনা গেল, "আমাদের ইচ্ছে ছিল না অনিলবাবু আপনাকে অ্যারেস্ট করা। কিন্তু কী করব! আমরা নেহাত আইনের চাকর।"

অনিলের কোন ভাবান্তর হয়নি। বরং প্রথমে রাঙা বৌ-এর আর্তনাদে সে যেমন পাথর হয়ে গিয়েছিল সে ভাবটা মুহূর্তের মধ্যে কেটে গিয়ে তার মুখে স্বাভাবিক ভাব ফিরে আসে। নিত্য মনে মনে লজ্জা পায়। গত রাত্রিতে অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্যও এ লোকটার সম্বন্ধে যে সন্দেহ মনে ছায়াপাত করেছিল তা মুহূর্তের মধ্যে উড়ে গিয়ে অনেকখানি আপনার মনে হয় অনিলকে।

নিত্য ভেবেছিল জামিন পাওয়া যাবে। কিন্তু রহস্যজনকভাবে তা পাওয়া গেল না। সন্ধ্যের অন্ধকারে অনিলের বাড়ি সেদিন আর আলো জ্বলেনি। সারাদিনের উত্তেজনার পর দুটো ছেলে উনুনের পাশে গরম মাটির তাতে ঘুম দিচ্ছে। আর একটা ডিবরির তলায় রমা বসে চাটুতে রুটি সেঁকছে। নিত্য অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ঘরে ঢুকল। তারপর উনুনের কাছে এসে বললে, "কাল ভোরেই আমি কলকাতা যাচ্ছি।"

রমা চাটু থেকে মুখ তুলে তাকায়। আগুনের আঁচে চোখের জলে ধোয়া মুখখানি চকচক করে। রমা তাকায় অদ্ভুতভাবে নিত্যর দিকে। সে চোখে কৌতূহলের চেয়ে ঔদাসীন্যতাই বরং বেশী। নিত্য বুঝতে পারে। আগুনের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে, "উকিলের বন্দোবস্ত করতে যাচ্ছি।"

"কি হবে?" রমা আবার চোখ নামিয়ে রুটি সেঁকতে সেঁকতে বললে।

বাড়িতে পা দিতে না দিতেই হাসি চেঁচিয়ে উঠল, "ওমা ছোড়দা! যাক তুমি ফিরে এলে শেষ পর্যন্ত। আমরা ঠিক জানতাম।"

হাসির কোলে ছেলে। মার ধাতটাই বেশী পেয়েছে। তেমনি কোঁকড়া চুল, গালের চামড়ায় চিকণ আভা, মার হাসবার সময় হাসির গালের টোল-পড়াটি পর্যন্ত সে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে।

জ্যোৎস্নাদি বেরিয়ে এলেন। তেমনি লক্ষ্মীঠাকরুণটি, তবে বেশ মোটা হয়েছেন। কেন যে এতদিনে নাকে একটা হীরের ফুল গোঁজেননি, ভেবে অবাক হয় নিত্য। জ্যোৎস্নাদি আগের চেয়ে একটু নড়ে চড়ে কথাও বলেন আজকাল। বললেন, "উঃ ধন্যি! দেখালে বটে, আমরা ভেবে ভেবে মরি। পাড়ার লোকে জিজ্ঞেস করলে এমন মুশকিলে পড়তে হত। তুমি তো ভেগেই খালাস!"

সত্যগোপাল অনেকখানি পালটে গেছেন। সম্প্রতি চোখের কষ্টে ভুগছেন তিনি। কেমন ঘোলাটে বিবর্ণ দেখায় তাঁর বড় বড় চোখ দুটি। বগলে খবরের কাগজ আর অন্য হাতে একটা মাটি নিড়াবার খুরপি, ড্রেসিং গাউন গায়ে সত্যগোপাল ব্যালকনি থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "নেভার টু লেট নিত্য। এখনও তোমার বয়স আছে। চেষ্টা চরিত্তির করলে কিছুই আটকাবে না।" হাসিকে ডেকে বললেন, "ওপরের ঘরটায় বড্ড ধুলো পড়েছে। একটু ঝেড়ে দিতে বল।"

খেয়ে দেয়ে ওপরে উঠে নিত্য অবাক হয়ে যায়। অযত্নের একটা প্রকাণ্ড প্রতি-মূর্তির মত দাঁত বার করে আছে তার ঘরখানা। চারদিকে ধুলো, ঝুল আর জানালা-বন্ধ-করে-রাখা বদ্ধ হওয়ার গন্ধ। তার বইয়ের দুখানা সেল্‌ফের একখানিতে নতুন উড়িয়া ঠাকুরের চিরুনি, তেল, গামছা, আর বম্বে চিত্র জগতের তারকাদের ছবি এদিকে সেদিকে আঁটা। নীচের তাকের বইগুলো ঘরের এক কোণে গাদা করা হয়েছে।

হাসি ঘরে এসে ঢোকে। চারদিকে এক নজর তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "উঃ বৌদিটা কী কুঁড়ে! কতবার পইপই করে বললাম ঘরটা একটু ঝেড়ে ঝুড়ে রাখতে।" বাবলুকে আদর করতে করতে বললে, "মামীমা বদ্দ দুত্তু, না বাবলু?"

নীচের বইগুলো পোকায় কাটছে। একখানা একেবারে কুচিকুচি। নিত্য একটুখানি টান দিতেই অর্ধেকটা মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়ল।

হাসির সে-দিকে নজর ছিল না। বললে, "এত্তা হামি দাও বাবলু, এত্তা হামি।" তারপর ছেলেব দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, "যা ইস্কুলের অবস্থা। আমি ভাবছি ছোড়দা বাবলুকে সাহেবদের ইস্কুলে দেব। শুনেছি সেখানে ভালো পড়াশোনা হয়। আমাদের তো আর কিছু হল না।" হাসি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করলে।

বেরিয়ে যাচ্ছিল সে। কি মনে করে ডাকলে, "ছোড়দা"।

নিত্য তাকিয়ে দেখলে সে তার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে। নিত্য হেসে বললে, "কি রে?"

"জানো ছোড়দা, আমরা মেয়েরা মেয়েদের মন ঠিক বুঝি। তুমি যখনই ঐ বুড়ীটাকে নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করতে…"

নিত্য আশ্চর্য হয়ে বললে, "কী যা-তা বলছিস।"

"যা-তা না মশাই, ঠিকই বলছি। ঐ যে তোমার পুষ্পদি না কি-দি। যাকে তুমি ভাবতে একেবারে অসামান্যা। তখনই আমি বলেছিলাম, আসলে স্বামীর সাথে বনে না, আর কিছু না। এতে রাজনীতিরই বা কি আছে ছাই!"

নিত্য অসহিষ্ণু হয়ে বললে, "কি হয়েছে, কি হয়েছে পুষ্পদির?"

"কি আবার হবে? স্বামীর সাথে আলাদা হয়ে এখন গান শিখিয়ে বেড়াচ্ছেন।"

নিত্যকে একটু চিন্তিত দেখে হাসি বললে, "আমার কথা তো বিশ্বেস হবে না। সে নিজেই এসেছিল তোমার খোঁজে। একটা ঠিকানা দিয়ে বললে, এখন সে আগের জায়গায় আর নেই। টালিগঞ্জে কোন্ রেফিউজিদের ইস্কুলে মাস মাস গান শেখায় আর গানের টিউশনি করে। আমি বলছিলাম সুবোধকে পুষ্পদির মত লোক যখন গান শেখাতে পারে তখন আমি কি আর—"

নিত্য বাধা দিয়ে বলে উঠল, "তুই এখনও গান করিস হাসি?"

হাসি ছেলেকে ধমকে দিলে, "কাপড় ছাড় বলছি।" তারপর তাকে কোলে তুলতে তুলতে বললে, "কই আর তেমন হয়, এ ছেলের জন্যে কি এক দণ্ড সময় পাই!"

বিকেল না পড়তেই নিত্য দৌড়োয় টালিগঞ্জে, রেফিউজি কলোনীর দিকে। নতুন চালাঘরের সারি, কঞ্চিতে লাউ কুমড়োর চারা, কাদার ওপর খাটা পায়খানা, বাঁশ বনের গায়ে টান করে মেলে দেওয়া শাড়ি শুকোচ্ছে।

বেশী বেগ পেতে হয় না খুঁজে নিতে। নাম করতেই একপাল ছেলেমেয়ে "ছোড়দি, ছোড়দি" বলে তাকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে গেল ইস্কুলের পাশে একখানা ঘরে। পুষ্পদি বেরিয়ে আসেন। চিকন ধারালো চেহারা, চোখের নীচে অতিরিক্ত পরিশ্রমের দাগ পড়েছে। কালোপেড়ে শাড়িখানা কিন্তু বেশ আঁটসাট করে পরা। নিত্যকে দেখেই একটু হেসে ডাকলেন, "এস"।

সারা সন্ধ্যে নিত্য গান শুনলে। পুষ্পদি একটা তানপুরো কিনেছেন। গাইবার আগে একবার খালি হেসে বললেন, "আমরা সেকেলে লোক, সেকেলে গান করি।" অতুলপ্রসাদের, রজনী সেনের গান গাইলেন। নিত্য হঠাৎ বললে,

"আর ঐ যে তুমি গেয়েছিলে।"

পুষ্পদি মুখ তুলে বললেন, "কোন্‌টা?"

"ঐ যে লাখ লাখ যুগ......"

পুষ্পদি হেসে ফেলে বললেন, "কী আহ্লাদে ছেলে!" তারপর গাইলেন বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, আর কিছু ভজন। তানপুরোয় আঙুল চালাতে চালাতে হঠাৎ বলে উঠলেন, "আরো যদি কিছু সময় হাতে পেতাম। জানিস নিত্য, এখনই আমার একটা দাঁত নড়ছে।"

নিত্য ভেবেছিল, স্বামীর কথা বুঝি পাড়বেন। কিন্তু সেদিক দিয়েই গেলেন না। নিত্যর খেয়াল নেই। ঘড়িতে প্রায় দশটা বাজে। এমন সময় একটি লোক ঘরে ঢুকে বললে, "মা, তোমার না বুকে যন্ত্রণা হয়। এত রাত পর্যন্ত গাইছ।" হঠাৎ নিত্যর বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "নিত্যদা না? চিনতে পারছো না নিশ্চয়।"

মান্তাকে চিনবার জো নেই। না আছে সেই সখের জুলপি, না আছে এক ঝাড় চুল। আরো লম্বা আরো রোগা দেখায় তাকে। মান্তা বললে, "ছ-মাস ছিলাম বোম্বাইয়ে। স্টুডিয়োর চেয়ার-টেবিল ঝাড়পোঁছ করতাম। একটা বাইজীর তবলচীও ছিলাম কিছু দিন। খেতে পেতাম না একদম। এখানে একটা মণিহারী দোকান দিয়েছি, রসা রোডে। এস না একদিন।"

পুষ্পদি বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

যত তাড়াতাড়ি ভাবা গিয়েছিল কোন ফয়সালা হবে সেরকম মোটেই কিছু হল না। একটার পর একটা তারিখ ফেলে শেষকালে প্রায় মাস তিনেকের ওপরে কেটে গেল। নিত্যর ভাতে পাওয়া তার দিদিমণির দেওয়া তিনভরি মটরের হার, আরো এদিক ওদিক থেকে চেয়ে চিন্তেও শেষ পর্যন্ত উকিলের জন্যে হাসির কাছে হাত পাততে হল, এ লজ্জা তাকে পীড়া দেয়। হাসিও টাকাটা দিয়ে বললে, "কতদিন আর এ পাগলামি চালাবে ছোড়দা?"

প্রথম প্রথম রাঙা বৌ-এর সাময়িকভাবে মস্তিষ্কবিকৃতির স্বপক্ষে যুক্তি এমনভাবে বোঝালে উকিল নিত্যকে, যে আর কোন যুক্তি যে পৃথিবীতে থাকতে পারে তা তার মনেই এল না। ফরিয়াদি পক্ষে কিন্তু সাক্ষী প্রচুর জুটে গেল। শোনা গেল, তাদের কেউ কেউ রাঙা বৌকে রাত্রিতে ঘন ঘন অনিলের বাড়ি যেতে দেখেছে, এমন কি ঘটনা ঘটবার আগের রাত্রেও। ডাক্তারও বললেন, মাথা খারাপ হবার কোন লক্ষণ নেই রাঙা বৌ-এর। অনিল হাঁ না কিছুই করলে না,

খালি মাথা নেড়ে দোষ অস্বীকার করলে।

কেস সেসনে গেল। আলিপুর কোর্ট। চারদিকে শামলা পরা লোকগুলো বগলে ফাইল নিয়ে যে-যার তালে ছুটছে, চায়ের স্টলে মগে করে গরম চা জুড়োন হচ্ছে, আসামীদের আত্মীয় স্বজন গাছতলায় উবু হয়ে বসে গল্প জুড়েছে নিজেদের মধ্যে, বিচারপতি আধ বোজা চোখে হাত দিয়ে প্রায় সমস্ত মুখখানা ঢেকে কেস শুনছেন একটার পর একটা, জুরীরা তাঁদের বক্তব্য জানিয়ে পালাবেন কখন তার জন্যে ক্রমাগত উশখুশ করছেন—এরই মধ্যে কখন রাঙা বৌ আর অনিলের ভাগ্যে যথাক্রমে দশ আর চার বছর জেল নির্ধারিত হয়ে গেল।

আগে পাগল ছিল না রাঙা বৌ। এখন মনে হল বিচারের রায় শুনে পাগল হয়ে গেছে। অনিলের কিন্তু মুখের ভাবান্তর হয়নি, সেই শান্ত হাসি আর বিদ্রূপে ভরা চোখ। তার চোখ দুটি যেন আরো বিদ্রূপ করছে জজ আর জুরীদের। সান্ত্রী চারপাশে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যাবার আগে একবার তার হাতখানি তুললে রমা আর প্রণতির দিকে।

ট্রামে উঠবার আগের রাস্তাটুকু পার হতে হতে নিত্য নিজেকে জিজ্ঞেস করলে, কোথায় চলেছে সে?

নিত্যর মনে হল, যে মানুষকে সে তার জীবনের সর্বত্র খুঁজছে, সে তো আনন্দ দেয় না সব সময় বরং অনেক ক্ষেত্রেই আনে বিরাট বেদনা। সব সময় তার প্রশ্নের জবাবে বেশ সফল উত্তরও লাভ করেনি। উত্তর খুঁজতে গিয়ে অনেক সময় আরো দুর্বোধ্য প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েছে এক গভীর যন্ত্রণার ভেতর।

তার দাদা তাকে বলত, সে ভুগছে একটা রোগে। রোগটা আর কিছু না, বৈচিত্র্যবিলাস। সেই বিলাসের জন্যে তার রাজনীতি, বন্ধু-প্রীতি, পুষ্পদিকে নিয়ে হৈ হৈ করা, ক্যানিং যাওয়া। আর শুধু দাদাই বা কেন, হরেন কি তাকে বলেনি, "আপনি কি চান, তা আপনিই খালি জানেন?"

নিত্য খুব একটু একটু করে নিজেকে আজ চিনতে পারছে, নিজের ভালো-লাগা মন্দ-লাগাকে যাচাই করতে পারছে। আর সেটা হল আর সকলের সঙ্গে মিলে মিশে হলেও তার রাস্তাটা তার নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, সে রাস্তাটা প্রত্যেককেই নিজে নিজে আবিষ্কার করে নিতে হয়।

রাস্তাটা কী? চলতি কথায় বলতে গেলে কি দেশ সেবার রাস্তা? নিত্য

ঘাড় নাড়ায়। তার মনে হল, একটা দেশ সেবার রাস্তা আর একটি চাকরি করার রাস্তা অর্থাৎ হয় আত্মবিলোপ নয় আত্মতুষ্টি, এভাবে সমাজ আর নিজেকে সে যতদিন ফারাক করে রাখবে ততদিন মানুষের ইতিহাসের মানেই এড়িয়ে যাবে তার কাছ থেকে। গত ক-বছরের অভিজ্ঞতার যদি কোন মূল্য থাকে তার কাছে সেটা হল, এই বুক-চাপা একাকীত্বের জগৎ থেকে হাত বাড়াতে হবে মানুষের দিকে—তাদের আনন্দের কাছে যেতে হবে, যেতে হবে তাদের তুঃখের ভেতর। আর এ যাওয়া কোন পরোপকারিতার জন্য নয়, তার নিজের স্বার্থে যাওয়া। তার বাঁচার মানে খুঁজতে গিয়ে অনেক মানুষের বাঁচার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের এই সম্বন্ধ অনেক সময় তাকে আহত করেছে সন্দেহ নেই। এ যন্ত্রণাকে অস্বীকার করার মত সহজবাদের কি মানে, নিত্যগোপালের তা অজানা. কিন্তু এটা সে বুঝতে পারে, এই একনাগাড়ে লেগে থাকা বিরক্তি, অসোয়াস্তি এমন কি নিরাশার উর্ধ্বে যে পূর্ণতা আনে মানুষের সংস্পর্শ তা বাদ দিলে জন্মেরও কোন মানে নেই, মৃত্যুরও কোন মানে নেই। নিত্যগোপাল ভাবলে, এত খাদের মধ্যে এই সোনাটুকুর জন্যে সে ঠকতেও রাজী।

অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছিল সে। প্রণতি ডাক দিয়ে বলে, "কি ভাবা হচ্ছে এতক্ষণ ?"

নিত্য থমকে দাঁড়ায়। তারপর চেঁচিয়ে ওঠে, "আসছি, আসছি।"

কথাশেষ

তেত্রিশ

প্রায় তিন বছর পার হতে চলল। তিনশো পঁয়ষট্টি দিন, তিনশো পঁয়ষট্টি রাতের সময়-প্রবাহে কেউ বদলেছে, কেউ বদলায়নি।

তিন বছর পর নিত্যগোপালের সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন সে কোন শ্রমিক সংগঠনের এক সাপ্তাহিক চালাচ্ছে, সেই সঙ্গে কর্পোরেশন স্কুলের মাস্টার। সন্ধ্যেবেলা নম্বর খুঁজে পার্ক সার্কাসের এক বাড়িতে গিয়ে যখন হাজির হলাম, নিত্য তখনও ফেরেনি। প্রণতি নিত্যর স্বভাবের সঙ্গে ধাতস্থ হতে পারেনি। সে আর একবার কোন্ দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে বাড়ি ছেড়েছে, আর ফেরেনি।

সেদিন অনেকক্ষণ আলাপ হয় নিত্যগোপালের সঙ্গে। নিত্য সকলের কথাই বললে, নিজের কথা বাদ দিয়ে। যখন কথাটা পাড়তে না পেরে প্রায় হাল ছেড়ে দেবার অবস্থা তখন নিত্যগোপালই মুখ খুললে।

তার গলার আওয়াজ আর কথা বলার ধারা একটু পালটেছে। বেশ ধীরে ধীরে থেমে থেমে বললে, "ছেলেবেলায় যখন ফড়িং খেলা করত জলের ওপর, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতাম তাই দেখে। আসলে ভালো-লাগা ব্যাপারটা ওরকম না।"

দেখলাম, তার মেজাজে সমালোচনার ঢঙটি পুরোপুরি বজায় আছে। কিন্তু এ সমালোচনায় চিৎকার নেই, অধৈর্য নেই। নিত্যগোপাল আরও পরিষ্কার করে বললে, "ভালো-লাগা ব্যাপারটা মাত্র একটুখানি আবেশ নয়। তাকে টিকিয়ে রাখতে গেলে, বাড়াতে হলে চেষ্টা করতে হয়।"

কাদের কথা স্মরণ করেই যেন নিজের মনে হেসে বললে, "হৃদয়াবেগের ওপর 'আলোচনা' করে কী লাভ? আসলে যা দাঁড়ায় তা হল মানুষের মধ্যে যাওয়া, তার জন্যে কাজ করা।"

এর পর অন্য প্রসঙ্গ। সত্যগোপাল আর নতুন করে কোথাও চাকরি-বাকরির চেষ্টা করেননি। বছর দুয়েক হল সত্যগোপাল আছেন কার্শিয়ঙে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকায় কার্শিয়ং শহরের উপকণ্ঠে এক বাংলো কিনেছেন। বাংলোর চেয়ে সামনের বাগানটাই দেখবার মত।

হাসি দ্বিতীয় সন্তানের মা হয়েছে। দুটি ছেলেকে সামলাতে সামলাতে তার আর নাওয়া-খাওয়ার অবকাশ থাকে না। সুবোধ তার সম্বন্ধে কি ভাবে, চিন্তা করারও অবকাশ নেই তার। মাঝে মাঝে সেও ছেলেদের নিয়ে কার্শিয়ং পাড়ি দেয়। কথায় কথায় বলে, "আমার তো আর কিছু হল না। একমাত্র আশা এই ছেলে দুটো। আর এই ছেলে দুটো যাতে দেশের-দশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে সে জন্যে নানা দিক থেকে পয়সা জমিয়ে তাদের ফিরিঙ্গি স্কুলে দিয়েছি।"

গরমের ছুটিতে হাসিকে দেখা যাবে সত্যগোপালের বাংলোর সিঁড়িতে, তার দুটি ছেলেকে নিয়ে। হাতে কয়েকখানা রঙচঙে ইংরেজি বই। প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে, "বল তো বাবলু, কার্লি বেব্ কার্লি বেব্ উইল্ ইউ বি মাইন?" ছেলেদের সংস্পর্শেই তাকে একটু উৎফুল্ল দেখায়। তা বাদ দিয়ে হাসি নামের কোন মানে নেই আজ। সুবোধেরও সময় নেই। দিল্লী, মাদ্রাজ, বোম্বাই থেকে যত ধরনের ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল্ বেরোয় তা করতে করতেই তার সকাল সন্ধ্যে কেটে যায়। তার দৃঢ় বিশ্বাস, একবার না একবার লাগবেই।

খুশি সত্যিই নেপ্‌ল্‌সে গিয়েছে। দিলীপের বাবার পয়সায় সুইজারল্যাণ্ডও বাদ যায়নি। তবে আশ্চর্যের কথা, দেশে ফেরার পর খুশি দিলীপকে সাহেব হতে দেয়নি। বিলেতে থাকতে সেও শিশু-শিক্ষা ধরনের কি একটা ব্যাপারে ডিগ্রী নিয়ে এসেছে। দিলীপকে তার চেম্বারে পাঠিয়ে দিয়ে সেও বার হয় পড়াতে।

অমিয়র পরিবর্তন লক্ষ্য করার ব্যাপার। তার চেহারাটা বেশ সুন্দর হয়েছে। কেমন এক ধরনের যত্নে আঁচড়ানো লালচে চুল বানিয়েছে। বেশ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। তারও বিয়ে হয়েছে, কলকাতায় এক নামজাদা অ্যাটর্নীর একটি মাত্র মেয়ের সঙ্গে। একটা "হিন্দুস্থান টেন"-এ সে আজকাল ঘুরে বেড়ায়। সম্প্রতি ভারত সরকারের এক নৈতিক মান উন্নয়ন বোর্ডের সে একজন অন্যতম সদস্য।

আর পুষ্পদি? পুষ্পদির সামনের দুটো দাঁত নড়ছে। কিন্তু মাস্টারি করার সঙ্গে সঙ্গে তার গান শেখা শেষ হয়নি। রাত্তিরে শুতে যাবার সময় ভাবেন, আরো যদি পাঁচটা বছর সময় পান। মান্তা এখন তার একান্ত অনুগত। শুধু মান্তা কেন, ইস্কুলের ছোট ছেলেমেয়েরা 'ছোড়দি' বলতে পাগল।

আরো কেউ কেউ বাকি থাকল যাদের কথা বলা হল না। সময় তাদেরও স্পর্শ করেছে নানাভাবে।

———